উৎসর্গ।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন লাহিড়ী, এম-বি।

প্রিয় কালীপ্রসন্ন বাবু,

দেখিতে দেখিতে, বয়স আমার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া, [illegible] নিয়া আমাকে জীবনের অনেক দূরে আনিয়া ফেলিয়াছে,—বাল্য গেল, যৌবন গেল, প্রৌঢ় যায়—এখন কোন্ অন্ধকারময় অদৃষ্ট রাজ্যে সে লইয়া চলিয়াছে। অঙ্গ শিথিল হইতেছে, মস্তিষ্ক নিস্তেজ হইতেছে,—চুল পাকিতেছে, দাঁত পড়িতেছে; আমার হাড় কখানা মাটীতে মিশাইয়া কি যেন একটা অতৃপ্ত কামনা পূর্ণ করিবে, বুঝি বা তাহার এই বাসনা। আমি বয়সের নিকট পরাস্ত হইয়া এখন ভাবিতেছি, আমি বা এতদিন কি করিলাম, সে বা কি করিল? সে যাহা করিবার, যথেষ্ট করিয়াছে,—জগতের অনেক দেখাইয়াছে, অনেক শিখাইয়াছে, অনেক বুঝাইয়াছে,—তার কোনই অপরাধ নাই। আমি কিন্তু দেখিয়াও দেখি নাই, শিখিয়াও শিখি নাই, বুঝিয়াও বুঝি নাই অনেক। বাল্যে সে জনক জননীর পবিত্র ভালবাসা দেখাইয়াছে, যৌবনে সে স্ত্রীর বিমল প্রেম শিখাইয়াছে, প্রৌঢ়ে সে পুত্রকন্যা, ভাই ভগ্নী ও বন্ধু বান্ধবদিগের নিষ্কাম ভালবাসা বুঝাইয়াছে, কিন্তু আমি, আপনাকে বলিব কি, কিন্তু এই হতভাগ্য আমি বাল্যকাল হইতে প্রেম প্রেম করিয়াও প্রেমের গভীর মর্ম্ম আজও বুঝিলাম না। সাগর সেঁচিয়া মানুষ রত্ন লাভ করে, গিরিকন্দর ভেদ করিয়া হীরক আবিষ্কার করে, খনির তিমির গর্ভ হইতে স্বর্ণ বাহির করিয়া লয়; কিন্তু আমি প্রেম-মণি আজও পাইলাম না। প্রেম জিনিসটা কি আকাশ-কুসুম হইয়াই আমার নিকট জন্মিয়াছে? এই ধরায় প্রেমের আরম্ভ বা কোথায়, অন্ত বা কোথায়? এই ধরায় প্রেমের স্বরূপ কি, লক্ষণ কি, বলিতে পারেন কি? আমি বুঝি বুঝি বুঝি না, ধরি ধরি ধরিতে পারি না, দেখি দেখি—আর দেখি না। স্বার্থ নামক একটা দুর্জ্জয় কুজ্ঝটিকা আমাকে অন্ধবৎ করিয়াছে;—আমি দেখিয়াও দেখিতে পাইলাম না, শিখিয়াও শিখিলাম না, বুঝিয়াও বুঝিলাম না।

রাজগিরিতে আজ [illegible] দিন [illegible] এই সকল কথাই ভাবিতেছি। আমি পৃথিবীর একটা কথাই বুঝিলাম না, [illegible] বা কি, লিখিবই বা কি? প্রেমবোধ না [illegible] বুদ্ধি, প্রতিভা ও [illegible] কিছুরই উন্মেষ সম্ভব নয়। প্রেমবোধ না হইলে সৌন্দর্য্য-বোধ, প্রকৃতি-[illegible], ধর্ম্ম-বোধ, নীতি-বোধ এ কিছুরই বিকাশ হয় না। আজ আমি [illegible] ছি, আমাপেক্ষা দুই বৎসর বয়সের একটী শিশুও উন্নত, কেননা সে [illegible] হাসে, প্রেমে কাঁদে, প্রেমে খেলে, প্রেমে নাচে। তাহার সৌন্দর্য্য [illegible]। সকল জ্ঞানীর জ্ঞান, সকল কবির কবিত্ব, সকল পুণ্যাত্মা[illegible] রণী ঐ খানে উথলিত। কিন্তু আমি, এই 'বৈভারের' ন্যায় পাষাণ, এই 'বিপুলাচলের' ন্যায় নিশ্চল, কাণ্ডজ্ঞানহীন জড়বৎ জগতের এক কোণে পড়িয়া কি ছাই ভাবিতেছি, আর লিখিতেছি। পড়িবেই বা কে, আদরই বা করিবে কে? না পড়ুক, না আদর করুক, তাহাতে আমার কোন দুঃখও নাই। অপ্রেমিকের প্রলাপ শুনিয়া লোকে হাসুক আর উপহাস

করুক, কোনই ক্ষোভ নাই। ক্ষোভ এই, আপনি ধরা দিতে আসিলেন কেন? এই নির্জ্জন পাহাড়-বেষ্টিত স্থানে বসিয়া, এই জাতীয় ইতিহাসপূর্ণ ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া, কত কত মহাজনের পূত চরণ-রেণু মস্তকে লইয়া একাকীত্বের গহন বনে লুক্কায়িত হইবার বাসনাকে হৃদয়ে জাগাইতেছিলাম, আপনি জীবন্ত প্রেম-মূর্ত্তিতে-এ স্থানে প্রকাশিত হইয়া ধরা দিলেন কেন? এই কদিন যাহা ভাবিতে যাই, তন্মধ্যেই আপনার কথা জাগে। অন্ধ "লীলাশুক"কে সামান্য একজন রাখাল প্রেম-বৃন্দাবনে লইয়া গিয়াছিল, আপনিও, এই গিরিব্রজপুরের মধ্য দিয়া, স্বার্থান্ধ আমাকে প্রেম-বৃন্দাবনের স্বচ্ছ ও পবিত্র ভাব-যমুনা-লহরীতে মজাইবেন কি? আমাকে দয়া করে, আদর করে, এমন লোকও কি পৃথিবীতে আছে? যে লোকটা, প্রেম বস্তুটা কি, মোটেই বুঝিল না, তাহাকেও লোকে ভালবাসে? আপনার আড়ম্বরহীন ভালবাসা দেখিয়া আমি আত্মহারা হইয়াছি।

রাজগিরি সন্দর্শনের মূল আপনি। পুণ্যপ্রভা যদিও বহুদিন গহন হৃদয়-বনে অঙ্কুরে খেলা করিতেছিল বটে, কিন্তু প্রেম-বারি বর্ষণে, এই পবিত্র স্থানের পবিত্র সুবাতাস দ্বারা আপনিই ইহাকে প্রস্ফুটিত করিয়াছেন। ভাল হউক, মন্দ হউক, আপনি যখন জন্মদাতা, তখন এ জিনিসে অন্যের কোন অধিকার নাই। বিশেষত কামনা-বর্জ্জিত প্রেম-যোগী-বেশে আপনার এখানে আগমন, এই নির্জ্জনতা ভেদ করিতেছে—কেবল আপনার নিঃস্বার্থ প্রেম, অবিরাম, অবিশ্রান্ত। আমি যে বন্য ফুল দিয়াই আপনার পূজা করি না কেন, আপনার তাহাতে কিছুই বলিবার নাই। এই পাহাড়ের দেবতারা উপভোগের জিনিস কিছুই পায় না—পূজায় কোন মন্ত্র পায় না, ফুল পায় না, নৈবেদ্য পায় না, একটী প্রণামও পায় না। তবে বুঝিবা অসভ্যদিগের একটু একটু বিশ্বাস ও প্রেম পায়, বুঝিবা একটু একটু হৃদয় ও ভক্তি পায়। তাহাতেই সকল দেবতা প্রসন্ন ও নির্ব্বিকার-চিত্ত। আমি অসভ্য হইতেও অসভ্য, আমি কি দিয়া আপনার পূজা করিব? আপনার বন্ধু-প্রদত্ত জিনিস উপহার দিয়া একদিন আপনার অনুরোধের সম্মান রাখিয়াছি, আর আজ? আপনিই যাহাকে পৃথিবীতে আনিয়াছেন, তাহাই, একটু হৃদয়ের ভালবাসা-চন্দন মাখাইয়া উপহার দিয়া বিদায় লইতেছি। আপনি আড়ম্বরহীন প্রেমিক, আপনি অবশ্যই কিছু বলিতে পারিবেন না। কি বিশ্বাসে আপনার এই বন্ধু মাতোয়ারা, বুঝিতেছেন ত?

পুণ্যপ্রভা সম্বন্ধে আপনাকে পরিচয় দিবার কিছুই নাই। এ একটা স্বদেশের সামান্য বনের ফুল। ফুটিয়াছে, দেব-গৃহে এই পবিত্র রাজগিরিতে, আপনার প্রেমের সুকৌশলে। আমি আমবাগানের মুকুলিত আম্রবৃক্ষ-তলায়, হৃদয়-বনের এই ফুলটী কুড়াইয়া পাইয়াছি। এই সামান্য বন্যফুলটী একবার শ্রীচরণে ধারণ করিবেন কি? ধারণ করুন বা ফেলুন, আমি আপনার জিনিস আপনার চরণে উৎসর্গ করিয়াই রাজগিরি পরিত্যাগ করিলাম। যাহা করিতে হয়, করিবেন।

রাজগিরি-ইন্সপেক্‌সন-বাঙ্গালা।
২৮শে চৈত্র, ১৩০২ সাল।

আপনার স্নেহপ্রার্থী,
শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী।

পূর্ণ্যপ্রভা

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিষাদ-বার্ত্তা।

আশ্বিনমাস, বেলা হেলিয়াছে,—হেলিয়াছে নয়, ডুবু ডুবু হইয়াছে। মাদারিপুরের অধীনস্থ কোন এক ভদ্র পল্লীর কথা বলিতেছি। পুকুরের বাঁধাঘাটের উপরে একাকিনী বসিয়া একটী যুবতী। সে মূর্ত্তি বিষাদ-মাখা, শ্রান্ত, ক্লান্ত এবং অবসন্ন। দুনয়নে ধারা বহিতেছে। বামহস্তে মস্তক রাখিয়া পুকুরের দিকে চাহিয়া কি যেন ভাবিতেছেন।

ক্রমে ক্রমে কলসী কক্ষে দুটী তিনটী, ক্রমে আরো দুটী তিনটী, ক্রমে আট দশটী যুবতী, ক্রমে দুই চারিজন প্রৌঢ়াও আসিয়া জুটিলেন। দয়া, সহানুভূতি, পরদুঃখকাতরতা পৃথিবীর আর সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া যে রমণী-হৃদয়ে বসতবাটী নির্ম্মাণ করিয়াছে, সে রমণী-হৃদয় অন্যের চক্ষে জল দেখিয়া ঠিক থাকিবে, সম্ভব কি? ক্রমে ক্রমে কলসী রাখিয়া একে একে সকলে আসিয়া সেই মূর্ত্তিকে বেষ্টন করিয়া বসিয়াছে। ঘাটে সুন্দর এক বৈঠক বসিয়া গিয়াছে। এরূপ বৈঠক প্রায়ই বসিয়া থাকে। এরূপ বৈঠকে রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, সকলের প্রসঙ্গই উঠিয়া থাকে। এরূপ বৈঠকে শোভা সৌন্দর্য্য, রূপ প্রতিভা, সকল প্রসঙ্গই হইয়া থাকে। আজ সমবয়স্কার চক্ষে বিষাদ-ধারা দেখিয়া সমবয়স্কাদিগের হৃদয় অধীর, অধিক বয়স্কাদিগের হৃদয় বিগলিত। সকলেই ভাবিতেছে, কেন এরূপ হইল?

যুবতীদিগের মধ্যে যিনি সকল অপেক্ষা ঐ বিষাদ-মাখা যুবতীকে অধি[illegible] ভালবাসিতেন, অর্থাৎ যিনি সখী, তিনিই অগ্রে জিজ্ঞাসা করিলেন, "[illegible] পুনি, আজ তোর এভাব কেন লো? আজ তোদের ঘরে কত [illegible] হয়েছিল? আমাদের ঘরে আজ অধিক লোক হয় নাই, তোদের ঘরে [illegible]ক হয়েছিল, পুনি, বলনা, কাঁদিস্ কেন?

পুণ্যপ্রভা।—জগদম্বার কৃপায় আজকার দিন এক প্রকারে কেটেছে। কাল কি হবে, তাহাই ভাব্‌তেছি। বিষয় গিয়াছে, ঘরে মূল্যবান জিনিস ও ঘটী বাটী, থালা বাসন যা কিছু ছিল, বাবা ক্রমে ক্রমে সকল বন্ধক দিয়া এতদিন এই যজ্ঞ চালাইয়াছেন, তুই ত সে সকলই জানিস্। ঘরে আর কিছুই নাই। আজ বাবা বল্‌তেছিলেন, যজ্ঞশেষ করে সন্ধ্যার পর কোথায় যাইবেন। সেখানে নাকি কিছু ঋণ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। বাবা এবার ঋণে ডুবেছেন। ইতিমধ্যে ডেপুটী সাহেবের পেয়াদা আসিয়া বাবাকে গ্রেপ্তার করে লয়ে গিয়াছে। তাহারা বল্‌তেছিলো যে, বাবা নাকি খবরের কাগজে ডেপুটী সাহেবের বিরুদ্ধে কি সব লিখেছেন, সে জন্য বাবাকে জেলে যেতে হবে। ভাই, আমার প্রাণ আজ বড়ই অস্থির হয়েছে। কত করে মনকে বুঝাতে চেষ্টা করি, মন কিছুতেই বোঝ মানে না। কি করি বল্?

এই কথা শুনিয়া পরদুঃখকাতর রমণীর প্রাণ কি রূপ হইতে পারে, পাঠক অবশ্যই বুঝিতেছেন। কেন না, মাতৃক্রোড়ে, মাতৃস্নেহে লালিত পালিত সকলেই; সকলে না হইলেও, অনেকেই। রমণী ত মানবী নন্, অনেকেই দেবী। কথা শুনিয়া সকলের চক্ষুই ছল ছল করিতে লাগিল, কেহ কেহ কাঁদিয়া ফেলিলেন। কেহ ক্রোধে ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন, দন্ত কড়মড় করিয়া ডেপুটীকে অভিসম্পাত করিলেন, কেহ বিধাতার নাম স্মরণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "এ দেশের হলো কি? মহারাণীর মুল্লুকে এত অরাজকতা! দেবতার উপরও অত্যাচার?" এইরূপ সহানুভূতির প্রবল স্রোত বহিতে লাগিল।

পুণ্যপ্রভার সখীর নাম দীপ্তি। তিনি কিছু ধীরা, কিছু অবিচলিতা, কিছু ভয়-রহিতা, তিনি বলিলেন, সে জন্য কাঁদিস্ কেন? মা জগদম্বাকে ডাক্। তুই, বা আমি, কি করিতে পারি? জগদম্বার রাজ্য তিনি রাখেন, থাকিবে; তিনি না রাখেন, থাকিবে না। আমরা খাটিতে আসিয়াছি, কেবল খাটিব। কাঁদিস্‌নে, এখন চল। তোদের ঘরে আজ কত লোক হয়েছিল, বল্লিনে?

পুণ্যপ্রভা।—লোক কমেনি। অন্যদিনও যেমন, আজও তেমনি। তুই সেদিন বলেছিলি, কতদেশ থেকে কোন্ কোন্ সমাজের ও কোন্ কোন্ সভার লোক ও ফরিদপুরের বোর্ডের লোক এসে চাউল ও কাপড় বিলাচ্ছে। কই তাতে লোক ত কম্‌ছে না! এ দেশের কি হবে বল্‌ত?

দীপ্তি।—তুই বৎসরে অজন্মা, লোকের আর কি কিছু আছে? যাদের কিছু

ছিল, বহুদিন তা নিঃশেষ হয়েছে। এখন ভদ্র ঘরেরও কত লোক ভিক্ষায় ও উপবাসে দিন কাটাচ্ছে। অনেক সহৃদয় লোক এসেছে, কাজও খুব হচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই কুলাচ্ছে না। আমি শুনেছি, গত সপ্তাহেও এই গ্রামে ১৫।১৬ জন লোক না খেয়ে মরেছে! তা যা'ক, আয় গা ধুয়ে আমরা যাইয়া মা জগদম্বাকে ডাকি।

পুণ্যপ্রভা।—বাবার কি হবে দীপ্তি?

দীপ্তি।—যা করেন জগদম্বা, তাই হবে। তোরা ত পরের জন্য অকূলে ভেসেছিস্, তার আর ভয় কি? লোকে বলে, যার সমুদ্রে শয্যা, তার শিশির-বিন্দুতে কি ভয়? তুই ত বাবার কীর্ত্তি রাখিবি; তোর বাবার সকল গুণ তোতে, ভয় কি? যা করেন জগদম্বা, তাই হবে। তোর বাবা ত আর মানুষ নন্, ভয় কি? দেবতাকে মা জগদম্বা অবশ্যই রাখ্‌বেন।

পুণ্যপ্রভা।—বাবার জেল হলে, বাবার চাকুরিটা ত নিশ্চয়ই যাবে। তা হলে কি হবে?

দীপ্তি।—জেল না হলেও, তোর বাবার পণ্ডিতি আর থাক্‌বে না। তুই বলিস্, মানুষের নিন্দা কর্‌তে নাই। কিন্তু আমি কি করে থাকি? ঐ ডেপুটীর আমলে কাহারও মঙ্গল নাই। ডেপুটী যখন কুদৃষ্টি ফেলেছে, মাদারিপুরের স্কুল হতে তোর বাবার অন্ন উঠেছে। আমি সে জন্য একটুও ভাবি না। যে হতভাগ্য, এই দারুণ দুর্ভিক্ষে সাহায্য করিবার ছলনায়, অসংখ্য কুল-বধূকে অপহরণ করিয়া অন্দরে পূরেছে, তার অসাধ্য কিছুই নাই। সে সকল ভেবে আর কি হবে, এখন গা ধুয়ে ঘরে চল।

পুণ্যপ্রভা এবং দীপ্তির কথা শুনে সকলেই দুঃখ করিল, নানা মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল। সে সকল লিখিয়া ফল নাই। তবে একটী বুদ্ধি-মতী প্রৌঢ়া বলিলেন, "এই ঘটনার মধ্যে চক্রান্ত অবশ্যই আছে। আমার বড় ভয় হচ্ছে, না জানি পুণ্যপ্রভার কপালে কি আছে? চ, ঘরের কর্ত্তা-দিগকে যেয়ে সাবধান করে দি। দরিদ্র ব্রাহ্মণের বিষয় সম্পত্তি পরের জন্য সব গেছে, এখন যদি কুল সম্মান টুকুও যায়, তবে আর এ গ্রামে লোক থাক্‌বে না, চ সকলে যাই।"

"পরের জন্য যাহারা ব্যাকুল, তাদের এই দশা!"—সকলের দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত আকাশে এই কথা উত্থিত হইল। একটা প্রবল বন্যা আসিয়া যে সকল মলিনতা ধৌত করিয়া দিল। দয়া, প্রেম, ভালবাসা ও সহানু

এ জগতে অমর হইয়া থাকুক। পুণ্যপ্রভা এই ঘোর দুর্দ্দিনেও সহানুভূতির এই স্বর্গীয় শোভা দেখিয়া একটু শান্তি পাইলেন। গা ধুইয়া সকলের চরণধূলি মাথায় লইলেন এবং সখীর হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে ঘরের দিকে চলিলেন।

বিষাদ-মাখা সেই স্বর্গীয় রূপ দেখিয়া সকলে মোহিতা হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দুর্ভিক্ষের কথা।

ব্যাপারটা কিছু গুরুতর হইয়াই দাঁড়াইয়াছে। একখানি দুর্ভিক্ষের ইতিহাস লেখা এ পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু কোন কোন কথা না বলিলেও সকল ঘটনা বুঝা যাইবে না। সংক্ষেপে তাই কিছু লেখা যাইতেছে।

দু বৎসর দেশে অজন্মা। অজন্মার কারণ অসাময়িক জল-প্লাবন। এক বৎসর, ঘটী বাটী গরু বাছুর বিক্রয় করিয়া কৃষকদিগকে জমীদারের খাজানা দিতে হইয়াছে,অবশিষ্ট দ্বারা কোন রূপে সংসার চলিয়াছে। দ্বিতীয় বৎসরের প্রারম্ভে, চতুর্দ্দিকে হাহাকার উঠিয়াছে। নরনারী থোর, কলার পাতা, কচুর শাক, পদ্মের মৃণাল, নাইল, যে যাহা পাইয়াছে, খাইয়া উদর পূর্ণ করিতেছে। অখাদ্য ভক্ষণের ফলে কার্ত্তিক মাসে দারুণ ওলাউঠায় দুই আনা লোক গিয়াছে। অবশিষ্ট যাহারা ছিল, তাহাদের অবস্থা দেখিলে পাষাণও গলিয়া যায়।* জাত বৈষ্ণব ভিন্ন মাদারিপুরের নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে প্রায়ই কেহ কখনও ভিক্ষা করিতে দেখে নাই, আর আজ ভিক্ষাই অনেকের সম্বল! সমস্ত দিন ভিক্ষা করিয়া এক মুষ্টি মেলা ভার। যার ঘরে আট দশটি বালক বালিকা, মুষ্টিতে তাহার কি হয়? প্রথমে পিতা মাতারা উপবাস থাকিয়া সন্তানদিগকে খাওয়াইয়াছে, শেষে স্ত্রীপুত্র পরিবার পরিত্যাগ করিয়া পুরুষেরা বিদেশে পলায়ন করিয়াছে। শেষে সন্তানের মুখের গ্রাসও মাতা কাড়িয়া খাইতেছেন। ঘরে ঘরে হাহাকার। কে কাহাকে দেখে, কে কাহার জন্য ভাবে? কর্ত্তাশূন্য, পুরুষ-পূর্ণ অসংখ্য পরিবারে হাহাকার উঠিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের নিকট সংবাদ পৌঁছিলে গবর্ণমেণ্ট সকল চাপা দিতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে লিখিতে লাগিলেন। মানুষের শরীরে বিধাতা যে একটু দয়া দিয়াছেন, তাহার খাতিরে ম্যাজিষ্ট্রেট চাপা দিতে পারিলেন না, সত্য কথা

লিখিতে হইল। গবর্ণমেণ্ট বোর্ডে কিছু সাহায্যের বরাত দিয়া, ম্যাজিষ্ট্রেটের চিত্ত দুর্ব্বল বলিয়া তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিলেন। আর একজন ম্যাজিষ্ট্রেট আসিলেন, তিনিও চাপা দিতে পারিলেন না, সুতরাং তাঁহাকেও যাইতে হইল। এইরূপে তৃতীয় ম্যাজিষ্ট্রেটকেও যাইতে হইল। চতুর্থ জন পাকা লোক, পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া কষাইরূপ ধারণ করিলেন। সহায় জুটিলেন, মাদারিপুরের ডেপুটী সাহেব! ঢাকার কমিসনার একটু সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন, সুতরাং তিনিও স্থানান্তরিত হইলেন। নূতন কমিসনার, নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট, আর পুরাতন ডেপুটী। ডেপুটীরই জয়। ডেপুটী, কিছুই হয় নাই, লোক মরে নাই, বাজারে তাল ও মাছ বিক্রয় হইতেছে, লোকের ঘরে তিনি রাত্রে আলো দেখিয়াছিলেন, অনেক স্ত্রীলোকের বুকে জীবন্ত পুত্র কন্যা দেখিয়াছেন, মানুষের চক্ষে তিনি রক্ত দেখিয়াছেন, মাঠে প্রচুর ধান গাছ এবং বৃক্ষে অনেক পত্র দেখিয়াছেন, সুতরাং দুর্ভিক্ষ নাই, স্বগৌরব-মিশ্রিত এই কথা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সেই সকল কথারই পুনরুল্লেখ করিয়া ডেপুটীর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এদিকে দেশের যে সকল সহৃদয় লোকদিগের ঘরে কিছু ছিল, তাহা দ্বারা স্থানে স্থানে অন্নছত্র খুলিলেন। সাধ্যানুসারে প্রতি ভদ্র লোকের বাড়ীতে ১০, ২০, ৫০, ১০০ জন অন্ন পাইতে লাগিল। তাহাতে কি চলে? ব্রাহ্মসমাজ সাহায্য লইয়া উপস্থিত হইলেন, বোর্ড নৌকা ভরিয়া ভরিয়া দ্বারে দ্বারে চাউল পাঠাইতে লাগিলেন, খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারক সহৃদয় নরনারীগণ সাহায্য লইয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিতে লাগিলেন, দেশবিদেশের কত কত সহৃদয় ব্যক্তি ও কত দরিদ্র সভা দেশ রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। দুটী দল হইল, একদল গবর্ণমেণ্ট-প্রমুখ উচ্চ কর্ম্মচারীগণ, আর একদল, দেশের সমস্ত সহৃদয় ব্যক্তিগণ। গবর্ণমেণ্ট নূতন কমিসনার সাহেবকে মাদারিপুর পাঠাইলেন। তিনি সকল লোককে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিয়া এক লম্বা চৌড়া রিপোর্ট কলিকাতা গেজেটে ছাপাইয়া দিলেন। তিনি লিখিলেন—"আমি নিজে তদারক করিয়াছি, দেশের সম্পাদকগণ মিথ্যা কথা লিখিতেছেন, অনাহারে কোন লোক মরে নাই; যাহারা মরিয়াছে বলিয়া সংবাদ পত্রে উঠিয়াছে, তাহারা যে অনাহারে মরিয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ নাই। নরনারীকে উলঙ্গ দেখি নাই, তাহাদের চক্ষে রক্ত-বিন্দু দেখিয়াছি, লোকেরা দুর্ব্বলতা বশতঃ হই-চই করিতেছে—জাতিভেদ উঠে নাই, জেলের কয়েদীর সংখ্যা

বাড়ে নাই, যে সকল কয়েদী আছে, তাহারা সবল, দুর্ভিক্ষ কাহাকে বলে মূর্খ লোকগুলি তাহা জানে না।" ইত্যাদি। এই মন্তব্যের পর সমগ্র বঙ্গদেশে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, অনেকগুলি দেশের সুসন্তান অপ্রস্তুত হন দেখিয়া সহৃদয় সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ সহানুভূতি ও সাহায্যের পাত্র লইয়া অগ্রসর হইলেন। যিনি যাহা সাধ্য দিতে লাগিলেন। দ্বারে দ্বারে তণ্ডুল ও বস্ত্র প্রেরিত হইতে লাগিল। সহানুভূতির এক স্বর্গীয় দৃশ্য প্রকটিত হইল। তবে দেশের জমীদারগণ, গবর্ণমেণ্টের পোষ্যগণ, একেবারে হাত বন্ধ করিলেন। যাঁহারা কিছু দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাঁহারা তাহা বন্ধ করিলেন, যাঁহারা দিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহা নির্লজ্জের ন্যায় ফেরত চাহিলেন।

দেশের যত সহৃদয় ব্যক্তি অন্নছত্র খুলিয়া সাহায্য করিতেছিলেন, তন্মধ্যে, বিধিকৃষ্ণপুরের তারানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তারানাথ কে? একটুক সংক্ষেপে লিখিতেছি। দুর্ভিক্ষের যে আন্দোলন উঠিয়াছে, তাহার মূল এই তারানাথ। তারানাথ একজন পরদুঃখকাতর ব্যক্তি। তাঁহার অবস্থা পূর্ব্বে স্বচ্ছল ছিল, এখন তত ভাল নহে। সংসারে কেবল একটী কন্যা এবং গৃহিণী সম্বল। প্রাচীন ঘর, যাহা কিছু বিষয় ছিল, তাহার কতক বিক্রয় করিয়া ৩।৪ বৎসর হইল সকল তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। ইচ্ছা, জীবনের অবশিষ্ট দিন কয়টা পর-সেবায় কাটাইবেন। তীর্থভ্রমণের পরও বিষয় বিক্রয়ের কিছু টাকা ছিল, দেশে তদ্দ্বারা একটী পুকুর কাটাইয়াছেন। কুমার নদীর জল বারমাস ভাল থাকে না বলিয়া বড়ই জলকষ্ট হইত। দেশে একটী মাইনর স্কুল স্থাপন করিয়াছেন, এবং নানা স্থানের অনাথ ছেলেদিগের জন্য একটী ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। একটী মেয়ে, তাহাকে সৎপাত্রস্থ করিতে পারিলেই হয়, আর ভাবনা কি? তারানাথ মাদারিপুর স্কুলে পণ্ডিতি করিতেন। ব্রাহ্মণের বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দিন যাইতেছিল। কন্যা পুণ্যপ্রভা কুলীনের মেয়ে, বয়স্থা হইয়াছেন। পিতার যত্নে এক প্রকার চলন-সই লেখা পড়া শিখিয়াছেন, গীতা, ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণ পুণ্যপ্রভার কণ্ঠস্থ। দেশে যখন হাহাকার উঠিল, পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন, তারানাথ তখন কিরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সমস্ত অবস্থা সংবাদ পত্রে লিখিতে লাগিলেন। এবং নিজের বাড়ীতে অন্নছত্র খুলিয়া ছিলেন। সম্বল কি? টাকা কড়ি প্রায়

পূর্ব্বেই নিঃশেষ হইয়াছিল, অবশিষ্ট টাকায় কদিন চলিবে? সে ভাবনা ঠাকুরের নাই। ঠাকুর লোকের দুঃখ দেখিয়া অস্থির। দুনয়নে দিবানিশি ধারা বহিতেছে। যে বিষয় টুকু ছিল,তাহা বিক্রয় করিলেন। মানুষ, গরু বাছুরের ন্যায় পুত্র কন্যাকে ৫।৭ টাকায় বিক্রয় করিতেছে, স্বামী স্ত্রীকে বিক্রয় করিতেছে, কেহ কেহ পুত্র কন্যার চক্ষের জল সহ্য করিতে না পারিয়া গলায় দড়ি দিয়া, কেহ বা জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে, এ বিষাদ-পূর্ণ দৃশ্য তারানাথ সহিতে পারিলেন না। হায় রে দয়া, তোর আর ঠাঁই নাই, দরিদ্রকে পাগল করিতে, ফকীর করিতেই বুঝি বা তোর জন্ম! মানুষ অনাহারে অনাহারে এমন জীর্ণশীর্ণ হইয়াছে যে, দেখিলে ভয় হয়। চক্ষু কোটরস্থ, কেশ রুক্ষ, শরীর কঙ্কালময়, দলে দলে নরনারী ক্ষুধায় কাতর হইয়া গরু ছাগলের ন্যায় বাড়ী বাড়ী ছুটিতেছে। মৃত্তিকায় একটী তণ্ডুল বা একটী অন্ন বা একটু ভাতের মাড় পাইলে কুকুর বিড়ালের মুখ হইতে কাড়িয়া খাইতেছে! কেহ দুদিন পর এক থালা কচুর শাক সিদ্ধ করিয়া ৪।৫টী পুত্র কন্যা সহ বসিয়াছে, কেহ বা কতকটা কুঁড়া ভাজিয়া লইয়া বসিয়াছে, কেহ কেহ বা ধরায় পড়িয়া ছটফট করিতেছে। চালে খড় নাই, বন্যায় পোতার মাটী ধুইয়া গিয়াছে, ঘরের বেড়া নাই, অসংখ্য অসংখ্য শূকরের ছানা যেন মাতার সহিত কাদায় পড়িয়া ছটফট করিতেছে! দেখে কার সাধ্য? লোকে বলে, লজ্জাশরম নাকি স্ত্রীলোকের একচেটিয়া সম্পত্তি। বঙ্গদেশের দরিদ্র কৃষকগণের সম্বল কেবল নেংটী। আর লজ্জায় ম্রিয়মানা কৃষকবালাদিগের? যার কিছু নাই, সেও স্ত্রী কন্যার জন্য এক এক খানি বস্ত্র দিয়া থাকে! হায়, আর আজ কি ব্যবস্থা? লজ্জাও আজ লজ্জা পাইয়াছে, স্ত্রী-অঙ্গে লজ্জা নিবারণ হয়, এমন কোন বস্ত্র নাই। কেহ ছিন্ন কন্থা, কেহ বা বৃক্ষের পত্রে লজ্জা নিবারণ করিতেছে, আর কেহ ? সে কথা আমি লিখিতে অক্ষম। রৌদ্রের তীব্র তেজ,বৃষ্টির শীতলধারা নিবারণের জন্য ঘরের ছাউনি নাই। নাই ত নাই, কিছুই নাই। শীত নিবারণের আবরণ নাই, শয়নের শয্যা নাই,বসিবার আসন নাই,জল খাইবার মৃণ্ময় পাত্রও নাই! শূন্য স্থানে শূন্য পেটে উলঙ্গ অবস্থায় শত সহস্র মা পুত্র কন্যা কোলে করিয়া মরণের প্রতীক্ষা করিতেছেন! মৃত্যু, তাও আজ দূরে; মৃত্যুও যেন আজ পাষাণ! রোগ, তাও যেন আজ কৃপণ! মায়ের চক্ষের সম্মুখে রোগ মায়ের পরিবর্ত্তে সন্তানকে আগে ধরিতেছে, মৃত্যু আগে সন্তানের কষ্ট লাঘব করিতেছে! মায়ের চক্ষের জল, তাহাও

আজ নাই! মা আজ উন্মাদিনী, পিশাচিনী। মায়ের স্তনে আজ দুগ্ধ নাই, মুখে তৃষ্ণা নিবারণের অমৃতও নাই! মাতৃক্রোড়ে ছেলে মেয়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিতেছে! কে কাকে দেখে, দরিদ্র পাড়ার সকলের অবস্থা একরূপ। ভদ্রলোকদের অবস্থাও আজকাল শোচনীয়। আর দিন চলে না। স্ত্রী-অঙ্গে বস্ত্র নাই কত ভদ্র ঘরে, কে সংখ্যা করিতে পারে? ঘটী বাটী, গরু, বাছুর গিয়াছে, ঢাকীর ঢাক, কৃষকের লাঙ্গল পর্য্যন্ত বন্ধক পড়িয়াছে। মহাজন-দিগের ঘরে তামা, পিত্তল, কাঁসা এবং রূপা আর ধরে না! নরনারী জাতি মান ভুলিয়াছে; মুসলমান হিন্দুর দ্বারে,হিন্দু মুসলমানের দ্বারে আজ জীবনের দায়ে অন্ন-ভিখারী! দয়া কোথায়? দেশের রাজা কোথায়? মুখ তুলিয়া কেহ চাহিবার নাই! যে যেখানে পড়িতেছে, মরিতেছে; মৃতের সৎকার করিতেছে, কুকুর, শৃগাল এবং শকুন! এই সকল চিত্র দেখিয়া তারানাথ ঠাকুর, আজ দয়ার অবতাররূপে অবতীর্ণ! তারানাথের উত্তেজনায় দেশের সম্পাদকবর্গ ক্রমে ক্রমে একটু সদয় হইয়া লেখনী চালনা করিতে লাগিলেন। আগে অবিশ্বাস ছিল অনেকের, বুঝি বা কেহ জুয়াচুরি করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে! প্রথমে সন্দেহ ছিল অনেকেরই, বুঝি বা মিথ্যা দোহাই দিয়া কেহ জমীদারী রক্ষা করিবার জন্য ধন সঞ্চয় করিতে চাহে। হৃদয় গলাইয়া যখন তারানাথ সকলকে আকর্ষণ করিলেন, তখন দয়া যেন অবতীর্ণ হইতে লাগিল! কিন্তু প্রতিবন্ধক, হাতে হাতে! গবর্ণমেণ্টের সম্মান যায়, কি, দেশে দুর্ভিক্ষ? মিথ্যা কথা। গবর্ণমেণ্ট বিরুদ্ধে লাগিলেন। সকল ভাল কাজেরই শত্রু আছে। পৃথিবীতে পরশ্রীকাতর একশ্রেণীর লোক আছে, তাঁহারা কেহ কিছু করিতেছে, তাহা সহ্য করিতে পারে না। অন্যের প্রশংসা করিবে, ইহা কিছুতেই তাহারা সহ্য করিতে পারে না। দশ জন লোক পরের উপকার করিয়া প্রশংসা পাইতেছে, শতজনের সম্মান পাই-তেছে, ইহা সহ্য করিতে পারে কে? অনেক বিখ্যাত ধার্ম্মিকও পারেন না, অনেক ধর্ম্মপ্রচারকও পারেন না। হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা, এই দুই দস্যু এ সংসারের পরদুঃখকাতর মহাজনদিগের হৃদয়ের রক্ত পোষণ করিয়া ধরার পাপভার সর্ব্বদা বৃদ্ধি করিতেছে। কোন কোন খ্যাতনামা হিতৈষীও তারা-নাথের বিরুদ্ধে লাগিলেন; কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, তাহাতে কোন ফল হইল না, দেশের সহৃদয় নর-নারী অযাচিত ভাবে সাহায্য করিতে লাগি-লেন। দয়ার এমন পবিত্র দৃশ্য আর দেখা যায় নাই। দয়ায় ফরিদপুর যেন

সকলের নিকট চির বিক্রীত হইয়া গেল। তারানাথের সাধ্য যাহা, তাহা কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। বিবিকৃষ্ণপুরে তারানাথের কিছু সম্মান ছিল, তাঁহার উত্তেজনায় যাঁহাদের মন মজিয়াছে ও যাঁহাদের অবস্থা কিছু ভাল, তাঁহাদের ঘরে ঘরেই অন্ন-ছত্র বসিয়াছে। কিন্তু এই গ্রামের জমিদার পাষাণ। তারানাথ গরীবের মা বাপ, তাঁহার বাড়ীতে আর লোক ধরে না। প্রত্যহ শত শত লোক অন্ন পাইতেছে! দুঃখীদের মুখে আর কথা নাই, কেবল এই কথা—"হায় রে দানা, হায় রে তেনা!" তারানাথ অধিক কিছু দিতে পারেন না, কেবল ডাল আর ভাত। তাহাতেই সকলে পরিতুষ্ট। তারানাথের অর্থ যাহা ছিল, গিয়াছে; বিষয় যাহা ছিল, গিয়াছে; ঘটী বাটী বন্ধক দেওয়া হইয়াছে; হাওলাত-বরাতে তিনি ডুবিয়াছেন। স্কুলের কাজে ছুটী লইয়া দরিদ্রসেবা করিতেছেন। স্কুলের বেতন একটী টাকাও পাইবেন না। না পাইলেন, সে জন্য তিনি কাতর নহেন; আগে দেশের লোক ত বাঁচুক; তিনি ভাবেন, অসংখ্য লোক যদি রক্ষা পায়, তবে আমরা তিন জন নয় মরিব! ৩ মুষ্টিতে তিন জনের জীবন রক্ষা হইতে পারে, ভাবনা কিসের? ইহা ভাবিয়া বীরের ন্যায়, প্রকৃত মানুষের ন্যায়,দিবারাত্রি তিনি খাটিতেছেন। আর সঙ্গে খাটিতেছেন, পত্নী প্রসন্নময়ী এবং কন্যা পুণ্যপ্রভা। তিনে এক, একে তিন। তিন শক্তি অবতীর্ণ হইয়া বিবিকৃষ্ণপুরকে যেন দেবধামে পরিণত করিতেছে। ত্রিস্রোতা প্রেম নদী যেন আজ ধরায় প্রবাহিতা। পিতা তারানাথ এবং মাতা প্রসন্নময়ীর প্রত্যক্ষ ছবি পুণ্যপ্রভা। পিতৃকুল এবং মাতৃকুলকে উজ্জ্বল করিবার জন্য যেন এই কন্যার আবির্ভাব। দিবানিশি শত শত লোকের আশীর্ব্বাদ এই ত্রিস্রোতা প্রেম-নদীতে তরঙ্গ তুলিতেছে। তিন জন যেন পাগল হইয়াছেন। তিনেরই আহার নিদ্রা গিয়াছে। বিধাতার অপূর্ব্ব দয়া, মানব-সমাজকে রক্ষা করিতে অবতীর্ণ। মানুষ দেখিয়া ধন্য হইতেছে। সত্যই বিধাতার অপূর্ব্ব দয়া!!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নির্ম্মল প্রেমের খেলা।

লোকে বলে, যার কেহ নাই, তার অনেক আছে। যার পুত্র কন্যা নাই, তার অন্তত দুই দশটা বিড়াল কুকুর বা ছাগল গরুও থাকে। তারা-

নাথ দয়ার সাগর, পুত্রহীন, কন্যা একটী মাত্র, কিন্তু তার ঘরে লোক ধরে না। কুলীনের মাতুলের সংখ্যা অনেক, মামা বাড়ীর আত্মীয়েরা বাড়ী পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন। তারানাথের এক বিবাহ, তবুও শ্বশুর বাড়ীর ইষ্ট কুটুম্বের সংখ্যা কম নহে। অনেকেই নিঃস্ব, সুতরাং গাঙ্গুলী বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছে। আপনার কেহ নাই, দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বেও তবু ২০।২৫ খান থালা পড়িত। তারানাথের সংসার সামান্য নহে।

বিধাতা যাঁহাকে হৃদয় দিয়াছেন, তাঁহার এমনই হয়। তিনি অন্যকে খাওয়াইয়া পরাইয়াই সুখী হন। কাহারও নিকট তিনি কিছু উপকার প্রত্যাশা করেন না, কেবল দিয়া এবং খাওয়াই সুখী। এহেন লোকের প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার ভয় নাই, কেননা, তিনি কিছুই প্রত্যাশী নন্। তারানাথ স্বাধীন প্রকৃতির লোক, কাহারও নিকট প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা রাখেন না। প্রত্যাশা রাখেন, কেবল প্রসন্নময়ী এবং পুণ্যপ্রভার। পুণ্যপ্রভা তাঁহার নয়নের মণি, এক মুহূর্ত্ত তাহাকে না দেখিলে তিনি চঞ্চল হন। ধীর পাহাড়ের ন্যায় প্রকৃতিও অস্থির হয়। তীর্থভ্রমণের সময় তিনি এজন্য প্রসন্নময়ী ও পুণ্যপ্রভাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। পুণ্যপ্রভা তাহার পিতার বড় আদরের মেয়ে, পিতার দক্ষিণ হস্ত বলিলেও হয়। পুণ্যপ্রভা যেন বৃদ্ধের হাতের নড়ী,—পুণ্যপ্রভা বসিয়া তারানাথকে খাওয়ান, কাজের সময় পরামর্শ দেন, শয়নের সময় মাথায় হাত বুলাইয়া দেন। পুণ্যপ্রভা বয়স্থা, তবুও বাবার সহিত রাত্রে শয়ন করেন। পুণ্যপ্রভা রূপে গুণে যেন দ্বিতীয় তারানাথ। অথবা পুণ্যপ্রভা যেন তারনাথের একটী হোমিওপ্যাথিক ডোজ। যদি পুণ্যপ্রভা কন্যা না হইয়া পুত্র হইতেন, তবে তারানাথের বংশের সম্মান রাখিতে পারিতেন। পুণ্যপ্রভাও পিতৃগত-প্রাণা; পিতাকে মুহূর্ত্ত না দেখিলে অধীরা হন এইত অবস্থা। স্কুলের সময়টা পুণ্যপ্রভা ও তারানাথের পক্ষে যেন শতবর্ষ! মাদারিপুর হইতে ৫।৬ মাইল দূর হইলেও, তারানাথ প্রত্যহ বাড়ী হইতে স্কুলে যাতায়াত করিতেন। লোকে বলে, কন্যা স্বভাবত কিছু পিতৃভক্ত হয়। সে কথা পুণ্যপ্রভার জীবনে পূর্ণমাত্রায় সফল হইয়াছে।

তারানাথের কথা লইয়া যখন একখানি পুস্তক হইতে চলিল, তখন তারানাথের বাড়ীর নক্সাটা একবার আঁকিয়া দেওয়া উচিত। কোন মকদ্দমা উপস্থিত হইলে, যত গোল নক্সা লইয়া হয়। তারানাথের বাড়ীর ছবিটা পাঠক মনে একবার আঁকিয়া রাখুন।

বিধিকৃষ্ণপুর একখানি কুলীন ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রাম, এখানে গাঙ্গুলী বংশের প্রাধান্য। বিধিকৃষ্ণপুরের নীচে কুমার নদী প্রবাহিত,এইনদী মাদারিপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। তারানাথের বাড়ীর নিকটে, দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণে একটি প্রাচীন পুকুর আছে, তাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঘাট বাঁধা। পুকুরের পাড়ে তাল-তেতুল, আম-কাঁটালের গাছই অধিক, মধ্যে মধ্যে দুই চারিটী নারিকেল-গুপারীর গাছ। বর্ষার জল এই পুকুরে অবাদে প্রবেশ করিতে পারে। এই পুকুরে পাড়ার মেয়েরা যাওয়া আসা করিয়া থাকে। অন্তঃপুরে আর পুকুরাদি নাই। অন্তঃপুরে চারি পোতায় চারি খানি বড় ঘর এবং তদ্ভিন্ন একখানি রান্নাঘর ও একখানি ঢেকি ঘর আছে। বাড়ীর চত্তাল খুব বড়। বাহির বাড়ীতে এক খানি সুন্দর মণ্ডপ। মণ্ডপের পাশে ঠাকুর ঘর, ঠাকুর ঘরে জগদম্বার প্রস্তরময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা। ইহা ভিন্ন অতিথির জন্য তিন পোতায় তিন খানি বড় ঘর, দুই খানি থাকিবার এবং এক খানি রন্ধন করিবার। মণ্ডপের সম্মুখে একখানি প্রকাণ্ড আটচালা। মণ্ডপ দক্ষিণ-দ্বারী, মণ্ডপের পূর্ব্ব কোণে একটী বেল গাছ, উত্তরে একটী বকুল গাছ ও একটী আমলকীর গাছ। তার উত্তরে বিস্তৃত ফুলের বাগান। দেশীয় নানাবিধ ফুল গাছে বাগান পূর্ণ। ফুলের বাগানের উত্তরে ফলের বাগান। বাগানে আম, জাম, নারিকেল ও গুপারির গাছই অধিক। বাগানের পর একটী রাস্তা। রাস্তার উত্তর ধারে কয়েকটী প্রাচীন ঝাউগাছ। ঝাউগাছের পরই নদী। নদী হইতে একটী সোজা রাস্তা বাগানের পশ্চিম ধার দিয়া, অতিথিশালায় মিশিয়াছে। অতিথিশালা, নামান্তরে বৈঠকখানা। বাগানের পশ্চিমের রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে দরিদ্র-ছাত্রাবাস, এবং স্কুল। স্কুলের উত্তরেও রাস্তা। রাস্তার পর ঝাউগাছ এবং তার পরই নদী। অন্তঃপুরের দক্ষিণের ঘরের দক্ষিণে গুপারি ও নারিকেল গাছের প্রকাণ্ড বাগান। সমস্ত বাড়ীতে প্রায় বিশ বিঘা জমী হইবে। আর কিছু থাকুক না থাকুক, প্রাচীন বাড়ীতে অনেকটা জমী,অনেক গুলি ঘর এবং অনেকগুলি গাছ আছে। বাড়ীর উৎপন্ন ফল বিক্রয় করিলেও এক ছোট পরিবারের সম্বৎসর দিনপাত হইতে পারে। কিন্তু তারানাথের তাহা হয় না। ফলাদি পাড়ার ছেলেরা পাড়িয়া খায়, নারিকেল গুপারি প্রায়ই বিতরণে যায়, অবশিষ্ট দ্বারা বার মাসের তের পার্ব্বণ চলে। আপাততঃ বাড়ীর বর্ণনা এই খানেই ইতি। তারানাথ যে পুকুর কাটাইয়াছেন, তাহা বাড়ী হইতে অনেক দূরে, দরিদ্র কৃষক-পল্লীর মধ্যে।

পুণ্যপ্রভা সখী-সহ বাড়ীতে আসিলেন। দেবী প্রসন্নময়ী আজ কিছু অন্য-মনস্কা, কিন্তু বিষাদে তত কাতর নহেন। তিনি সন্ধ্যা করিবার জন্য ঘাটে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে পুণ্যপ্রভা সখী-সহ বাড়ী আসিলেন। পুণ্যপ্রভা ও দীপ্তি আসিতেছে দেখিয়া মাতা পাশ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং পুণ্যপ্রভাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই আজ এমন হলি কেন? কর্ত্তা যাইবার সময় তোকে কি বলে গেলেন? বিপদের সময় ধৈর্য্য চাই, জানিস্ না কি?

পুণ্যপ্রভা বলিলেন, বাবা শীঘ্রই আসিবেন, বলেছেন। বাবার জন্য আমি তত কাতর নই, তবে কাল্‌কার যজ্ঞের উপায় কি হবে, তাই ভাব্‌ছি।

প্রসন্নময়ী।—তিনি এত দিন চালাইলেন, তুই একদিনও পার্‌বি নে? তবে ত খুব তাঁর নাম রাখ্‌বি দেখ্‌ছি!

পুণ্যপ্রভা।—মা, তুমি কি জান না, বাবা ছাড়া আমার পৃথক অস্তিত্ব নাই। তাঁর শক্তিতেই আমি শক্তিমতী। তিনি গিয়াছেন, আমি একাকিনী কি করিতে পারি?

প্রসন্নময়ী।—সকল শক্তিই জগদম্বার, তাঁকে ডাক, তিনি শক্তি, বুদ্ধি ও বল দিবেন। যিনি লজ্জা রাখেন ও গরীব বাঁচান যদি, কোন ভয় নাই। তুই অধীর হস্‌নে। আমি সন্ধ্যা শেষ করে আসি, তখন পরামর্শ হবে।

দীপ্তি মায়ের কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া বলিলেন, দেখ্‌লি পুণি, মায়ের কেমন বিশ্বাস। ভয় কি? যা করেন, জগদম্বা।

পুণ্যপ্রভা বলিলেন, আয় দীপ্তি, বাগানের ধারের ধারা স্থান যাইয়া বসি।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, পাখী সন্ধ্যার ডাক ডাকিয়া ডাকিয়া নীরব হইয়াছে। এবার দারুণ বর্ষা হয় নাই, যে বর্ষায় নদীর কূল ভাসায়, এবার সে বর্ষা নাই, তবুও বর্ষার স্রোত বাগান পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, কূলে ২ জল, নদীতে জল থৈ থৈ করিতেছে। মাঠের ধান ক্ষেত্র জলে ভরা, এবার আশ্বিনের মাঠ ধানে ভরা। গবর্ণমেণ্ট বীজ-ধান্যের সাহায্য করায়, প্রচুর ধান হইয়াছে। আর ২।৩ মাস গেলেই লক্ষ্মী প্রসন্না হন, কাঙ্গাল গরীব বাঁচে। মৃদু বায়ু বহিতেছে, অন্তঃপুরের বাগানের নারিকেল গাছ ও গুপারি গাছের পাতায় পাতায় লাগিয়া মধুর শব্দ হইতেছে। ঝাউগাছের সহিত বায়ুর নিত্য সম্বন্ধ, অনবরত সোঁ সোঁ শব্দ হইতেছে। জগদম্বার ঘরের সন্ধ্যার আরতি শেষ হইয়াছে। বাড়ী এখন এক প্রকার নিস্তব্ধ হইয়াছে। দারুণ ঝড়ের পর প্রকৃতি স্বভাবতই নিস্তব্ধ হয়। হায়, আজ বাড়ীর উপর দিয়া

যে ঝড় বহিয়া গিয়াছে! বাড়ীর কর্ত্তা আজ বাড়ীতে নাই, আজ যেন বিজয়া দশমী। প্রতিমা বিসর্জ্জনের পর মণ্ডপের যে দশা হয়, আজ বৈঠকখানার সেই দশা। লোক আসিয়া চুপে চুপে, বিষণ্ণ মনে কেবল সংবাদ লইয়া চলিয়া যাইতেছে। চারিজন পরিচারক আছে, তাহারা সমস্ত দিন খাটিয়া খাটিয়া এখন অবসন্ন দেহে শয্যার আশ্রয় লইয়াছে। মাতা সন্ধ্যা করিতে সেই ঘাটে গিয়াছেন। পুণ্যপ্রভা দীপ্তির হাত ধরিয়া লইয়া যাইয়া বারাণ্ডায় বসাইলেন। বসাইলেন এবং পার্শ্বে আপনিও বসিলেন। পুণ্যপ্রভা দীপ্তিকে বসাইয়া বলিলেন—দ্যাখ্, তুই ও আমি যেন এক মায়ের পেটের যমক বোন্। চেহারা এক, স্বভাব এক, বয়স এক, সবই যেন এক। আমিও মাকে মা বলিয়া ডাকি, তুইও ডাকিস্। আমি মরিলে মায়ের কোল্ জুড়ে তুই থাকিস্, কেমন দীপ্তি?

দীপ্তি।—এ তোর কি ছাই কথা? মরণের কথা কেন? ও সব ছাই কথা রেখে দে। আমি তোকে কাল্‌কার একটা গল্প বল্‌ব যে বলেছিলাম, আজ তাহা শোন্। কাল প্রাতে আমি ঠাকুর মায়ের সহিত নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিলাম, লীলা, সরলা, তিলোত্তমাও গিয়াছিল। স্নানের পর আমরা ঘাটে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময়ে একখানি নৌকা ঘাটে লাগিল। আমরা একটু ব্যস্ত হয়ে ঘাটের এক পার্শ্বে সঙ্কুচিত ভাবে দাঁড়াইলাম, ঘাটে কাকা ও মেসোও ছিলেন। নৌকাখানি ছোট, ডিঙ্গির ন্যায়। নৌকা ঘাটে লাগিলে একজন ভদ্রলোক ছইয়ের বাহিরে আসিয়া বলিলেন—"এই গ্রামের নাম কি বিধিকৃষ্ণপুর? এ গ্রামের দরিদ্র লোকদিগের অবস্থা কেমন?"

কাকা উত্তর করিলেন, এই গ্রামের নামই বিধিকৃষ্ণপুর; আপনার নিবাস কোথায়?

ভদ্রলোক বলিলেন, আমার নিবাস এই দেশেই, আমি দুর্ভিক্ষের সাহায্যের জন্য আসিয়াছি। আপনাদের গ্রামের অবস্থা কেমন?

কাকা সমস্ত কথা বলিতে লাগিলেন, আর সেই ভদ্র লোকের দুনয়ন হইতে শ্রাবণের ধারার ন্যায় জল পড়িতে লাগিল। আমি এমন পবিত্র দৃশ্য আর দেখি নাই। না খাইয়া লোক মরিতেছে, এ কথা শুনিয়া তিনি বালকের ন্যায় হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সে এক স্বর্গীয় শোভা। সে মূর্ত্তি দেখিয়া ধন্য হইয়াছি। ইচ্ছা হয়েছিল তোকে ডাকিয়া সে মূর্ত্তি দেখাই, কিন্তু তিনি অধিকক্ষণ থাকিলেন না। কাকা যে সকল গ্রামে

অধিক লোক মরিতেছে বলিলেন, তিনি নৌকা ভাসাইয়া সেই দিকে গেলেন। ইচ্ছা হয়েছিল, তাঁহাকে প্রণাম করি। লজ্জায় তাহা পারি নাই, কিন্তু মনে মনে শত প্রণাম করেছি। মানুষটী যেন স্বর্গের দেবতা!

পুণ্যপ্রভা বলিলেন, তাঁর নাম কি ভাই?

দীপ্তি।—কাকার কথার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তাঁহার নাম "প্রেমাঙ্কুর।" যেমন নাম, তেমনি রূপ, তেমনি গুণ। সে মূর্ত্তি যেন প্রেমের খনি। প্রেমে মাতিলে লোকের সৌন্দর্য্য বাড়ে, তাহা তোর বাবার মূর্ত্তি দেখিয়া টের পেয়েছি, কিন্তু এত বাড়ে, জানিতাম না। আমি ঐ রূপে একেবারে মজেছি।

পুণ্যপ্রভা হাসিয়া বলিলেন, তবে সেই নৌকায় উঠে গেলি না কেন? তিনি প্রেমিক, প্রেমিকার মন বুঝিয়া অবশ্যই তোকে নৌকায় স্থান দিতেন। তিলোত্তমা, লীলা ও সরলা উলু দিয়া শাঁক বাজাইয়া দিতে পারিল না?

দীপ্তির মুখ আরক্তিম হইল। গৌরাঙ্গিণীর রূপ অল্পেই রূপান্তরিত হয়, ক্রোধেও হয়, লজ্জায়ও হয়, অভিমানেও হয়। এখানে তিনই উপস্থিত। ছিল সোণার বর্ণ, হইল যেন গোলাপ। দুবিন্দু চক্ষের জলও টস্ টস্ করিয়া পড়িল, দীপ্তি আর কথা বলিতে পারিলেন না।

পুণ্যপ্রভা বলিলেন, বুঝেছি, সত্যই তোর মন মজেছে। প্রেমাঙ্কুর বাবু কোথায় গেলেন দীপ্তি?

দীপ্তি রাগ করিয়া এবার পুণ্যপ্রভার গালে ছোট রকমের একটী চড় মারিলেন এবং চিবুক ধরিয়া বলিলেন, আমি ত আর তোর ন্যায় রূপের ব্যবসা করতে বসি নাই, বুঝা যাবে, আগে কে ঘরের বাহির হয়!

কথাটার মধ্যে একটু ইতিহাস ছিল, সুতরাং পুণ্যপ্রভার মুখও উপরোক্ত তিন কারণে ঈষৎ আরক্তিম হইল। কথাটা চাপা দিতে এবার পুণ্যপ্রভার একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু দীপ্তি ছাড়িবেন কেন? দীপ্তি বলিলেন—"এবার বুঝি নিজের গায়ে লেগেছে? আমি যদি মজে থাকি, তবে পবিত্রতার মূর্ত্তি দেখে মজেছি, আর তুই কেমনে অধার্ম্মিকের টাকা, বাবুগিরি ও সৌন্দর্য্য দেখে ভুলেছিলি? যে বাহিরের রূপ দেখে, সে বুঝিবে কি, আমি কি এবং কি চাই? আমি চাই তোর মত হৃদয়খানি, আমি চাই সেই প্রাণ, যাহা পরের জন্য পাগল। কুলীনের ঘরে তুইও জন্মেছিস্, আমিও জন্মেছি, আমাদের

কপালে বিবাহে সুখ নাই নিশ্চয়। তবে আদর্শ অবশ্যই ধরিয়া থাকিব। মনে আদর্শ আঁকিয়া সেই আদর্শ জপিয়া জপিয়াই নয় মরিব। মনের সহিত অবশ্যই আদর্শকে ভালবাসিব। আদর্শ ছাড়িয়া কিরূপে বাঁচিব? বলিতে কি, আমি যদি চিরদিন "প্রেমাঙ্কুর" বাবুর আদর্শ ধরিয়া দরিদ্র-সেবা করিতে পারি, তবে কৃতার্থ হই।

পুণ্যপ্রভা এবার লজ্জায় মাথা হেট করিলেন। বলিলেন, দীপ্তি, তুই ঠাট্টাও বুঝিস্‌নে? আমি তাঁকে দেখি নাই, কিন্তু তাঁর নাম অনেকবার শুনেছি, আমার বাবা, আমার মা যে সকল মহাজনের নাম নিত্য স্মরণ করেন, এ নাম তাহার মধ্যে একটী। তাঁহাকে প্রণাম করি। পুণ্যপ্রভা সত্যই করজোড়ে প্রেমাঙ্কুর বাবুর উদ্দেশে প্রণাম করিলেন এবং পুনঃ বলিলেন, তোর হৃদয় আর আমার হৃদয় অনেক তফাৎ। তুই ধর্ম্ম কর্ম্ম বুঝেছিস্‌, তুই প্রেম পুণ্য বুঝেছিস্‌। আমি কিছুই জানিনে; আমি জানি কেবল "বাবা"। বাবার জন্য আজ মন খারাপ। তাই কি বল্‌তে কি বলেছি, তুই আমাকে ক্ষমা করিস্‌। দ্যাখ্‌ দীপ্তি, তুই রাগ কর্‌লে আমার আর কথা বল্‌বারও লোক নাই।

পুণ্যপ্রভা যতই চাপা দিন্‌, পিতার বিচ্ছেদে প্রাণটা আজ বড় তরল হইয়াছে। তার উপর এই সকল কথা। তরল প্রাণে দীপ্তির অভিমান সহিল না। দীপ্তির অভিমান পুণ্যপ্রভার তরল প্রাণের চাঞ্চল্যকে একটু অবসর দিল। পুণ্যপ্রভার দু নয়নে জলধারা পড়িতে লাগিল।

দীপ্তি দেখিয়া অবাক্‌। দীপ্তির মুখের মেঘও, কি জানি কেন, বারিবর্ষণ করিতে লাগিল। বিষাদ-মেঘ, লজ্জা, অভিমান ও ক্রোধে বদনের উপর প্রকাশিত হইয়া যেন ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, একদিকে বর্ষণ দেখিয়া সেও, বোধ হয়, সহানুভূতির জোরে জল হইয়া মাটীতে নামিতে লাগিল। দুই সখীই কাঁদিলেন প্রচুর। একি বিদায়-বিচ্ছেদের ক্রন্দন? কালের গর্ভে কি আছে, কে জানে!

দীপ্তি ও পুণ্যপ্রভা উভয়ে উভয়ের চক্ষু বস্ত্রাঞ্চলে মুছাইলেন। আবার উভয় মুখে, বারিবর্ষণের পর বিমল জোৎস্না হাসিল, উভয়ে উভয়ের হাত ধরিয়া উভয়ের মুখ চুম্বন করিলেন। ভালবাসা যেন জীবন্ত আকার ধারণ করিয়া উভয়ের মুখে বিকশিত হইল। লেখক বলেন, বাল্য-প্রেম, তুই বাঁচিয়া থাক্‌, ক্ষণপ্রভা তোরই; মুহূর্ত্তে হাসাইতে, মুহূর্ত্তে মাতাইতে, মুহূর্ত্তে

কাঁদাইতে কেবল তুই জানিস, তোর ন্যায় পবিত্র জিনিস আর কিছুই নাই, বাল্য-ভালবাসা, তুই বাচিয়া থাক্।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রেমের হাটে রূপের বিনিময়।

প্রকৃতি যখন হাসিল, তখন হৃদয় মনও প্রফুল্ল হইল। দুর্দ্দিন-অমাবস্তার অন্ধকারের পর যেন আবার পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছে। দুই সখী আবারও মধুর আলাপ করিতে লাগিলেন। মা প্রসন্নময়ী সন্ধ্যা শেষ করিয়া কি যেন ভাবিতে ভাবিতে অন্য ঘরে যাইয়া বসিয়াছেন। কন্যাকার যজ্ঞের জন্য কিছু চাউল ধার করিবেন, সেটাও ইচ্ছা ছিল। তিনি এখনও ফিরেন নাই। দুই সখী প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতেছেন।

দীপ্তির মনটা জুড়িয়া বসিয়াছেন, আজ দুদিন "প্রেমাঙ্কুর"। সুতরাং থাকিয়া থাকিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁর কথা এবং তাঁর রূপই মনে জাগিতেছে, সেই কথার প্রসঙ্গ করিতেই ইচ্ছা হইতেছে। বুঝি বা অনুরাগের পূর্ব্ব লক্ষণ এই প্রকার। পুণ্যপ্রভার মনে কেবল পিতার কথা জাগিতেছে, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সেই কথাই তুলিতে তাঁহার ইচ্ছা। দুই সখীর আজ মনের মিল হইতেছে না। যখন মন মিলে না, তখন কথায় কথায় সামান্য সামান্য বিষয়েও ঝগড়া হয়। আজ হইতেছেও তাই। এ ত আলাপ নয়, এক খানি তর্কের জাহাজ, ধূম, বাস্প উদ্গীরণ করিতে করিতে যেন গাঙ্গুলীবাড়ীর উপর দিয়া আজ যাইতেছে। এই জাহাজটা কিরূপ, একবার দেখিয়া যাই।

দীপ্তি বলিতেছেন, রমণী সুন্দর না পুরুষ সুন্দর, পুণি, বলত ?

পুণ্যপ্রভা।—বাবা বলেন, সুন্দর মাতৃমূর্ত্তি। বাবা পুরুষ অপেক্ষা রমণীর সৌন্দর্য্যেরই অধিক পক্ষপাতী, তিনি বলেন, রমণী সৌন্দর্য্যের আকর। তিনি বলেন, রমণীর শরীর ও মন, দুই সুন্দর। এই কারণে তিনি জগদম্বার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। নারায়ণ-বিগ্রহ আমাদের বাড়ীতে নাই বলিয়া কত লোকে কত কথা বলে ; বাবা সে সকল কথায় কর্ণপাতও করেন না। আমি দুই চারি দিন বাবাকে বলেছিলাম যে, বাবা এজন্য লোকেরা তোমাকে নিন্দা করে। বাবা তদুত্তরে বলেছিলেন, "করুকগে, সে সব কথায় কাণ দিওনা, আমার

কর্ত্তব্য করিয়া যাই, নিন্দুকদের কর্ত্তব্য তাহারা স্বাধীনভাবে করুক। নিন্দুকের কথা শুনে চল্‌তে গেলে, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব গঙ্গায় ভাসাইয়া কেবল স্বার্থ লয়ে থাক্‌তে হয়।" বাবা বলেন যে, মাতৃমূর্ত্তির সমতুল্য সৌন্দর্য্য এ জগতে আর নাই। কিন্তু ভাই, আমার মনে হয়, বাবার এস্থলে একটু ভুল আছে। আমার ত মনে হয়, পিতৃমূর্ত্তিই শোভার ভাণ্ডার। দীপ্তি, তুই কি বলিস্?

দীপ্তি।—প্রেমের চক্ষে দেখিলে সবই সুন্দর দেখায়; কুৎসিতও সুন্দর হয়। মা কুৎসিৎ ছেলেকেও সুন্দর দেখেন। এ গেল এক কথা। অন্য কথা এই, যার মধ্যে যা নেই, তাকেই মানুষ অধিক সুন্দর দেখে। পুরুষ ও রমণী পৃথক মূর্ত্তি, উভয় তুল্য নয়, পুরুষে যা আছে, রমণীতে তা নেই, রমণীতে যা আছে, পুরুষে তা নেই। এজন্যই পুরুষ রমণীকে এবং রমণী পুরুষকে অধিক সুন্দর দেখে। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, রাধিকা সুন্দরী; শ্রীরাধিকা বলেন, শ্রীকৃষ্ণ সুন্দর। বিবাদ ভঞ্জন করে কে? লোকে বলে, সোণার বরণ নাকি বড়ই আদরের, কিন্তু দ্যাখ্, কালমাণিকের কালরূপের জন্য সোণার বরণ রাধিকা পাগলিনী। আমার সত্যই মনে হয়, যার যেটী নাই, তার সেইটীই ভাল লাগে। সৌন্দর্য্য কেবল মনের খেয়াল, কেমন পুণি?

পুণ্যপ্রভা।—আমি মনের খেয়াল স্বীকার করি না, সৌন্দর্য্য পদার্থটা তুমি উড়াইয়া দিতে চাও, আমি তা মানি না। সুন্দর যাহা, তাহা চিরদিনই সুন্দর। আকাশের চাঁদ সুন্দর, গাছের ফুল সুন্দর, নদীর তরঙ্গ সুন্দর, বালকের হাসি সুন্দর, কোকিলের গান সুন্দর, পিতার স্নেহ সুন্দর। বল ত এ সকল কার নিকট সুন্দর নয়?

দীপ্তি।—যে ব্যক্তি ঐ সকলের সৌন্দর্য্য দেখে না, বুঝে না, তার নিকট সুন্দর নয়, এ ত সোজা কথা। চাঁদের জোৎস্নায় আত্মহারা হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ উচ্ছ্বসিত সমুদ্র-বক্ষে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন, সে একটী ঘটনা; আর তুমি আমি কত বার চাঁদ দেখেছি, কিন্তু আত্ম উৎসর্গ করিতে ইচ্ছা হয় কই? সৌন্দর্য্য-বোধ উহাকে বলে না, একটু ভাল লাগিল, একটু মন্দ লাগিল, সে কথা কথাই না; সৌন্দর্য্যানুভূতিতে আত্মলোপ হইবে। আপনাকে যাহা ভুলাইবে, তাহাই সুন্দর। সৌন্দর্য্যে তন্ময়ত্ব না জন্মিলে আর সৌন্দর্য্য কিসের? পতঙ্গের নিকট সুন্দর আলোকের রশ্মি; পতঙ্গ তাহাতে পুড়িয়া মরিবেই! ইহাই ত সৌন্দর্য্যবোধ। ভেবে দ্যাখ্ ত পুণি, কথা ঠিক কি না?

পুণ্যপ্রভা বিরক্ত হইলেন, সকলের কূল পাওয়া যায়, তর্কের কূল পাওয়া

যায় না। যে যেমন বুঝে, সে সেইরূপই বলে, সেইরূপই ভাবে। একজন অন্যের কথায় মন দেয় না, সুতরাং কথায় কথা বাড়ে বই কখনও কমে না। তর্কবাগীশদিগের শ্রাদ্ধের ঝগড়া, পাতে লুচি তরকারি না পড়িলে আর থামে না। লাভ যে বড় কিছু হয়, তাহাও নয়। কেবল, বকাবকিই সার। পুণ্যপ্রভা দীপ্তির কথা মানিতে চাহেন না, তিনি বলেন, সৌন্দর্য্য নামক এমন একটা জিনিস আছে, যাহা সকলের নিকটই সুন্দর, মনের তারতম্যানুসারে তাহা বিভিন্ন হয় না। বিরক্তি সহকারে বলিলেন, তবে দীপ্তি, তোর নাক, তোর হরিণের ন্যায় নয়ন, গোলাপের ন্যায় কপোল, প্রশস্ত ললাট, মাথার সুদীর্ঘ কাল চুল, এ কিছুই সুন্দর নয়? তোতে ত কেহ আজও তন্ময় হয় নাই, তবে তুই কুৎসিৎ, না? তর্কবাগীশের টোল এখন বন্ধ হউক, কি ছাই কথা তুলেছিস্? আমার মনটা বাবার জন্য আজ বড়ই অস্থির হচ্ছে, এখন থাম্।

দীপ্তি।—তুই জানিস্ কেবল বাবা, কেবল বাবা, তোর বাবা তোকে একেবারে গ্রাস করে ফেলেছেন। এই দ্যাখ্, প্রেমে, তোর বাবাই জগতে কেবল তোর নিকট সুন্দর, তোর নিকট আর কোন বস্তু ভাল নয়, আর কোন রূপই সুন্দর নয়। দৃষ্টান্ত দেখাইলাম, ভেবে দ্যাখ্, কার কথা সত্য?

পুণ্যপ্রভা।—তবে তোর নিকট কে সুন্দর?

দীপ্তি।—আমি বুঝি কেবল দয়া, পবিত্রতা আর প্রেম। আমার নিকট এই সকলই সুন্দর। আমার নিকট তুই সুন্দর, তোর বাবা সুন্দর, আর সুন্দর—

পুণ্যপ্রভা।—থেমে গেলি কেন? আর সুন্দর প্রেমাঙ্কুর বাবু, না? এখন "কূল তেজে অকূলে" ঝাঁপ দে। আর কেন, গলায় দড়ি দিয়া মরগে। একবার দেখেই প্রেমটা গজাইয়া উঠিল, আমি এ সকল বুঝি না। এ তোর নাটকের প্রেম রেখেদে। স্বভাব জানিস্‌নে, প্রকৃতি জানিস্‌নে, বংশ জানিস্‌নে, দেখা আর মজা। এ দুর্গেশনন্দিনীর ভালবাসা, সৌন্দর্য্য-বোধ তুই রেখে দে, এখন ক্ষান্ত হ।

দীপ্তি।—যখন হয়, এইরূপই হয়। বিদ্যুৎ মুহূর্ত্ত মাত্র চমকায়, তাতেই সব আলোকিত হয়। দেবতার সম্ভোগ, মুহূর্ত্ত মাত্র। এক মুহূর্ত্ত দেব-দর্শন হইলে কোটী বৎসর তপস্যা সফল। প্রেমাঙ্কুরের ইতিহাস তুই কিছু জানিস্‌নে, তাই এত কথা।

পুণ্যপ্রভা।—তবে তর্কবাগীশ মহাশয় এখন জটা বাঁধিয়া তপস্যায় নিযুক্ত

হউন আর কি? গৈরিক পরিয়া বটগাছ তলায় আশ্রয় লউন আর কি? দেব-দর্শন ত আপনার হইয়াছে, আর চাই কি? দিবানিশি জপিতে থাকুন, প্রেমাঙ্কুর, প্রেমাঙ্কুর, প্রেমাঙ্কুর।

দীপ্তি।—সত্যই আমি বটগাছ তলায়, তোকে এবং তোর বাবাকে গলার হার করিয়া তপস্যায় বসিতে চাই। সত্যই, "নারী না করিত বিধি, তুয়া হেন গুণনিধি লইয়া ফিরিতাম দেশে দেশে।" ধরা না দিস্, দেশান্তরে চলে যাস্, আজীবন কেবল তপস্যাই করিব। সুন্দর,অতি সুন্দর আমার নিকট এ জগতে কেবল প্রেম, দয়া ও পবিত্রতা। পরদুঃখ শ্রবণে যার নয়নে জল, আমার নিকট সে-ই কেবল সুন্দর। সুন্দর খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, গৌরাঙ্গ, সুন্দর পুণ্যপ্রভা, তারানাথ, আর সুন্দর প্রেমাঙ্কুর।

পুণ্যপ্রভা।—ঐ কথাই বল, সোজাসুজিই ভাল, ঘোর পেঁচের আর দরকার কি? আয় তোর শিঁথীতে আজ সিন্দূর দিয়া দি, বাসর ঘর সাজাইয়া দি! আজ ঘোর বিপদের দিনে মহা আনন্দে নিমগ্ন হই।

দীপ্তি ইহার পর আর কথা বলিতে চাহিলেন না, পুণ্যপ্রভাকে আজ অন্য-মনস্ক করাই তাঁহার কাজ, এত তর্কের পর বুঝিলেন যে, তাহা সফল হইতেছে না, তর্ক বৃথাই যাইতেছে। একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তবে আজ ভাই ঘরে যাই।

পুণ্যপ্রভা বলিলেন, একটু দাঁড়া, মা ঘরে আসুন, তার পর যাবি। তুই গেলে আমি আজ একাকিনী কেমনে থাকিব? লীলা,তিলোত্তমা, সরলাও আজ আসিল না। আজ বাবা বাড়ী নাই, এবাড়ী খালি,জানিস্ না? একটু দাঁড়া। এই কথা বলিয়া কি ভাবিয়া পুণ্যপ্রভা, আসিতেছি, বলিয়া সহসা উঠিলেন। ছুটিয়া ফুলের বাগানে গেলেন। আঁচল পাতিয়া শেফালিকা ফুলের গাছ নাড়া দিলেন,টুপ টুপ করিয়া রাশি রাশি ফুল আঁচল ভরিয়া পাড়িল। অর্দ্ধস্ফুট জবা তুলিলেন, স্থলপদ্ম তুলিলেন, নীলপদ্ম ও টগর তুলিলেন, যাহা যাহা পাইলেন, কাপড় ভরিয়া তুলিলেন। পুণ্যপ্রভা হয়ত সামান্য কোন কাজের জন্য গিয়াছে ভাবিয়া, দীপ্তি অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া আছেন। ক্ষণকালের মধ্যে পুণ্যপ্রভা ফুলের রাশি লইয়া উপস্থিত হইলেন দেখিয়া দীপ্তি একটু বিমোহিত এবং অপ্রতিভ হইলেন। কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই পুণ্যপ্রভা নানা ফুলে দীপ্তিকে সাজাইয়া তুলিতে লাগিলেন। দীপ্তিও, এই অবসরে, পুণ্যপ্রভার অঙ্গের যেখানে সেখানে ফুল গুজিয়া দিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দুই জনই

অপরূপ সাজে সাজিলেন। পুণ্যপ্রভা ঘর হইতে প্রদীপ লইয়া আসিলেন, ফুলের শয্যা রচনা করিলেন, তারপর বলিলেন, দ্যাখ্ দেখি দীপ্তি, আজ কে সুন্দর!! তোর চেয়ে সুন্দর এ জগতে আর কেহ নাই,তুই পদ্মাবতী,তুই লীলাবতী, তুই গৌরী, তুই শ্রীরাধিকা। রূপ রূপ করিস্, তুইত রূপের ভাণ্ডার। এই কথা বলিয়া দুই হাতে ফুলের রাশি তুলিয়া দীপ্তির চরণে অঞ্জলী দিলেন এবং বলিলেন, দীপ্তি, দীপ্তি, পুণ্যময়ি, শোভাময়ি, শান্তিময়ি, বিমলে, বিরজে, সরলে, আমার এই নির্ম্মল ভালবাসা আজ তুই গ্রহণ কর্, এই সামান্য অঞ্জলী তুচ্ছ করিস্ নে।

দীপ্তি দেখিয়া অবাক্, এ সকল ছেলেখেলার কথা দীপ্তি স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

পুণ্যপ্রভা বলিলেন, তোর আজ শুভ বিবাহ হইল, আমি উলু দিই। এই বলিয়া সত্যই, পুণ্যপ্রভা,উল্লাসে, উৎসাহে, নৈশগগন কাঁপাইয়া মধুর হইতেও মধুর স্বরে উলুধ্বনি করিলেন।

দীপ্তি দেখিয়া অবাক্। ভাবিলেন, এ কি দেবতার লীলা? দীপ্তি দেখিয়া অবাক্। ক্ষণকাল পর দীপ্তি বলিলেন, কার সঙ্গে আমার বিয়ে দিলি পুণি?

পুণ্যপ্রভা।—তোর প্রেমের আদর্শ যাহা,তাহার সহিত, অর্থাৎ প্রেম, দয়া, ও পবিত্রতার সহিত। অর্থাৎ তোর প্রেমের আদর্শ "প্রেমাঙ্কুরের" সহিত। তুই আজীবন সতী এঁয়ো হয়ে থাক্, চিরদিন তোর শিঁথীতে সিন্দূর থাকুক। মা জগদম্বা আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

এই সকল কথা শুনিয়া দীপ্তির হৃদয়ও, কি জানি কেন, আজ বিমল আনন্দে পূর্ণ হইল, তিনি বলিলেন, তোর প্রার্থনা পূর্ণ হউক, আমি যেন চিরদিনই প্রেম, দয়া ও পবিত্রতা-গত-প্রাণা হইয়া থাকিতে পারি। চিরদিন, জন্ম জন্মান্তর প্রেমাঙ্কুর আমার আদর্শ হইয়া থাকুন।

এইরূপ সৌন্দর্য্যের হাটে আশ্চার্য্য বিনিময় চলিতেছে, এমন সময়ে পাড়ায় ভয়ানক গোল উপস্থিত হইল। সে সকল কথা বলিবার পূর্ব্বে, আমরা দেবী প্রসন্নময়ী কোথায়, একবার দেখিয়া আসি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভীষণ পাপের মন্ত্রণা।

নিদিরকৃষ্ণপুরে দুই চারি ঘর অবস্থাপন্ন লোকের বসতি আছে এবং এক জন প্রবীণ জমীদার আছেন। পাড়াগেঁয়ে জমীদার যেমন হয়, এ জমীদারও সেইরূপ। জমীদারের নাম হরিগোপাল দে। বংশ নীচ, পিতার টাকার জোরে সম্মানিত। পরের ধনে পোদ্দারী। লেখাপড়ার কোন ধার ধারেন না, কোন সৎকাজে মতি নাই, দেশের স্কুলে একটী টাকাও চাঁদা দেন না। এই যে দুর্ভিক্ষের সময় চতুর্দ্দিকে ছোট বড় কত অন্ন-ছত্র বসিয়াছে, হরি গোপালের বাড়ীতে তা কিছুই নাই। পোলাও কালীয়া আহার, তাস পাশা ক্রীড়া, প্রজা-পীড়ন, মদ্যপান এবং ব্যভিচার দৈনিক কার্য্য। হরিগোপালের তিন পুত্র, বড়টীর বয়স ২৬ বৎসর, মধ্যমটীর ২২ এবং কনিষ্ঠের বয়স ১৮। তিন পুত্রই উপযুক্ত হইয়াছে,তিনজনই পিতার স্বভাব পাইয়াছে, কোচান কাপড় পরিয়া, টেড়ি কাটিয়া, ফুল চাদর উড়াইয়া, আতর গোলাপ মাখিয়া, প্রাতে এবং সন্ধ্যায় পাড়া বেড়ান ইহাদের প্রধান কার্য্য। তাহাদের বিশ্বাস, তাহাদের ন্যায় বড়লোক জগতে আর নাই ; বিশ্বাস, তাহাদের ন্যায় সুপুরুষ বঙ্গে কুত্রাপি নাই। আপনাদিগের গৌরবে আপনারা ধরাকে শরার ন্যায় জ্ঞান করে। যৌবনে মানুষ দিক্‌বিদিক-জ্ঞান-শূন্য হয়, ইহাদেরও তাহাই হইয়াছে। তিনটা যেন অদম্য ষাঁড়। দিবারাত্রি ঘুরিয়া ফিরিতেছে ; জ্ঞাতি কুটুম্ব জ্ঞান নাই, যেখানে সেখানে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়া ফিরিতেছে। এমন মাস নাই, দুই চারিটা ফৌজদারী না হয়, এমন মাস নাই, দুই দশ জায়গায় প্রহার না খায়। সে সকল পাপের চিত্র অঙ্কিত করা একরূপ অসাধ্য ব্যাপার। রুচি নাই, শক্তি নাই, এ পুস্তকে স্থানও নাই। একটা বড় ফৌজদারী উপলক্ষে এক দিন হরিগোপাল বড় পুত্রকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "তোরা হলি কি, একেবারে ষাঁড়ের ন্যায় কাণ্ডাকাণ্ড-শূন্য হলি ?"

বড়পুত্র একথার উত্তরে বলেছিল, "বাবা, বয়স তোমার না আমাদের ? আমাদের মজা লুটিবার ইহাই ত প্রকৃত সময়। তুমি সৎ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমাদের ফিরাও না কেন ?"

হরিগোপাল সেই হইতে আর কোন কথা বলেন না। তাঁহারই দৃষ্টান্তে পুত্র তিনটি একেবারে অধঃপাতে গিয়াছে। তাহাদের অত্যাচারে

বিধিকৃষ্ণপুরও যায় যায় হইয়াছে। কিছু বাকী রহিয়াছে কেবল তারানাথের পুণ্যের জোরে। প্রতি পরিবারে, প্রতি গ্রামে, প্রতি দেশে এবং প্রতি সমাজেই এক এক জন পুণ্যশ্লোক লোক জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের পুণ্যের জোরেই দেশ এবং সমাজ রক্ষা পায়। তাঁহাদের ধর্ম্মের বলেই সাধুতা সংরক্ষিত হয়। বিধিকৃষ্ণপুর আছে, প্রধানতঃ তারানাথের পুণ্যের জোরে। আর এই পরিবার আছে কাহার পুণ্যের ফলে? হরিগোপালের পত্নীর পুণ্যের ফলে। হরিগোপালের পত্নী সতী, সাধ্বী, পুণ্যবতী, নিষ্ঠাবতী, আদর্শ হিন্দু-মহিলা। ব্রাহ্মণের পাদোদক গ্রহণ না করিয়া জলস্পর্শ করেন না, বাড়ীতে অতিথি-সেবা নাই, কিন্তু হরিগোপালের পত্নী শান্তিশীলার অন্তঃপুরের দ্বার সদা অবারিত। কর্ত্তারা অন্তঃপুরে প্রায়ই থাকেন না, পুত্র-বধূদিগকে লইয়া গৃহিণী পরম সুখে দরিদ্রের সেবা করিয়া দিন কাটান। বঙ্গদেশ রক্ষা করিতেছে, কেবল মাতৃশক্তি। নচেৎ ইংরাজাবিকৃত অথবা ইংরাজির কুদৃষ্টান্তানুপ্রাণিত এ বঙ্গ এত দিন ডুবিয়া যাইত, এত দিন শ্মশান হইত।

কথা কি অসত্য? লোকে বলে যে, ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট দেশকে সুশিক্ষা ও সুসভ্যতায় ভূষিত করিয়াছে। সুশিক্ষার অর্থ পরনিন্দা এবং অবিশ্বাস, এবং সভ্যতার অর্থ, জাতি-ধর্ম্মবিনাশ-কারী মদ্যপান এবং ব্যভিচার! ইংরাজের অধ্যবসায়, সৎকর্ম্মানুরাগ, পর-সেবা, ধৈর্য্য, কষ্টসহিষ্ণুতা এই বঙ্গে স্থান পায় নাই। যাঁহারা একথায় সন্দেহ করেন, বঙ্গের জমীদারশ্রেণীর বাড়ী একবার অনুসন্ধান করিয়া আসুন, ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের শাসন-সংরক্ষণ-নীতির কতক পরিচয় পাইবেন। প্রতি জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন, পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আছেন, প্রতি সবডিবিসনে ডেপুটী আছেন, ইনস্পেক্টর আছেন, তবুও দিবা রাত্রি পরস্ত্রী-হরণ, পরদ্রব্য-লুণ্ঠন, দরিদ্র-নির্ব্বাসন শত শত হইতেছে, ঘর বাড়ী জ্বালাইয়া শত শত প্রজার ভিটা মাটী উচ্ছন্ন করা হইতেছে, শত শত লোককে দেশান্তরিত করা হইতেছে। শিক্ষিত লোক সর্ব্বত্রই আছেন, তাঁহারা মদ্য-মাংস-ব্যভিচারে আত্মসমর্পণ করিয়া এখন মৃতবৎ। অনেক স্থলেই ম্যানেজারগণ ভূতের পিতা, পুলিস ও ম্যাজিষ্ট্রেটগণ টাকা ও খোসামুদীর প্রেত। অন্য কথা দূরে থাকুক, ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট যে সকল জমীদারকে রাজ উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন, তাঁহাদের বাড়ীই অনুসন্ধান করা হউক। হায়রে, মহারাণীর রাজ্য! এদেশের নীলকরের অত্যাচার গিয়াছে, কুলীর অত্যাচার নিবারণের জন্যও চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু জমীদারের অত্যাচার

বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। ব্যভিচার করিয়া যে ইংলণ্ডে পার্ণেল-মহাশক্তি হতবল, ডিল্কের স্থায় অসাধারণ বুদ্ধিমান মৃতবৎ, সেই ইংলণ্ডের অধীন ভারত ব্যভিচারে ডুবিয়া রসাতলে যায়! হায়রে সুশিক্ষা, হায়রে সুসভ্যতা, হায়রে পুনরুত্থান! জমীদারের কথা লিখিতে সম্পাদকগণও ভীত, সঙ্কুচিত। হায়রে দেশোদ্ধার!!

বিধিকৃষ্ণপুরের জমীদার বাড়ীতে ৭ দিন একটা মহা বৈঠক বসিয়াছে। তারানাথই ডেপুটীর বিরুদ্ধে সংবাদ পত্রে লিখিয়া থাকেন, দুর্ভিক্ষের আন্দোলন তাঁহা কর্ত্তৃকই সূচিত, হরিগোপালের টাকার জোরে এবং ডেপুটীর অনুরোধে এরূপ কথা অনেক সাক্ষীই বলিয়াছে। পরোপকারী তারানাথের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে অনেকে প্রথমে সঙ্কুচিত হইয়াছিল, কিন্তু অর্থে সকল অসাধ্য সাধিত হইয়াছে, অল্প যাহা বাকী ছিল, প্রহারে তাহাও হইয়াছে। বলা বাহুল্য, টাকা সকলকেই দিতে হইয়াছে। পাঠক, এ সকল কথা অবিশ্বাস করিতেছেন কি? বৈঠকে প্রথম কাজ ধার্য্য হইয়াছে, তারানাথের নামে লাইবেল মকদ্দমা হইবে, হরিগোপাল সকল সাক্ষী জুটাইয়া দিবেন। হরিগোপাল তারানাথের বিরুদ্ধে কেন গেলেন? সে সম্বন্ধে দুটী কথা বলা উচিত। প্রথমে পাপীর সহিত পুণ্যাত্মার, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে বিরোধ। দেবাসুরের সংগ্রাম মহামহিমান্বিত সত্য যুগেও ছিল। হরিগোপাল দেশকে ব্যভিচারে ডুবাইতে চাহেন, তারানাথ তাহা দিতেছেন না; সাধ্যানুসারে বাধা দিতেছেন। মামলা মকদ্দমা করিয়া হরিগোপাল সকলকে হয়রাণ করিতেছেন। দুঃখী দরিদ্রদিগের ঘর বজায় রাখিতে তারানাথের প্রাণগত চেষ্টা। এজন্য তিনি না করিয়াছেন, এমন সৎকাজ নাই। দরিদ্র-শ্রেণী, এজন্য, তারানাথের দলে। তারানাথের দলটা দরিদ্রদিগকে লইয়া, সে দল সামান্য নহে। তারানাথ কেবল ধর্ম্ম ও পুণ্য সম্বলে মহা প্রতাপান্বিত একটা বড় জমীদারের সহিত সমকক্ষতা করিতেছেন। বড় লোক এবং দরিদ্র লোকের সহিত সদ্ভাব কোন দেশেও নাই। আভিজাত্যে ও জনসাধারণে কখনও সদ্ভাব সম্ভবে না। তারানাথ দরিদ্রদিগের নেতা, প্রেমে শক্তিশালী; হরিগোপাল প্রভৃত বলশালী টাকার জোরে। বলং বলং বাহুবলং, এক যুগের কথা ছিল, সে দিন চলিয়া গিয়াছে, এখনকার কথা, বলং বলং ধনবলং। টাকা যার, তারই সমস্ত বল। তারানাথ হরিগোপালের চিরশত্রু। তারানাথ যেমন তেমন লোক হইলে হরিগোপাল এতদিন গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতেন; কিম্বা দেশান্তরিত

করিতেন। তারানাথের ধর্ম্মবল অজেয়, পুণ্যবল অদম্য। এতদিন কোনরূপে গিয়াছে। ঘরে বয়স্থা মেয়ে; তারানাথের সে একটা বিষম ভাবনা। মেয়ে যেমন তেমন মেয়ে নহে, বিপদের মধ্যে ফেলিয়া দিলে সেও আত্মরক্ষা করিতে পারে, এই একটা প্রধান ভরসা। এই সোণার মেয়েকে জলে ডুবাইয়া দিতে অনেকবার অনুরোধ করা হইয়াছে, তারানাথ সে অনুরোধ রাখেন নাই, ইহা জমীদারের একটা আক্রোশ। পুণ্যপ্রভাকে হাত করিতে বিধিকৃষ্ণপুরের জমীদার বংশে না হইয়াছে, এমন জঘন্য কাজ নাই। পিতা পুত্র সকলেই চেষ্টা করিয়াছেন, শেষে পরাস্থ হইয়া ক্রোধ ও অপমানে অন্তরে বিষম অগ্নি পূরিয়াছেন। এবার মাদারিপুরের সুযোগ্য ডেপুটী এই অগ্নিতে ইন্ধন দিলেন। এতদিন পর বুঝি বা দরিদ্রের পিতা, সাধারণের নেতা, প্রেমের প্রতিনিধি অত্যাচারের প্রবল স্রোতে ভাসিয়া যায়! হায়রে দেশ!

মহাবৈঠকে আর একটা কাজ ধার্য্য হইয়াছে, তাহা লিখিতে শরীর সিহরিয়া উঠে। বিধিকৃষ্ণপুরের নিকট চরনগর গ্রামে এক বিটলে ব্রাহ্মণ নব উত্থিত হইয়াছেন। তারানাথ যখন কলিকাতার নর্ম্মাল স্কুলে পড়িতেন, তখন এই ব্রাহ্মণ-তনয় কলিকাতায় নিরাশ্রয় অবস্থায় উপস্থিত হয়। তারানাথ তাহাকে বাসায় স্থান দেন ও লবণের দালালি শিখাইতে একজন পরিচিত ভদ্রলোককে অনুরোধ করেন। তারানাথ সপরিবারে কলিকাতায় থাকিতেন। দস্যুসম জমীদার হরিগোপাল যে গ্রামে বাস করে, সে গ্রামে প্রসন্নময়ী ও পুণ্যপ্রভাকে তিনি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। পুণ্যপ্রভা তখন বালিকা। বাসায় ব্রাহ্মণ-তনয়, প্রসন্নময়ী ও তারানাথ। কথায় বলে, যে পাখী উড়িবে, সে বাসাতেই ফড়ফড় করে। যৌবনে যে সৎগুণ ও রূপের তরঙ্গে জগৎকে বিমোহিত করিবে, বাল্যেই সে ভাবী জীবনের আভাস দেয়। ম্যাট্‌সিনি পঞ্চম বৎসর বয়সের সময়েই অসাধারণ প্রেমের পরিচয় দিয়াছিলেন, মিল শৈশবেই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, নেপোলিয়ন বাল্যেই অসাধারণ সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। আমাদের সোণার প্রতিমা পুণ্যপ্রভাও বাল্যে পরিচয় দিয়াছিলেন যে, তিনি রূপে গুণে আদর্শ রমণী হইবেন। এই বিটলে ব্রাহ্মণ-তনয় অসহায় অবস্থায় কলিকাতায় উপস্থিত হইলে তারানাথ তাঁহাকে বাসায় স্থান দিয়া প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দারুণ অপরাধে, কৃতজ্ঞতার বিজয় নিশান তুলিবার জন্য, বাল্য হইতেই এই পামর পুণ্যপ্রভার প্রতি কুটিল নয়নে তাকাইত! পুণ্যপ্রভা তাহাকে দাদা বলিয়া

ডাকিত এবং প্রাণের সহিত ভালবাসিত। পুণ্যপ্রভার রূপ গুণ তাহাকে এমন ভাবে গ্রাস করিয়াছিল যে, পুণ্যপ্রভাকে বিট্‌লে একদিনও ভুলিতে পারে নাই। বাল্য গিয়াছে, যৌবনান্তে এখন সে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, এখন আর তাহাকে পায় কে? হতভাগ্য এই মহাবৈঠকে যোগ দিয়াছে। যোগ দিয়া, পুণ্যপ্রভাকে অপহরণ করিয়া বিবাহ করিবে, ঠিক করিয়াছে।

সিরাজকে রাজ্যচ্যুত করিতে বঙ্গাধিকারী-জগৎশেঠ-মির্জাফর-রাজবল্লভ-প্রমুখ দলের কুমন্ত্রণা-সভা পাঠক স্মরণ কর। অভিমন্যু বধের জন্য কুরুকুলের কুমন্ত্রণা ও ব্যূহ-রচনা স্মরণ কর। সীতা-হরণের জন্য রাবণের চক্রান্ত স্মরণ কর। নেপোলিয়ান-মহাশক্তির হস্ত হইতে ইয়োরোপকে রক্ষা করার জন্য পাশ্চাত্য শক্তি-সমূহের কুমন্ত্রণা স্মরণ কর। ধর্ম্ম, নীতি, পুণ্যের পরিবর্ত্তে পাপ, দুর্নীতি, কাপুরুষতাকে একবার স্মরণ কর। পরিণামে যে ধর্ম্ম জয়যুক্ত হয়, সে কথা ভুলিয়া যাইয়া একবার পৃথিবীর শোচনীয় অবস্থা ভাব। বিধাতা পাপের ভিতর দিয়া, অমঙ্গলের ভিতর দিয়াও পুণ্য এবং মঙ্গল প্রতিষ্ঠিত করিয়া জগতের হিতসাধন করিতেছেন, সে কথা ভুলিয়া, পৃথিবীর নরক ও আসুর রাজ্যের কথা একবার স্মরণ কর। স্মরণ কর, পরোপকারীকে বিনাশ করিতে, সতীর সতীত্ব অপহরণ করিতে দস্যুদল মহাবৈঠকে কুমন্ত্রণা করিতেছে! পাঠক, শুনিয়া শোণিত উষ্ণ হয় না কি? আমি অধম অক্ষম লেখক, শোণিত উষ্ণ করাইবার শক্তি আমার নাই। বিধাতা সহায় হউন।

এই হতভাগ্য ব্রাহ্মণ-তনয়ের নাম কালিকান্ত চক্রবর্ত্তী। অসহায় অবস্থায় এক সময়ে যে ব্যক্তি তারানাথের কালিকাতাস্থ বাসায় ছিল, আজ সে অর্দ্ধ ক্রোড়পতি। তারানাথ বাসায় আশ্রয় দিয়া, যে লবণের দালালিতে তাহাকে প্রবেশ করাইয়াছিলেন, সেই দালালিতে থাকার সময়, ঘটনা ক্রমে ৮।১০ খান জাহাজ এক সময়ে কালিকান্ত কণ্ট্রাক্ট করেন। জাহাজ কলিকাতা পৌছিবার পুর্ব্বেই লবণের শুল্ক বৃদ্ধি হওয়ায়, তিনি এই কণ্ট্রাক্টে বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হন। সে সকল কথার বিস্তৃত বিবরণ দিবার কোন প্রয়োজন নাই, কেননা, ব্যবসা বাণিজ্যে লাভ অনেকেরই হইয়া থাকে। কালিকান্ত যখন অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইলেন, তখন নর্ম্মাল স্কুলের পাঠ শেষ করিয়া তারানাথ তীর্থভ্রমণে গিয়াছিলেন। বাড়ী আসার পর যখন মাদারিপুর স্কুলে চাকরী পান, তখন পুণ্যপ্রভাকে বিবাহ করিতে কালিকান্ত প্রস্তুত, এ প্রস্তাব তারানাথের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। তারানাথ

কুল ভাঙ্গিতে অপ্রস্তুত নহেন, কিন্তু কালিকান্তের ন্যায় অশিক্ষিত, দুশ্চরিত্র, অসংযত ও দুর্ব্বিনীত লোকের হস্তে সোণার প্রতিমাকে অর্পণ করা অপেক্ষা তারানাথের পক্ষে কন্যাকে কুমারের জলে বিসর্জ্জন দেওয়াও ভাল। তারানাথ তাহা পারেন না। ধনীর প্রতি তাঁহার দারুণ ঘৃণা। ধন যেখানে, সেখান হইতে পৃথিবীর সমস্ত সৎগুণ অন্তরিত,তাঁহার এই ধারণা বাল্যাবধি। ধনের মায়া বিষম মায়া, এই মায়ায় পড়িলে, মানুষের ধর্ম্ম কর্ম্ম সব লোপ পায়। খ্রীষ্ট বলিতেন, "উষ্ট্রের সূচি-ছিদ্রে প্রবেশ সম্ভব হইলেও, ধনীর স্বর্গ-গমন সম্ভব নহে।" রামকৃষ্ণ বলিতেন,"কামিনী কাঞ্চন সাধনার পথে মহাবিঘ্ন।" শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেন,"বিষয়ী বিষয় পরিত্যাগ না করিলে কথনও ধর্ম্ম পাইবে না"। তারানাথ এ সকল কথা হৃদয়-পটে আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মগতজীবন, ধনগত ও সংসারগত জীবনের যে ঘোরতর বিরোধী হইবে, কিছুই বিচিত্র নয়। বাল্যকাল হইতে তাঁহার শিক্ষা এইরূপ। বিষয় বিক্রয় করিয়াছেন, এই জন্য। স্ত্রী বা কন্যার হস্তে কথনও দুগাছি সোণার বালা দেন নাই, পাছে ধনস্পৃহা হৃদয়কে অধিকার করে, বিলাস-বাসনা মনে বদ্ধমূল হয়। এহেন ব্যক্তি ধনীর সংস্পর্শে কন্যাকে পাঠাইবেন? আজীবন বিবাহ না দিলেও নয়। যাহারা সম্বন্ধ লইয়া আসিয়াছিল, তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বিদায় দিয়াছেন। পাছে বারম্বার তাঁহাকে বিরক্ত করিতে আগমন করে, এজন্য অপমান পর্য্যন্ত করিয়াছেন। কালিকান্ত অর্দ্ধলক্ষ টাকা পণ দিতে চাহিয়াছিলেন, তারানাথ ফুৎকার দিয়া টাকার প্রস্তাব উড়াইয়া দিয়াছেন। সে অপমানের প্রতিশোধ তুলিতে কালিকান্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। কালিকান্ত এথন বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা এই, পুণ্যপ্রভাকে তাঁহার স্ত্রীর দাসী করিয়া মনের জ্বালা নিবারণ করিবেন। হায়রে মানুষ, তোর বুদ্ধি, স্পর্দ্ধা, হিংসা, অহঙ্কার না পারে, এমন কাজ নাই।

ঘটনা এক দিনে ঘটে, কিন্তু কারণ বহু দিন হইতে সঞ্চারিত হয়। বহু দিনের আয়োজনের পর মেঘ বারি বর্ষণ করে, বহু দিনের আয়োজনের পর ভূমিকম্প হয়,—বহু দিনের আয়োজনের পর মেঘ-ঘর্ষণে বিদ্যুৎপাত হয়। ঘটনা ঘটে এক দিন, কিন্তু আয়োজন বহু দিনের। নেপোলিয়ন সেণ্টহেলেনায় বন্দী, বহু আয়োজনে, বহু চেষ্টার ফলে। সিডন-সমরে ফরাসীর দর্প চূর্ণ, বহু আয়োজনের ফলে। অদ্য বিধিকৃষ্ণপুরে বহু আয়োজনের পর তারানাথের সর্ব্বনাশের পথ অবারিত-দ্বার। দেবাসুরের বিষম সংগ্রাম!!

অবান্তরিক কথার ঢেউ বহিয়া গেল। পাঠক মার্জ্জনা করিবেন। দেবী প্রসন্নময়ী সময় পাইলেই গোপনে শান্তিশীলার বাড়ীতে যাইতেন। আজও, সন্ধ্যার পর সেখানে গেলেন। তারানাথের নিষেধ ছিল না, নিষেধ থাকিবে কেন? তিনি কাহাকেও শত্রু মনে করেন না, তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তাঁহার সতী সাধ্বী স্ত্রীর বিমল চরিত্রের সংস্পর্শে বিধিকৃষ্ণপুরের মহিলাকুলের পরম উপকার হইবে। হইয়াছেও তাই। শান্তিশীলার চরিত্র—প্রসন্নময়ীর চরিত্র-সংস্পর্শ দ্বারা সংগঠিত। প্রসন্নময়ীর অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। হরিবিদ্বেষী অসুর হিরণ্য-কশিপুর ঘরে ভক্ত প্রহ্লাদের জন্ম। পাষাণ হরিগোপালের অন্তঃপুরে বিমল শান্তি-বারি প্রবাহিতা। একথা ভাবিবার, কিন্তু বলিবার নহে।

দেবী প্রসন্নময়ী শান্তিশীলার নিকট কয়েকদিন যাইতে অবসর পান নাই, এজন্য প্রথমে তাঁহাকে কিছু তিরস্কার সহিতে হইল। দেবী প্রসন্নময়ী কদিনের ঝঞ্ঝাটের কথা বলিয়া বিনয়ের সহিত ক্ষমা চাহিলেন, তারপর সেই দিনের প্রধান ঘটনা—স্বামীর গ্রেপ্তারের কথা বলিলেন। কল্যকার মহাযজ্ঞের উপায় নাই, তাহাও বলিলেন। যদি রাত্রে অন্য উপায় না হয়, তবে কল্য দুই চারি মণ চাউল কাঙ্গালদের জন্য দিতে হইবে, বলিলেন।

শান্তিশীলা সমস্ত শুনিয়া অবাক্ হইলেন; মনে ভাবিলেন, বধূরা কদিন বুঝি এই জন্য কাণাকাণি করিতেছিল। তিনি বধূদিগকে ডাকিলেন। তিন লক্ষ্মী,দেবী প্রসন্নময়ী ও শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া, পাশাপাশি হইয়া পরে পরে বসিলেন। শান্তিশীলা জিজ্ঞাসা করিলেন, বড় বউ, তুমি কাল চুপে চুপে মেজো বউর নিকট কি বল্‌তেছিলে?

— বড় বধূ যাহা যাহা জানিতেন, অসঙ্কুচিত চিত্তে সে সকলই বলিলেন। বলিলেন, "আমাদের বাড়ীতে ভয়ানক এক বৈঠক হইয়া গিয়াছে; কালিকান্ত ও মাদারিপুরের ডিপুটী তাহাতে যোগ দিয়াছে। গাঙ্গুলী বংশের সর্ব্বনাশ সাধনই বৈঠকের উদ্দেশ্য। কি আর বলিব, না জানি আজ কি সর্ব্বনাশ ঘটে!"

শান্তিশীলা বলিলেন, আমাকে এ সকল কথা বল নাই কেন?

বড় বধূ বলিলেন, "কি ফল হইবে? আপনি কিম্বা আমরা অবলা, কি করিতে পারি? আমাদের পক্ষে মৃত্যুই ভাল।" বলিতে বলিতে বড় বধূর কণ্ঠ-রোধ হইল, আর কিছু বলিতে পারিলেন না। মধ্যমা বধূ আরো কোমলা। তিনি উচ্ছ্বাসের সহিত কাঁদিতেছিলেন, কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

ছোট বধূ বলিলেন—ঐ শুনুন, কি যেন গোলমাল শুনা যাইতেছে! দেবী

প্রসন্নময়ী মহা বিপদের আশঙ্কা করিয়া পাগলের ন্যায় ছুটিলেন। শান্তিশীলা সংবাদ লইতে দুই জন দাসী পাঠাইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কন্যা-অপহরণ।

যার ঘরে টাকা থাকে, তার ঘরে অহঙ্কার থাকে অনেক। টাকার সঙ্গে সঙ্গে, মানুষের মনুষ্যত্ব বলিতে যা কিছু, সব চলিয়া যায়, তৎস্থান অধিকার করে, জগতে যত প্রকার পশুত্ব। টাকা সহ হৃদয় থাকিলে অবশ্য সোণায় সোহাগা হয়। কিন্তু বিধির বিধান স্বতন্ত্র। তবে বঙ্গের বিদ্যাসাগর এবং রাণী স্বর্ণময়ীর ন্যায় নর নারীর কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা শাপভ্রষ্ট দেব দেবী, তাঁহারা আসুরকুলে ভক্ত-প্রহ্লাদ। সাধারণ নিয়ম, যেখানে টাকা, সেই-খানেই পশুত্ব! টাকায় পুণ্যবতী মাতৃজাতিকেও বিলাসের পথে চালায়। অলঙ্কারের উপর অলঙ্কার, রাশি রাশি অলঙ্কার যার অঙ্গকে শোভিত করিয়াছে, তুমি যদি বুদ্ধিমান হও, বুঝিয়া লইবে, সেখানে অহঙ্কারও আছে অনেক। চুলে পমেটম্ ও টেড়ি, বুক-পকেটে চেইন ও ঘড়ি, হাতে আংটী, সার্টে সোণার বুতাম, বাহনে গাড়ী ঘোড়া যাহার দেখিবে, বুঝিবে, তার হৃদয়ে অহ-ঙ্কার আছে অনেক। অহঙ্কার মানুষকে আত্মহারা করে, পরিণাম ভাবিতে দেয় না; কাহারও অপেক্ষা সে হীন, এ কথাকে হৃদয়ে স্থান দিতে দেয় না। অজাতশত্রুর পিতা বিম্বসারের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ পার্শ্বে রাখিয়া, বীরচূড়ামণি জরাসন্ধের পঞ্চপাহাড়-বেষ্টিত ধনঐশ্বর্য্যপূর্ণ রাজপুরীর ধূলি-রাশি সম্মুখে করিয়া এই পুস্তক লিখিতেছি, কালের দুর্জ্জয় পরাক্রম এবং মানুষের ধন, জন, গৌরবের নশ্বরত্বের পরিচয় পাইয়া অবাক্ হইতেছি; এবং ভাবিতেছি, হায়রে মানুষ, তোর ন্যায় মূর্খ আর কে? সমুদ্র-তটে বালীর ঘর নির্ম্মাণ করিয়া ভাবিতেছিস্, সকলই চিরস্থায়ী! কালের প্রবল বন্যা যখন আসিবে, তখন "কোথায় রবে ঘর দরজা, কোথায় রবে ধন"। মানুষ যত জ্ঞানী হয়, ততই মূর্খতা বাড়ে, যত বড় হয়, ততই বালকত্ব বৃদ্ধি পায়। মানুষের ন্যায় হতভাগ্য জীব আর কোথায় মিলে?

হরিগোপাল টাকার মহিমায় দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য, কালিকান্ত কামোন্মত্ত

মাতঙ্গ! ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজ্য মগের মুল্লুক নয়, লোকে বলে। কিন্তু ঘটিতেছে কি, একবার নয়ন মেলিয়া দেখ। সত্যের খাতিরে অনেকের অনেক কুৎসিত কথা এবার লিখিতে হইল।

আজ চতুর্দ্দিক যখন অন্ধকার গ্রাস করিয়াছে, এমন সময়ে, তারানাথের বাড়ীর সম্মুখের নদীতে ১৫।২০ খান নৌকা লাগিয়াছে। নৌকায় বোঝাই কেবল সদরদির সর্দ্দার, হাতে সুলপী ও ঢাল—ভীষণ-দর্শন। ঘাটে নৌকা লাগিবামাত্র অধ্যক্ষ হুকুম দিলেন, তারানাথের বাড়ী লুণ্ঠন কর্ এবং তাহার কন্যাকে পাল্কীতে উঠাইয়া যেরূপে সম্ভব, চরনগরে প্রেরণ কর্। লাঠিয়ালগণ আল্লা আল্লা হো হো রবে দিক কাঁপাইয়া তীরে অবতরণ করিল। দক্ষিণ দিক হইতে হরিগোপালের লোক বাড়ী বেষ্টন করিল। কেবল তাহা নহে, হরিগোপালের অস্ত্রধারী লোক, তারানাথের পক্ষের প্রতি বাড়ীতে ভীষণ দর্শন রূপে দাঁড়াইয়াছে, প্রতিজ্ঞা, কাহাকেও বাড়ীর বাহির হইতে দিবে না। আজ বিধিকৃষ্ণপুর পাপাসুরের পদ-ভরে টলটলায়মান। আজ দেবতা দেশে নাই, মানুষ দেশে নাই, ধর্ম্ম দেশে নাই, পুণ্য দেশে নাই। হৈ হৈ, মার মার, ধর ধর রবে চতুর্দ্দিক পূর্ণ। এক প্রহর রাত্রের পূর্ব্বেই তারানাথের বাড়ী লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। দেখে কে, রাখে কে? হা ঈশ্বর, তুমি আজ কোথায়?

প্রসন্নময়ী ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, বাড়ীতে দস্যুর দল প্রবেশ করিয়া বাড়ী লুণ্ঠন করিতেছে। পুণ্যপ্রভা কোথায়? আর আর লোক কোথায়? কে সে সংবাদ দিবে? তিনি তখন মান সম্ভ্রম সমস্ত ভুলিয়াছেন, জগদম্বার ঘরে ঢুকিয়া বলিদানের খড়্গ হাতে লইয়া বাহিরে আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, মশালের আলোতে দস্যুরা বাড়ীর জিনিস পত্র বাহির করিতেছে, এবং যে যা পাইতেছে, লইয়া পলায়ন করিতেছে। প্রসন্নময়ী যেন আজ ভীমা, জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথাকার লোক? দস্যুরা উত্তর দিল, "মহারাজ কালিকান্ত বাবুর জয়, কালীমায়ের জয়, হরিগোপাল বাবুর জয়।" প্রসন্নময়ী ভীম রবে বলিলেন, "বল, তারানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জয়। যে তাহা না বলিবে, এখনই তাহার শির লইব।" লাঠিয়ালেরা লড়াইর কোন আয়োজন না দেখিয়া নৌকা হইতে নামিয়াই, অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, দস্যুর বেশ ধরিয়া লুণ্ঠন কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছে। প্রসন্নময়ীর সেই উগ্র মূর্ত্তি দেখিয়া অস্ত্রশূন্য দস্যুরা বলিয়া উঠিল, "তারানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জয়।" আকাশ কাঁপাইয়া আবার প্রসন্নময়ী বলিলেন, "বল, মা জগদম্বার জয়।" দস্যুরা ভীমরবে

আকাশ কাঁপাইয়া তাহাই বলিল। এদিকে পশ্চিম দিক হইতে আর একদল লোক যেন দস্যুদিগকে বাধা দিতে আসিয়াছে, বোধ হইল। তাহাদের অনেকেরই আকৃতি ক্ষীণ,জীর্ণ শীর্ণ, বোধ হইল, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত স্ত্রীপুরুষ দলে দলে মিলিয়া আজ প্রাণদাতার মান রাখিতে প্রাণ দিতে আসিতেছে। প্রসন্নময়ীর আদেশে দস্যুরা যখন "জয় তারানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জয়," "জয় জগদম্বার জয়" চিৎকার করিয়া উঠিল, তখন তাহারাও আকাশ কাঁপাইয়া ঐ ধ্বনি তুলিল। পূর্ব্ব দিক হইতে আর এক দল সেই স্বরে যোগ দিল। যখন এইরূপ জয়ধ্বনি চতুর্দ্দিক হইতে উঠিল, তখন নৌকার মাঝীরা ভয় পাইয়া অনেকেই নৌকা খুলিয়া দিল, দুই চারিখান নৌকা পলায়নতৎপর লোকের পদভরে জলমগ্ন হইল,একখানি পান্সী ছিল,কে যেন তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে, তাহা জ্বলিতে লাগিল। প্রসন্নময়ী মনে করিলেন, বিনা রক্তপাতে বাড়ী রক্ষা হইল। ক্রমে ক্রমে দস্যুরা যখন পলায়ন করিল, তখন অনুসন্ধান আরম্ভ হইল, কে কোথায় আছে ? বিধিকৃষ্ণপুরে সমস্ত রাত্রি হই-চই গোলযোগ রহিল। মাদারিপুর পুলিসে লোক গেল, ফরিদপুরও লোক প্রেরিত হইল। কে যে কি করিল, কেহই বলিতে পারে না। অথচ যাহা যাহা কর্ত্তব্য, সমস্ত হইল। অনুসন্ধান করিতে করিতে সকলকে, ক্রমে ক্রমে বাড়ীর অন্যান্য সকলকে পাওয়া গেল,কিন্তু পুণ্যপ্রভা ও দীপ্তি নাই। গ্রামে হাহাকার উঠিল। তারানাথের কুল যায়, গ্রামের দুই দশ জন বাদে অনেকেরই তাহা অসহ্য। তারানাথের জন্য প্রাণদিতে পারে এমন লোক অনেক ছিল। তাহারা ক্ষিপ্তের ন্যায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। আর প্রসন্নময়ী, সেই ধীরা, গম্ভীরা, অবিচলিতা মাতৃমূর্ত্তি ? মাতা আজ জগদম্বার ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া মহা যোগে, মহা ধ্যানে নিমগ্না হইলেন। কন্যার জন্য একবিন্দু চক্ষে জল নাই, আপনার জন্য একটু দুশ্চিন্তা নাই। মাতৃমূর্ত্তি আজ যেন পাষাণ। প্রসন্নময়ী দেবাগৃহে যাইবার অনেক পর অনুসন্ধানে দীপ্তিকে বহুদূরে অচেতন অবস্থায় পাওয়া গেল। কিন্তু পুণ্যপ্রভাকে পাওয়া গেল না। দীপ্তিকে ঘরে আনিয়া শুশ্রূষা করা হইতে লাগিল। কিন্তু পুণ্যপ্রভা কোথায় ?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কৃতজ্ঞতার স্বর্গীয় চিত্র।

উপন্যাস লিখিতে বসিয়াছি বলিয়া চোরের চাকরী করিতে বসি নাই যে, ভয়ে ভয়ে কথা বলিতে বা চলিতে হইবে। পাঠক ইচ্ছা হয় পড়িবেন, না হয় পুস্তক পোকায় কাটিবে। আমি মানুষের শরীর লইয়া সঙ্কুচিত ভাবে, তোষামোদ করিয়া, সভয়ে চলিয়া যাইতে পারিব না। যাহা সত্য, তাহা অকুণ্ঠিত চিত্তে নির্ভয়ে বলিব।

হিন্দুর দেশে, হিন্দুর সমাজে, হিন্দু হিন্দুর কন্যা অপহরণ করিলেন! এ কলঙ্ক রাখিবার ঠাঁই নাই। ফরিদপুরের এ কলঙ্ক কখনও অপনীত হইবে না। বঙ্গদেশ হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের হুজুগে যখন বিষম আন্দোলিত, তখন এই ভীষণ ঘটনা ঘটিল! ধর্ম্মোত্থানের সময়ই বটে!! ধিক্ ধিক্ শতধিক!!! হিন্দুসমাজকে ধিক্, ব্রাহ্মণ-কুলাঙ্গারকে ধিক্, গবর্ণমেণ্টকে ধিক্!!

কেবল অপহরণ নয়, সেই রাত্রেই পাল্কী করিয়া পুণ্যপ্রভা কালিকান্তের বাড়ীতে নীতা হইলেন, বিবাহের সকল আয়োজন ছিল, সেই রাত্রেই পুণ্যপ্রভা কালিকান্তের সহিত পরিণীতা হইলেন! হিন্দু সমাজের পুরোহিত জুটিল, নিমন্ত্রিত বন্ধু জুটিল, অর্থবলে একরাত্রে বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল! হায়রে হিন্দুসমাজ!! ব্রাহ্মণদিগকে "শ্রীচরণেষু" পাঠ না লিখিলে তাঁহারা চটিয়া লাল হন, তাঁহারা আজকাল শ্রীচরণেষু পাঠের যোগ্য পাত্রই বটেন! কবি ঠিকই বলিয়াছেন—"শ্রুতি স্মৃতি ঢালিয়াছে বিস্মৃতির জলে, স্কন্ধে ঝুলে পড়ে আছে শুধু পৈতেখানা, তেজোহীন ব্রাহ্মণ্যের নির্ব্বিষ খোলস।" গবর্ণমেণ্টের সুশাসনের বড়ই দিগ্বিজয়ী নাম! যে দেশে এরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইতে পারে, তাহাপেক্ষা দুর্নামগ্রস্ত মগের মুল্লুক সহস্রগুণে ছিল ভাল।

দস্যুরা কি প্রকারে পুণ্যপ্রভাকে অপহরণ করিল, পথে পুণ্যপ্রভা কি করিয়াছিলেন এবং বিবাহের পরই বা কি করিলেন, দীপ্তি কি প্রকারে আহতা হইলেন, দেবী প্রসন্নময়ী তারপর কি করিলেন, তারানাথের পরিণাম কি হইল, সবিশেষ জানিবার জন্য পাঠক সম্ভবত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছেন। একটু ধৈর্য্য ধরিলে সমস্তই জানিতে পারিবেন। হরিগোপালের পরিণাম,

কালিকান্তের পরিণাম এবং ঐ ডেপুটীর পরিণাম, সমস্তই জানিতে পারিবেন। মধ্যে আরো কতকগুলি ঘটনা বলিবার আছে, সে গুলি সমস্ত নিবেদন না করিলে পুস্তকের কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকিবে। পাঠকগণের নিকট এ জন্য একটু ধৈর্য্য ভিক্ষা চাই।

আমরা লীলা, সরলা ও তিলোত্তমার নাম করিয়াছি। ইহারা কে? দীপ্তি ও পুণ্যপ্রভার সহিত ইহাদের কি যোগ?

লীলা পাড়ার এক নাপিতের মেয়ে, সরলা এক শূদ্রের মেয়ে, তিলোত্তমা কোন সম্ভ্রান্ত বৈদ্যের মেয়ে। একটী টোলে এই পঞ্চ ছাত্রী, এক একটী যেন এক এক অবতার। পুণ্যপ্রভা ও দীপ্তি ভিন্ন, পঞ্চ সখীর আর সকলেই বিবাহিতা, বয়স কাহারও ১৫, কাহারও ১৬। দীপ্তি ও পুণ্যপ্রভা সমবয়স্কা, উভয়ের বয়স যোড়শ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। রূপবতী কেবল পুণ্যপ্রভা ও দীপ্তি, আর সকলের তেমন রূপ নাই, কিন্তু গুণবতী সকলেই। কিন্তু যৌবন কাহারও প্রতি কৃপণ নহে, সকলের নিকট সমান। এখন অল্লাধিক পরিমাণে সকলেই সুন্দরী। ভালবাসায় যেন পঞ্চপাণ্ডব আর কি। অথবা প্রকৃতিতে যেন পঞ্চবটী। অথবা সুগন্ধিতে যেন চুয়া-চন্দন-কস্তুরী-কুঙ্কুম-জায়ফল। অথবা সুবাসে যেন বেলা-চামেলী-সেফালিকা-গন্ধরাজ-গোলাপ। অথবা নদীতে যেন গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী-কৃষ্ণা-কাবেরী। প্রায়ই অপরাহ্নে পঞ্চসখী অন্তঃপুর-সংলগ্ন বাগানে বসিতেন। সে এক অতুল শোভা। একের কথায় সকলে আকৃষ্ট, যেন তন্ময়। পঞ্চবটীর, পঞ্চসুগন্ধির, পঞ্চসুবাসের, পঞ্চ নদীর অতুল শোভা যে দেখিয়াছে, সে-ই মজিয়াছে। বিধিকৃষ্ণপুর যেন শ্রীরাধিকার নববৃন্দাবন!

জাতিতে একনয়, রূপে এক নয়, একরূপ শিক্ষিত নয়, একরূপ আচার ব্যবহার নয়, অথচ পাঁচ জন জমিয়া এক। জগৎ কাহার বশ? স্থূলদর্শী মানুষ বলে, টাকার বশ? আমি বলি, গুণের বশ; আমি বলি, প্রেমের বশ। প্রেম, অমানুষকে মানুষ করে, বিষ্ঠাকে চন্দন করে, কুৎসিৎকে সুন্দর করে; প্রেম মানুষকে কোলে তুলিয়া স্বর্গের সিঁড়িতে, দেবত্বে উত্থিত করে। বিধিকৃষ্ণপুরের পঞ্চসখীর জীবন কথা লিখিতে পারি, আমার সে শক্তি নাই। প্রেমিকার কথা প্রেমিক ভিন্ন কে বুঝিতে বা বর্ণনা করিতে পারে? একটী গানে বিরহ-বিধুরা শ্রীরাধিকা বলিতেছেন "জলের মধ্যে মেঘ লুকায়ে রয়েছে সখী, আমার ঘাটে পথে সমান হলো প্রাণ বাঁচানের উপায় কি?" এই

গানটী আমরা কতবার শুনিয়া উড়াইয়া দিয়াছি, কিন্তু একজন প্রেমিক শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। কাল কিছু দেখিলেই শ্রীরাধার কৃষ্ণের কথা স্মরণ হয় এবং প্রাণ অস্থির হয়। বিরহের দিনে মেঘের পানে রাধিকা চাহিতে পারিতেন না। যমুনায় একদিন সখী-বেষ্টিতা হইয়া রাধিকা স্নান করিতে যাইয়া দেখেন, জলের নিম্নে মেঘের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। অমনি শ্রীমতী বিরহবেদনায় অধীরা! এ গান আমরা উড়াইয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু প্রেমিক পারেন নাই। বাস্তবিক প্রেমিকের কথা, প্রেমিক ভিন্ন অন্য কেহ বুঝিতে সমর্থ নয়। কোন রাজ্যের কথাই, সেই রাজ্যের অধিবাসী ভিন্ন অন্যে বুঝিতে বা ব্যক্ত করিতে পারে না। ভক্ত ভিন্ন ভক্তির কথা, জ্ঞানী ভিন্ন জ্ঞানের কথা,এবং বিশ্বাসী ভিন্ন বিশ্বাসের কথা বুঝে না, ইহা যেমন ঠিক, প্রেমিক ভিন্নও প্রেমিকের কথা বুঝে না, ইহাও তেমনি ঠিক। সহস্র অপ্রেমিক প্রেমের কথা শুনিয়া অট্টহাস্যে দিক কাঁপাইতে পারে, অসম্ভব নয়। কিন্তু প্রেমিকের কথা শুনিলে প্রেমিকের চিত্ত উদ্বেজিত হইবেই। আমি প্রেম-বঞ্চিত নারকী, আমি কি প্রেমের স্বর্গীয় কথা বুঝিতে বা লিখিতে পারি?

দীপ্তির আহত শরীর পার্শ্বে তিন সখী—লীলা, সরলা ও তিলোত্তমা বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন। সমস্ত রাত্রি গিয়াছে, এখনও দীপ্তির চৈতন্য হয় নাই, দীপ্তির সর্ব্বাঙ্গে আঘাতের চিহ্ন, শরীর রক্তময়, মুখে পৃষ্ঠে, হাতে পায়ে সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত! পরিধানের বস্ত্র রক্তময়—মস্তকের সুশ্যাম, সুচিক্কণ, সুদীর্ঘ কেশরাশি রক্তে জমাট হইয়া গিয়াছে! সোণার প্রতিমা আজ মৃত্যু-শয্যায়—উজ্জ্বল নয়ন দুটী নিমীলিত, নাসিকায় শ্বাস বহিতেছে, কিন্তু চৈতন্য নাই; মস্তকে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে। মস্তকে কেবল শীতল জল-ধারা এবং বাতাস দেওয়া হইতেছে, আর কোনই ঔষধ দেওয়া হইতেছে না। পুলিস এখনও আইসে নাই। ঘোরতর চক্রান্ত। এজন্য দীপ্তির সর্ব্বাঙ্গের রক্তধারা এখনও প্রক্ষালিত হয় নাই। তিন সখীর নয়নে ধারা বহিতেছে, মুখে কথাটী নাই। ঘোরতর বিষাদ-রেখা, গাঢ় কালিমা-ছায়া সকলের যৌবনোদ্দীপ্ত বদন-শোভাকে ঢাকিয়াছে। দীপ্তির মাতা এক ঘরে পড়িয়া আছেন। তিনি সকলকে বলিয়া দিয়াছেন—"দীপ্তি, পুণ্যপ্রভা, লীলা, সরলা ও তিলোত্তমা, এই পাঁচ সখী একপ্রাণা; আজ দীপ্তির কাছে আর কেহ থাকিও না, ৩ সখী যদি প্রাণ-সঞ্চার করিতে পারে,তবেই দীপ্তি মুখ তুলিয়া চাহিবে। নচেৎ সোণার প্রতিমা চিরদিনের মত ডুবিয়াছে! শেষ দিনে জাত্যভিমানের কথা শুনিব না,

দীপ্তিকে এদের হাতে সঁপে দিলাম।" আর এই ৩ সখীকে বলেছেন—"মা, তোরাই আমার অন্ধের নড়ী; দীপ্তি তোদেরই, এতদিন তোদের ছিল, তোদের সঙ্গে মিশিতে কত নিষেধ করেছি, কত তিরস্কার করেছি, কত প্রহার করেছি, মা আমার কোন কথা রাখে নাই, ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে তোদের সহিত সমস্ত দিন কাটায়েছে, আজ আসন্ন দিনে আর কাকে ডাকিয়া কার হাতে এই সোণার প্রতিমা সঁপে দিব, তোদের জিনিস তোদিকেই দিলাম। রাখিতে হয় রাখ্, বাঁচাতে হয় বাঁচা, মারিতে হয় মার্।" এই কথা বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দীপ্তির মাতা যাইয়া এক ঘরে পড়িয়া রহিয়াছেন। দীপ্তির পিতা মাদারিপুর পুলিসে গিয়াছেন। কাকা ও মেসো ফরিদপুর গিয়াছেন। দীপ্তির ঠাকুরমা একঘরে পড়ে আছেন। বাড়ীতে আর জন-প্রাণী নাই। ঘোরতর চক্রান্ত। দীপ্তির কাকা, নিঃসন্তান ও বিপত্নীক। দীপ্তির পিতার নাম বেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায়।

তিলোত্তমা সম্ভ্রান্ত বৈদ্যবংশের মেয়ে, পিত্রালয় ও শ্বশুরালয় উভয়ই বিধিকৃষ্ণপুর, তাঁহার স্বামী, তাঁহার পিতার বাসায় কলিকাতার কলেজে পড়েন; বাড়ীতে মা আছেন, ছোট ২টী ভাই আছে, একটী ভৃত্য আছে, এক জন গোমস্তা আছে। গোমস্তা ঘুষ-খোর, সে হরিগোপাল বাবুর দলে। তিলোত্তমার পিতা দেশেও থাকেন না, তাঁহার কোন দলও নাই।

সরলা জনৈক শূদ্রের মেয়ে, তাঁহার পিতা মাতা উভয়ই বৃদ্ধ হইয়াছে, একটী বড় ভাই আছে, সে জোত-জমী রক্ষা করে। সরলার স্বামী গোয়ালন্দে হিন্দু-হোটেলে কাজ করে; সেখানে রক্ষিতা রমণী তাহার সংসার করিতেছে, সুতরাং সরলা অকূল পাঁথারে ভাসিতেছে। স্বামী সুখে সে বঞ্চিতা। কিন্তু হইলে কি হয়, সে পঞ্চ সখীর এক জন। আনন্দে, পূর্ণানন্দে তাহার দিন যাইতেছে।

লীলা নাপিতের মেয়ে, পিতৃহীনা, মা আছেন, তাঁহার স্বামী বিধিকৃষ্ণপুরে থাকিয়া শ্বশুরের সমস্ত ঘর বজায় রাখিতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিধিকৃষ্ণপুরের সাধারণ লোক প্রায় সকলেই তারানাথের দলে, সুতরাং সরলা ও লীলার বাড়ীর সকলেই যে এই দলে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ইহারা আশ্রিত, তারানাথ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আজ ইহাদের বাড়ীতে হাহাকার উঠিয়াছে।

কৃতজ্ঞতা নামক স্বর্গীয় জিনিসটা কোথায় বাস করে, পাঠক, তাহা জান কি? পশুপক্ষীতে এবং পশুসম অশিক্ষিত নরনারীর হৃদয়ে। সভ্যতা নামক

দস্যু যে নগরে প্রবেশ করিয়াছে, সেখানে কৃতজ্ঞতা নাই। সেখানে প্রত্যুপকার কথাটা একটা কুসংস্কার বা কাপুরুষের কাজ! সেখানকার মত এইরূপ—"পিতা জন্ম দিয়াছেন, স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হইয়া; মাতা গর্ভে রাখিয়াছিলেন, দায়ে ঠেকিয়া; ধাত্রী প্রতিপালন করিয়াছেন, অনুরোধে; গুরু ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছেন, সম্মানের খাতিরে; শিক্ষক শিক্ষা দিয়াছিলেন, অর্থের মোহিনী মায়ায়!" প্রতিপালক, রক্ষক, সেখানে মুটে মজুরের ন্যায় উপেক্ষিত! উপকারীর বুকের রক্ত শোষণ করা সেখানকার লোকের নিত্য কর্ম্ম, সেখানে বসবাস করে বারমাস কেবল, পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা, বিদ্বেষ এবং হিংসা। ইহার নামই সংস্কৃত ভাষায় সভ্যতা, ইহা যেখানে থাকে, তাহাকে বলে বড় বড় নগর, বড় বড় সহর! কৃতজ্ঞতা যদি দেখিতে চাও, তবে পাঠক, পল্লীগ্রামে যাও; কৃতজ্ঞতা দেখিতে চাও ত, পল্লীগ্রামের যে সকল গৃহে আজও সভ্যতা ও সুশিক্ষার কুবাতাস প্রবেশ করে নাই, সেখানে যাও। অকৃতজ্ঞ সুসভ্য কালিকান্তের ব্যবহার দেখিয়াছ, আজ একবার বিধিকৃষ্ণপুরের সরলা এবং লীলাদের ঘরে এস। দেখ এসে, তারানাথের বিপদ্‌পাতে আজ এই ঘুঘর কেমন গভীর অন্ধকারে ঘেরিয়াছে! সরলার মা বাবা শয্যায় পড়িয়া দুনয়নের অশ্রুতে ভাসিতেছে, আর বলিতেছে "নারায়ণ, এই কি ধর্ম্ম? শ্রীহরি, মধুসূদন, রক্ষা কর।" সরলার দাদা, পুণ্যপ্রভাকে যখন দস্যুরা অপহরণ করে, তখন অসীম সাহসে কালিকান্তের লোকের সহিত পথিমধ্যে যুদ্ধ করিয়াছে। তারপর পিতামাতার নিকট বিদায় লইয়া কোথায় গিয়াছে, এখনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। লীলার মাতা ও স্বামী সমস্ত রাত্রি পুণ্যপ্রভাদের বাড়ীতে রহিয়াছে। তাহারা আহার নিদ্রা ভুলিয়া, যে যাহা বলিতেছে, ছুটিয়া ছুটিয়া তাহা করিতেছে। আর, সরলা, লীলা ও তিলোত্তমা জীবন-মায়া ছাড়িয়া দীপ্তিকে বুকে তুলিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন। স্বর্গ আজ ধরায় যেন অবতীর্ণ। কৃতজ্ঞতা অসময়ের সম্বল, মানবপুরে ঐশীশক্তি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভালবাসার খাতিরে দীপ্তির আত্মত্যাগ।

সেই রজনীর কথা। একটু পরেই দীপ্তি বুঝিলেন যে, বাহির বাড়ীতে গোল। কোন বুদ্ধিমতী মহিলা বৈকালে ঘাটে বলিয়াছিলেন যে, "কোন চক্রান্ত

আছে।” সেই কথা দীপ্তির মনে জাগিল, পুণ্যপ্রভার মনেও জাগিল। উভয়ে চাহিয়া দেখিলেন, মশাল জ্বালিয়া দলে দলে লোক বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। পরামর্শ করিবার মুহূর্ত্ত মাত্রও সময় পাইলেন না, দীপ্তি বলিলেন, “পুণি, মা জগদম্বাকে স্মরণ কর, আমি আসিতেছি।” দীপ্তি তখনই দুখানি তীক্ষ্ণধার দাও লইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, “ধর্ পুণি, ব্যাপার সামান্য বলিয়া বোধ হচ্চে না, আত্মরক্ষার জন্য ইহা সঙ্গে রাখ্।” পুণ্যপ্রভা বলিলেন, “আত্মরক্ষার জন্য ধর্ম্ম, সাহস ও ধৈর্য্য সম্বল কর্, আশীর্ব্বাদ করিস্, আমিও যেন এই সকল সম্বল করিতে পারি ; মা জগদম্বা আছেন, ভয় কিসের লো দীপ্তি ?”

দেখিতে দেখিতে একদল লোক মশাল হাতে লইয়া অন্তঃপুরে আসিল, বাড়ীতে দস্যু পড়িয়াছে দেখিয়া কে কোথায় পলায়ন করিয়াছে, খোঁজ নাই। দস্যুরা আসিয়া পুণ্যপ্রভা ও দীপ্তিকে বেষ্টন করিল। এবং একজন লোক বলিল, তারানাথ গাঙ্গুলীর মেয়ে কোথায় ? তোমাদের মধ্যে একজন কি তারানাথের মেয়ে ?

দীপ্তি নির্ভয়ে বলিলেন, আমাদের দুজনের মধ্যে একজন তাঁহার কন্যা, কি করিবে ?

দস্যু।—রাজা কালিকান্তের আজ বিবাহ, তারানাথ গাঙ্গুলীর মেয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ, জাননা ? আমরা মেয়ে নিতে আসিয়াছি।

দীপ্তি পুনঃ বলিলেন,চরনগর নৌকায় পাকা ৩ প্রহরের পথ,আজ কেমনে বিবাহ হইবে ? তাহা সম্ভব কি ?

দস্যু।—সম্ভব। ৩২ জন বেহারা সহ পাল্কী আসিয়াছে, দুই প্রহরের মধ্যে চরনগর মেয়ে লইয়া যাইবে। বল, তোমাদের মধ্যে কে তারানাথের কন্যা ?

দীপ্তি।—যদি না বলি ?

দস্যু।—না বলিলে উভয়কেই লইয়া যাইব।

দীপ্তি।—তবে তাহাই কর।

পুণ্যপ্রভা একটী কথাও বলিলেন না। দস্যুরা অগ্রসর হইয়া পুণ্যপ্রভাকে যখন ধরিল, তখন দীপ্তির আর সহ্য হইল না, বলিলেন, “এতবড় আস্পর্দ্ধা, আমি সম্মুখে থাকিতে ইহার গায়ে কোন্ সাহসে হাত দিলি পামর ? ব্রাহ্মণের মেয়ের গায়ে হাত দিতে একটুও ভয় হলো না ? বিনা কারণে যে

অঙ্গের অপমান করে, তার শাস্তি দিবার জন্য ধর্ম্ম বিদ্যমান, ন্যায় বিদ্যমান, এই দ্যাখ্।” এই বলিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে দীপ্তি আপনার হস্তের তীক্ষ্ণ দায়ের দ্বারা দস্যুর গলদেশে একটা দারুণ আঘাত করিলেন। দস্যু তখনই পড়িয়া গেল। আর এক জন দস্যু অগ্রসর হইল, তাহাকেও তদ্রূপ করিলেন। তারপর পশ্চাৎদিক হইতে বহু লোক আসিয়া দীপ্তির হাত ধরিয়া নানারূপে অপমান করিতে লাগিল। সে সকল ন্যক্কারজনক দৃশ্য লিখিলেও লেখনী কলঙ্কিত হয়। পাঠক, সকল অনুমান করিয়া লও। মশালের আলোকে এই সময়ে একজন বঙ্গ-কুলতিলক, কালিকান্তের পোষ্যপুত্র বলিয়া উঠিলেন, “ইনিই তারানাথের কন্যা, ইঁহাকে ধরিয়া পাল্কীতে তোল্।” বলিবামাত্র লোকেরা নিমেষ মধ্যে আদেশ পালন করিল। পুণ্যপ্রভাকে পাল্কীতে তুলিয়া তখনই বাহকেরা ছুটিল। পুণ্যপ্রভা নির্ব্বাক্। পুণ্যপ্রভার পাল্কী লইয়া যখন বেহারাগণ ধাবিত হইল, তখন দীপ্তিকে ছাড়িয়া দস্যুগণের কয়েকজন পাল্কীর পশ্চাৎবর্ত্তী হইল, এবং কয়েকজন বাড়ী লুণ্ঠনে নিযুক্ত হইল। দীপ্তির আজ মান সম্মান সব গিয়াছে, যখন প্রাণসম পুণ্যপ্রভাকেও লইয়া চলিল, তখন তিনি পাগলিনীর ন্যায় হইলেন। সর্পের গায়ে আঘাত করিলে যেমন হয়, অথবা সিংহের গুহায় অগ্নি দিলে যেমন হয়, অথবা ভীমরুলের চাকে আঘাত করিলে যেমন হয়, দীপ্তি আজ তেমন হইয়াছেন। স্ত্রীজনোচিত লজ্জা গিয়াছে, স্ত্রীজন-সম্ভব ভীরুতা গিয়াছে, তিনি ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়াছেন। দস্যুরা অস্ত্র রাখিয়া তখন লুণ্ঠন-কার্য্যে ব্যস্ত। নিমেষের মধ্যে ধাবিতা হইয়া দস্যু-রক্ষিত অস্ত্র রাশির মধ্য হইতে একখানি তরবারি তুলিয়া লইলেন, এবং পাল্কীর আলোক লক্ষ্য করিয়া ধাবিতা হইলেন। যখন পাল্কীর নিকটবর্ত্তিনী হইয়া লোক ধরিতে পারিলেন, তখন এক ধার দিয়া লোকরাশির উপর অস্ত্র চালাইতে লাগিলেন। লাস ও আহত লোক গ্রহণের অতি সুন্দর বন্দোবস্ত ছিল, যে ব্যক্তি পড়িতে লাগিল, তাহাকেই দস্যুরা তুলিয়া লইতে লাগিল। একদল দস্যু দীপ্তির সহিত লড়িতে লাগিল। বাঙ্গালীর রমণী পুরুষ দস্যুর নিকট কতক্ষণ আঁটিয়া উঠিতে পারে? ক্রমে ক্রমে আঘাতে আঘাতে দীপ্তির শরীর নিস্তেজ হইয়া আসিল, অবশেষে দুই একটা গুরুতর আঘাত পাইয়া “মা গো” বলিয়া অচেতন হইয়া দীপ্তি ধরায় পড়িলেন। দস্যুরা পলায়ন করিল।

এই ঘটনা ঘটিবার অব্যবহিত পরেই দেবী প্রসন্নময়ীর গৃহে আগমন। তখন কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে। ইহার অব্যবহিত পরের ঘটনা পাঠক

অবগত হইয়াছেন। যে নৌকায় আগুন লাগিয়াছিল, তাহা জলমগ্ন হইয়াছে। দুই ঘণ্টার মধ্যে তারানাথের মান সম্ভ্রম সকলই বিসর্জ্জিত হইল। কুমার নদী যেমন বহিতেছিল, তেমনই বহিতে লাগিল, ঝাউগাছ যেমন শোঁ শোঁ করিতেছিল, তেমনই করিতে লাগিল—কিন্তু বাড়ীর যথা সর্ব্বস্ব আজ বিসর্জ্জিত হইল! সোণারপুরী আজ মহা অন্ধকারে নিমগ্ন!!

নবম পরিচ্ছেদ।

রূপচাঁদের হাটে ধর্ম্ম-বিনিময়।

দেবী প্রসন্নময়ী, দস্যু-লুণ্ঠনের পর, সেই যে জগদম্বার ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন, সমস্ত রাত্রি গিয়াছে, এখনও দরজা খুলেন নাই। শূন্য বাড়ীর কি দেখিতে দরজা খুলিবেন? তিনি মহামায়ার ঘরে মহাযোগে নিমগ্না। চরিত্র ও ধর্ম্ম ভিন্ন এ জগতে আছে কি এবং শেষে থাকেই বা কি? ধন বল, জন বল, ঐশ্বর্য্য বল, সম্পদ বল, নিমেষে আগমন, নিমেষে গমন! এত সাধের যৌবন, যাহার উত্তেজনায় মানুষ পাগল, যাহার তাড়নায় বিদ্যা বুদ্ধি, ধন ঐশ্বর্য্য সকলই মানুষ অকাতরে ঢালিতেছে, সকলের মায়া পরিত্যাগ করিতেছে, এত সাধের যশ মানকেও তুচ্ছ করিয়া ঠেলিয়া ফেলিতেছে, তাহা কতক্ষণের জন্য? দশ বৎসর, পনর বৎসর, নয় বিশ বৎসর, তারপরই রিপু ও ইন্দ্রিয় শিথিল, জোয়ারের টান সরিয়া পড়িয়াছে, মানুষ নিস্তেজ, নিস্পন্দ। যৌবন যদি এতই অল্পকাল-স্থায়ী, তবে মানুষ বুঝে না কেন? মহামায়ার মহা লীলা-চক্র-ব্যূহ কে ভেদ করিতে পারে? রিপুর হাত এড়ান কঠোর তপস্যার ফল, দুঃসাধ্য সাধনার ফল। গভীর তপস্যা, সংসার-নির্লিপ্ত কঠোর সাধনা ভিন্ন কেহই এ স্থানে জয়ী হইতে পারেন না। একটা রিপু নিস্তেজ হইলে, আর একটা প্রবল হয়। কাম গেলে ক্রোধ; ক্রোধ গেলে লোভ; লোভ গেলে হিংসা, এই রূপে একের পর আর এক উপস্থিত হইয়া মানুষকে অস্থির করে। রিপু-জয়ের ঔষধ কি? কেবল কঠোর সাধনা। রিপু-জয়ের ঔষধ কি? কেবল কঠোর তপস্যা। বারম্বার পদস্খলন হওয়া, এ জগতে বিচিত্র নয়, তাহা হইলেও সাধনাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে না অটল, অচল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কঠোর সাধনা করিতে হইবে। ইচ্ছাকে

বলি দিতে না পারিলে নিষ্কৃতি নাই। সংসার-নিরপেক্ষ হইয়া কঠোর সাধনা করিতে হইবে; পৃথিবী আছে কি নাই, তাহাও মনে থাকিবে না। মনে থাকিবে না, আমি একাকী, না স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-সম্বলিত? মনে থাকিবে না, আহার নিদ্রা, ভয় অশান্তি। তবে সিদ্ধি সম্ভব। এক, অনাদি, নিত্য, শুদ্ধ বুদ্ধ পরম বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া বসিতে হইবে, বুদ্ধের ন্যায়, শ্রীগৌরাঙ্গের ন্যায়, ঈশার ন্যায় ইচ্ছা-বলিদান-সময়ে কঠোর হইতে হইবে; তবে সিদ্ধি সম্ভব। দেবী প্রসন্নময়ী ইহা বুঝিয়াছেন। সার অসার, নিত্য অনিত্য, ভাল মন্দ বুঝিয়া তিনি সংসারের অতীতত্ব সাধনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। আজ বাড়ীর উপর দিয়া দারুণ ঝড় বহিয়া গিয়াছে, তিনি আজ আরো নিশ্চিন্ত, তিনি আরো নিরুদ্বেগ। ইচ্ছাকে বলি দিতেই যেন তাঁহার জন্ম। পাড়ার মেয়েরা সর্ব্বদা বলাবলি করিত, "বিপদ আসিলে প্রসন্নময়ী যেন পাষাণ হইয়া যান—এরূপ ত কখনও দেখি নাই। সমস্ত দিন সংসারের লোকের ন্যায় সেবা শুশ্রূষা, পরিচর্য্যা করিতেছেন, হাসিতেছেন, বেড়াইতেছেন, সাধারণ স্ত্রীলোকের সহিত কোনই পার্থক্য নাই। বিপদ আসুক, দেবী যেন পাষাণে দেহ রূপান্তরিত করিয়াছেন।" পাড়ার কোন জীবিত কি মৃত ব্যক্তি, কখনও দুঃখ বিপদে প্রসন্নময়ীর চক্ষের জল পড়িতে দেখে নাই। প্রসন্নময়ী যেন অতীন্দ্রিয় রাজ্যের চেলা—ইন্দ্রিয় বা রিপু—এ সকলের কোন উত্তেজনা কেহ কখনও দেখে নাই। বিপদের আক্রমণ যত তেজে হইবে, প্রসন্নময়ী ততই পাষাণবৎ, ততই নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ, সদানন্দ। বিধির এক আশ্চর্য্য খেলা।

আজ প্রত্যূষে পাড়ার মেয়েরা সেই বাঁধা পুকুরের পশ্চিমের ঘাটে জুটিয়াছে, কেহ স্নান করিতেছে, কেহ পূজা আহ্নিক করিতেছে, কেহ জল তুলিতেছে, কেহ বাসন মাজিতেছে। ঘাটে একটা হাট বসিয়া গিয়াছে। কার্য্যের তৎপরতায় জলে যেমন তরঙ্গ বহিতেছে, সকলের মুখেও তেমনি কথার তরঙ্গ বহিতেছে। আমরা একবার শুনিতে চেষ্টা করি, কে কি বলিতেছে। লোকে বলে, ঘাটে হাটে মাঠে, এই তিন স্থানে বেড়াইলে যেমন দেশের প্রকৃত অবস্থা জানা যায়, এমন আর কোথাও নয়। শুনি, মহিলারা আজ কি বলাবলি করিতেছেন।

কল্যকার সেই বুদ্ধিমতী মহিলা আজও আসিয়াছেন। তিনি, বুদ্ধিতে যেন পাড়ার নেতা, বলিতেছেন, "কেবল টাকার মায়া, কেবল টাকার মায়া গো! ভাশুর-পোয়ের কাল্ সর্ব্বনাশ হয়ে গেল, কত জনকে বলিলাম, তা কেহই

আগুয়ান হলোনা, এমন ত আর দেখি নাই! মান ইজ্জত লয়ে এ গ্রামে থাকা দায় হলো দেখ্‌ছি। আজ প্রাতে আবার টাকা বৃষ্টি হয়েছে। কালিকান্তের ও হরিগোপালের টাকার খেলা দেখে অবাক্ হয়েছি। আরো অবাক্ হয়েছি, এই গ্রামের লোকদের চরিত্র দেখে। ভাশুর-পো প্রাণ দিয়া যাদের উপকার করেছে, তাহারা অনেকেই আজ বিরুদ্ধে। পুরুষ-মহলে কাণাকাণি চলেছে, এ গ্রামে যে কাল কিছু হয়েছে, পুলিস আসিলে কেহই তাহা বলিবে না। কাহারও ঘরে ওলাউঠা ও বসন্ত হলে কেহ ধারে ঘেসে না, ভাশুর-পো সকলের বাড়ী ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে যান। আজকাল যার ঘরে খাবার নাই, তার ঘরে খাবার দিতেছেন, যার ঘরে বস্ত্র নাই, বস্ত্র দিতেছেন। এই গ্রামটাকে তিনিই রেখেছেন বল্লে হয়। দেশের ছেলে গুলো বয়ে যাচ্ছিল, তিনিই মানুষ করে তুলেছেন, তার প্রতিদান—দেশে আজ টাকার খাতিরে অনেকেই তার শত্রু! স্কুলের ছেলেরা কাল প্রাণ দিতে প্রতিজ্ঞা করেছিল, কর্ত্তাদের তাড়নায়, তাহারা তাহা পারে নাই! গুরু পুরোহিত ও স্কুলের শিক্ষকগণ পর্য্যন্ত এক জোট। কি সর্ব্বনাশ!

দ্বিতীয়া।—তোরা ভাই কত টাকা পেয়েছিস্, আমরা ত দশটী বই টাকা পাই নাই। তা এক মাসের জন্য নিশ্চিন্ত হয়েছি।

প্রথমা।—আমার কর্ত্তাকে দুইশত টাকা লয়ে সাদাসাদি কচ্ছে, আমি বলে এসেছি, আজ যদি টাকা লয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে যাবে, আমি পুলিসে হাজির হয়ে সব প্রকাশ করে দেব। জানি না, কর্ত্তা কি ভাবিতেছেন?

তৃতীয়া।—শুনে অবাক্ হলাম, প্রসন্নময়ী এখনও জগদম্বার ঘরে। মাগী যেন পাষাণ, আমি ত কখনও এরূপ পারি না; স্বামী গেল, মেয়ে গেল, মান গেল, ইজ্জত গেল, মাগী দরজা বন্ধ করে রঙ্গ দেখ্‌ছেন। হায়রে ধর্ম্ম!

চতুর্থী।—বিপদ আসিলে প্রসন্নময়ী যেন পাষাণ হন; জগদম্বার ন্যায় যেন একটা পাথরের মূর্ত্তি বসিয়া আছে, উঁকি মেরে দেখে এলাম। বাড়ীতে সাড়া শব্দ নাই, নিরানন্দের রাজ্য, প্রসন্নময়ী নিশ্চিন্ত মনে জগদম্বার ঘরে বসে আছেন! সত্যই আমরা হলে ত আজ কেঁদে পাড়া তোলপাড় করতেম।

প্রথমা।—তবেই সব বাজিমাৎ হয়ে যেত গো! তোমরা জান কেবল কাঁদ্‌তে! বিপদে ধৈর্য্য চাই, জান না কি?

চতুর্থী।—আমরা জানি কেবল কাঁদ্‌তে, আর আপনি জানেন কেবল বক্তৃতা কর্‌তে, বাজি আপনিই বেশ মাৎ করছেন?

পঞ্চমা।—দীপ্তিকে দেখ্‌লে পাষাণও ফেটে যায়। এখনও দীপ্তির চেতনা হয় নাই। ডাক্তার নাই, কবিরাজ নাই, লীলা, তিলোত্তমা, সরলা বসে কেবল মাথায় জল দিচ্ছে, আর বাতাস কচ্ছে। দীপ্তির দশা দেখ্‌লে আর ঠিক থাকা যায় না! মেয়ে ওটীর ভালবাসা দেখে অবাক্ হয়েছি।

তৃতীয়া।—পুলিসে কাল লোক গেছে, এখনও লোক ফিরে এলোনা, ব্যাপারটা কি?

প্রথমা।—ব্যাপারটা বুঝনা, রূপচাঁদের মোহিনী শক্তি! ডেপুটী বাবুর ইঙ্গিত, পুলিস আজ কিছুতেই আসিবে না, বুঝিলে ঠাকুরণ?

দ্বিতীয়া।—দীপ্তি বুঝি এ যাত্রা আর রক্ষা পায় না! শুনিলাম, দীপ্তি কাল ৮।১০ জন লোককে খুন করেছে। মেয়ের সাহস দেখ!

প্রথমা।—দীপ্তি সাহসে কিছু করে নাই, প্রাণের টানে করেছে। তোমার বুকের ছেলে কেহ কেড়ে নিতে আসিলে তুমি কি কর?

দ্বিতীয়া।—দীপ্তির মত মেয়ে আর হয় না।

তৃতীয়া।—না—দীপ্তি ও পুণ্যপ্রভার মত মেয়ে আমরা আর দেখি নাই। যেমন পুণ্যপ্রভা, তেমনই দীপ্তি। দুই যেন একহাড়, একপ্রাণ।

ঘাটের কথা ঘাটে চলিতে থাকুক, আমরা একবার বিবিকৃষ্ণপুরের বাজারের সংবাদটা লইয়া আসি। সেখানে কি হইতেছে?

কালিকান্তের তরফ হইতে বরকন্দাজ,পেয়াদা, আরদালি,নায়েব ও গোমস্তা সহ এক প্রকাণ্ড তসিলের কিস্তি বাজারের ঘাটে লাগিয়াছে। প্রকাশ যে, আশ্বিনের কিস্তি নিকট,বাজারে তসিলের জন্য এই নৌকা আসিয়াছে। কিন্তু কাজ হইতেছে কি?

বিবিকৃষ্ণপুরের বাজার হরিগোপালের। বাজারের উপর হরিগোপালের এক কাছারী আছে। কাছারীই বল, বাগানবাড়ীই বল,ইয়ারকির আড্ডাই বল, বা অত্যাচারের কুলি-ডিপোই বল, যা খুসি। এই কাছারীতে আজ হরিগোপাল তিন পুত্র সহ উপস্থিত। দীর্ঘ দীর্ঘ লাঠীধারী লাল-পাগড়িওয়ালা হিন্দুস্থানী দ্বার-রক্ষকেরা যাহাকে পাইতেছে, ধরিয়া কাছারীতে আনিতেছে, যে সহজে আসিতে চাহে না, তাহাকে প্রহার পর্য্যন্ত করিতেছে,বলিতেছে "বাবুকে নজর দিয়া যা।" বাজারময় দুই তরফের গোমস্তা। তাহারা ভদ্রলোকদিগকে তোষামোদ করিয়া, কাহাকেও ভয় দেখাইয়া, কাহাকেও নৌকায় এবং কাহাকেও কাছারীতে আনিতেছে। নদীর ধারে পাঁচ স্থানে কমিটী বসিয়াছে, কাছারীর

পেছনেও স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কমিটী বসিয়াছে। এই পাঁচ কমিটীতেই হিতোপদেশ প্রদত্ত হইতেছে। যেন খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণ ধর্ম্ম কথা শুনাইতেছেন ভয়েই হউক বা প্রলোভনেই হউক, অনেক ভদ্রলোক নজর দিতে কাছারীতে যাইতেছে, কেহ বা নৌকায় খাজনা দিতে যাইতেছে এবং হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিতেছে। কাছারীতে ও নৌকায় রূপচাঁদের হাট বসিয়াছে। আজ রূপচাঁদের বিনিময়ে মানুষের ধর্ম্ম বিক্রীত হইতেছে, সত্য বিক্রীত হইতেছে, চরিত্র বিক্রীত হইতেছে। যখন কেনা-বেচা শেষ হইয়া যাইতেছে, তখন প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর হইতেছে। সে প্রতিজ্ঞা পত্র উভয় স্থলেই এইরূপ—"আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমার বাড়ীর কেহই কল্যকার কথা প্রকাশ করিবে না, সকলেই বলিবে, কাল বা আর কোন দিন এ গ্রামে লুটপাট বা মেয়ে চুরি হয় নাই। যদি প্রকাশ পায় যে, আমি আমার প্রতিজ্ঞা রাখি নাই, তবে ধর্ম্মের নিকট ও আপনাদের নিকট দায়ী থাকিব ও টাকা প্রত্যর্পণ করিব এবং আপনাদের বিধানে যে কোন অত্যাচার থাকে, তাহা সহ্য করিব।" দশ, বিশ, পঞ্চাশ, শত টাকায় আজ বিধিকৃষ্ণপুরের বাজারে মানুষের ধর্ম্ম, স্বাধীনতা ও চরিত্র বিক্রয় হইতেছে। যাহারা প্রস্তাবে অসম্মত হইতেছে, তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য ঐ পাঁচ কমিটীর কোন একটীতে লইয়া যাওয়া হইতেছে। এক কমিটীর উপদেষ্টা একজন ন্যায়রত্ন উপাধিধারী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, এক কমিটীর উপদেষ্টা দুধু মেঞার একজন প্রধান চেলা, এক কমিটীতে গাঙ্গুলী বংশের কুলদেবতা, এক কমিটীতে পরাণ মণ্ডল নামক এক জন প্রধান মোড়ল এবং অন্য কমিটীতে একজন জ্ঞানী—সুশিক্ষিত ব্যক্তি।

পাঁচ জন উপদেষ্টার নিকট, উপযুক্ততা অনুসারে, লোক লইয়া যাওয়া হইতেছে। অর্থাৎ যাহারা স্কুলে পড়ে, তাহাদিগকে জ্ঞানীর নিকট; প্রাচীনদিগকে কুলদেবতার নিকট; যাহারা যজন-যাজন-ব্যবসায়ী, তাহাদিগকে পণ্ডিতের নিকট; যাহারা মুসলমান, তাহাদিগকে দুধু মেঞার চেলার নিকট এবং অবশিষ্ট কৃষকদিগকে "পরাণ মণ্ডলের" নিকট। উপদেশ ও বক্তৃতার ফল হাতে হাতে ফলিতেছে, এ যেন মুক্তি-সেনার উপদেশ, উপদেশ দেওয়া আর পাকড়ান—সমসাময়িক। কাহারও এড়াইবার যো নাই। দুই চারি জন লোক, স্ত্রী-পুত্রের উত্তেজনায়, বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া টাকা ফেরত দিতে চাহিতেছে। তাহাদিগকেও এই সকল স্থানের কোন

স্থানে লইয়া যাওয়া হইতেছে। উপদেশে শাস্ত্রের দোহাই আছে, ভয়ের কথা আছে, শিক্ষার কথা ও সভ্যতার কথা আছে—ধর্ম্ম ও নীতির দোহাই আছে, সর্ব্বপ্রকার উপদেশই আছে। পৃথিবীতে সকল প্রকার অপকর্ম্মেরই যে পাওা বা পরিপোষক পাওয়া যায়, আজ বিধিকৃষ্ণপুরের বাজারে তাহারই জীবন্ত দৃষ্টান্ত অভিনীত হইতেছে। আমরা জ্ঞানী ও সুশিক্ষিত ব্যক্তির উপদেশটা সাদরে এখানে তুলিয়া দিলাম। তিনি এক জন বিখ্যাত কলেজের প্রফেশর, যেমন আকৃতি, তেমনই বিদ্যা! দাঁত চিবাইয়া উচ্চরবে বিজ্ঞ সকলকে বলিতেছেন—"দেখ, যখন রক্ত গরম ছিল, তখন আমারও প্রবৃত্তি ছিল যে, কখনও ঘুষ গ্রহণ করিব না। এখন বয়স বৃদ্ধির সহিত বুঝিতেছি, টাকা ভিন্ন এক দিনও চলে না,—উদর-জ্বালা নিবারণ হয় না। জীবন ধারণের জন্য যখন টাকার প্রয়োজন, তখন টাকা উপার্জ্জনের মধ্যে আর বিবেচনা থাকিতে পারে না। যে উপায়ে হউক, কিছু দিন টাকা উপার্জ্জন করিয়া শেষে সমস্ত ছাড়িয়া ধর্ম্ম করিলেই চলিবে। দেখ, কে কি উপায়ে না টাকা রোজকার করে? ওকালতি করিবে, মিথ্যা সাক্ষ্য সাজাইতে হইবে, মিথ্যা কথা বলিতে হইবে; কেরানীগিরি করিবে, কর্ত্তার পদাঘাত অম্লানচিত্তে সহ্য করিতে হইবে; বাণিজ্য করিবে, সাচ্চা মালে ঝুটা মিশাইতে হইবে, তারপর মিথ্যা বলিতে ও প্রলোভন দেখাইতে হইবে; গ্রন্থকার হইবে, মৌলিক কিছু লিখিলে তাহা কখনই বিকাইবে না, অন্যের জিনিস চুরি করিয়া স্কুলের পাঠ্য যদি কিছু লিখিতে পার ও ঘুষ দিয়া যদি তাহা স্কুল-পাঠ্য-লিষ্টভুক্ত করিতে-পার, তবে টাকা পাইবে। মাষ্টারি করিবে, ৩০৲ টাকা বেতন লিখিয়া ২০৲ টাকা গ্রহণ করিতে হইবে। টাকা, সৎ উপায়ে, সম্মান বজায় রাখিয়া, উপার্জ্জন করা যায় না। দেখ, ঐ কৃষকগণ, ঐ শ্রমজীবীগণ সারা বৎসর রৌদ্র বৃষ্টিতে ভিজিয়া খাটিতেছে, উদরে অন্ন নাই, চালে ছোন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই। কেবল খাটিলেই অন্ন মেলে না। সৎপথ নামক কোন পথ নাই। অর্থকরী কোন বিদ্যা নাই। রুচিতেই সকল। গীতার উপদেশ স্মরণ কর—নিষ্কাম হইয়া সকল কার্য্য কর, কৃষ্ণার্পণ করিয়া কার্য্য কর, কোন পাপই নাই। ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুলিতে পারিলে তবে যোগ হয়। পাপ পুণ্য আবার কি? ওটা মনের খেয়াল মাত্র? যাও টাকা লইয়া প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করগে।"

এই জ্ঞানীর উপদেশে যা কিছু তর্ক বিতর্ক উঠিতেছে, আর কোথাও বড় তর্ক বিতর্ক নাই। জ্ঞানীর উপদেশ শুনিয়া কেহ কেহ বলিতেছেন, "মহাশয়,

আপনার উপদেশ ত শুনিলাম," বলিতে পারেন, আপনার টাকা কদিন থাকিবে? বলিতে পারেন, আপনার টাকা সঙ্গে যাইবে কি না? বলিতে পারেন, পাপের টাকা কত দিন থাকে?" উপদেষ্টা এহেন ধৃষ্ট লোকদিগকে লাল-পাগড়িওয়ালা লোকদের হস্তে সমর্পণ করিতেছেন, তাহারা, ভদ্র ভাষায় বলিতে গেলে, কাণের উপর হাত চালাইয়া সমস্ত ঠিক করিয়া লইতেছে। যাহারা তাহাতেও ঠিক হইতেছে না, পৃষ্ঠদেশের সহিত পাদুকাপরিচয় করাইয়া তাহাদিগকে রূপচাঁদের হাটে লইয়া যাইতেছে।

এই প্রকারে প্রায় সকল লোকই ঠিক হইতেছে, কিন্তু এক শ্রেণীর নিরক্ষর লোক কিছুতেই ঠিক হইতেছে না। কঙ্কাল-দেহধারী, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদের সহিত হাট বাজারের কোন সম্বন্ধ নাই, তাহারা বড় কেহই আইসে নাই। যে বিশ পঁচিশ জন আসিয়াছে, তাহাদিগকে আঁটিয়া উঠা যাইতেছে না। পরাণ মণ্ডলের হাটে বড় বিষম গোল বাধিয়াছে। প্রহারের চোটে ৫ জন লোক মরিয়াছে; তবুও তাহারা তারানাথের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে স্বীকার করে নাই, কাল রাত্রে তাহারা তারানাথের বাড়ী রক্ষা করিতে গিয়াছিল। তাহারা বলিতেছে যে, "প্রাণ গেলেও সত্য গোপন করিতে পারিব না।" ৫ জন যে পথে গিয়াছে, আর কয়েক জন লোক সেই পথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত, তাহারা বলিতেছে—"মশায়, ঘর জ্বালাও, স্ত্রীলোকের বে-ইজ্জত কর, জলে ডুবাও, মেরে ফেল, কিছুতেই আমরা প্রাণদাতার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলিতে পারিব না। কাচ্চাবাচ্চা লয়ে ঘর করতে হয়, মা প্রসন্নময়ী ও বাপ তারানাথের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে কোন মতেই পারব না। তা মেরে ফেল, অনাহারে মরার চেয়ে ইহা সহস্রগুণে ভাল।"

বেলা বাড়িতে লাগিল, প্রহারে প্রহারে সব অবসন্ন হইয়া পড়িল। আরো ২।৪ জন মরিল, তবুও এক দল লোক স্বীকার করিল না। বিড়ম্বনা আর কি? অবশেষে বৈঠকে ধার্য্য হইল যে, পূর্ব্বে পুলিসে যে টাকা পাঠান হইয়াছে, তাহা বাদে আরো বিশ হাজার টাকা পাঠান হউক। কিছুতেই পুলিস যেন আজ বিধিকৃষ্ণপুর না আইসে। দলে দলে হিন্দুস্থানী বরকন্দাজ টাকা লইয়া ছুটিল। বেলা ১১ টার মধ্যে বাজারের কেনা-বেচা শেষ হইল, কিন্তু এক দল লোক কিছুতেই বিক্রীত হইল না। এমন মূর্খও কি জগতে আছে, যে রূপচাঁদ বুঝিল না, ধর্ম্মই সার বুঝিল?

দশম পরিচ্ছেদ।

দেবী দর্শনে।

হায় রে টাকা, তোর মোহিনী শক্তি অপার। সমস্ত দিন যায়, তবুও পুলিস বিধিকৃষ্ণপুরে আসিল না। যে দুর্ভিক্ষপীড়িত কৃষক দল টাকার মায়ায় ভুলে নাই, তাহাদের সম্বন্ধে কি বিধান হইল, পাঠক শুনিতে চাহ কি? নৃশংসতার উপর নৃশংসতা, লিখিতে পারে কে, শুনেই বা কে?

সরলার দাদাকে জলে ডুবাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহার পিতা মাতাকে হরিগোপালের লোক ধরিয়া লইয়া গিয়া কয়েদ রাখিয়াছে, গৃহ লুণ্ঠন করিয়া ভাঙ্গিয়া কুমার নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছে, ভিটা চাষ করিয়া তাহাতে সরিষা বুনাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের দুই দশ ঘর লোক তারানাথের একান্ত অনুরক্ত ছিল, তাহাদের ঘর জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এক গ্রামের দুজন ব্যক্তির হাত বলপূর্ব্বক সর্পের হাঁড়িতে ঢুকাইয়া তাহাদিগকে দংশন করাইয়া মারা হইয়াছে। বিধিকৃষ্ণপুরের এক কৃষকের যুবতী মেয়েকে উলঙ্গ করিয়া দুই মুসলমান সর্দ্দার বে-জ্জইত করিয়াছে! তাতেও যখন কৃষক স্বীকার করে নাই, কৃষকের স্ত্রীর কোল হইতে ছেলে কাড়িয়া তরবারিতে ফুড়িয়া রৌদ্রে রাখা হইয়াছে!! কাহারও লাঙ্গল গরু বাছুর লুঠিয়া লওয়া হইয়াছে, স্ত্রী পুত্র কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে এবং হাত পা বাঁধিয়া রৌদ্রে ফেলিয়া রাখা হইয়াছে! কাহারও হাতে পায়ে পেরেক মারা হইয়াছে! অত্যাচারের ভীষণ পরাক্রম চলিয়াছে! দুঃখীর আর্ত্তনাদে আকাশ পূর্ণ হইয়াছে! টাকায় পুলিশ বশ, ডেপুটী বশ, গ্রামের প্রায় সব লোক বশ!! হায়রে টাকা, বলিহারি তোর মোহিনী শক্তি! ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সুশাসনের যাঁহারা বড়াই করেন, তাঁহারা অনুসন্ধান করুন, এই সকল কথার জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবেন।

শান্তিশীলা পুত্রবধূগণকে লইয়া আজ কোথায়? দেশ অত্যাচারে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, কে কাহাকে দেখে!

ক্রমে ক্রমে বিধিকৃষ্ণপুরের ভদ্রশ্রেণী অধিকাংশই একরূপ বশ হইয়াছে, কিন্তু দীপ্তির পিতা প্রভৃতি বশ হন নাই। দীপ্তি আজ মৃত্যুশয্যায়, পূর্ব্বেই বলি-

য়াছি। কিন্তু পাষাণ-হৃদয় যাহারা, তাহারা এহেন লোককেও বধ করিতে ছাড়ে কি? দীপ্তিকে ডুবাইতে পারিলেই সকল দিক নিষ্কণ্টক হয়! কিন্তু উপায় কি? এই কার্য্য কাহার দ্বারা সংসাধিত হইবে? ব্রাহ্মণ-কন্যা বধের পাপ কে মাথায় লইবে? গাঙ্গুলী বংশ কি ব্রাহ্মণ-তেজ ভুলিয়া এত দূর নীচতায় পৌছিবে? একটা তুমুল কাণ্ড হইবে কি? হরিগোপাল বাবুর মন্ত্রীরা এই সকল কথার মীমাংসা করিতেছেন। টাকার খাতিরে একজন লোক দীপ্তির মাথা লইতে স্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু এতদূর যাইতে মন্ত্রীসভার পরামর্শ হইল না। মন্ত্রীসভা পরামর্শ করিলেন, এই কথা রাষ্ট্র করা হউক যে, দীপ্তির এক উপপতি অন্য উপপতির অস্তিত্ব সন্দেহ করিয়া দীপ্তিকে এই রূপ আহত করিয়াছে। দীপ্তির চরিত্রে কলঙ্ক ঘোষণা করিয়া কঠিন সমস্যার মীমাংসা করার কথা হইল! তবে পুলিসের এজেহার এই প্রকার হয় নাই কেন? ইহার উত্তরে বলা হইবে যে, বংশ মর্য্যাদার খাতিরে, কুলের খাতিরে, দীপ্তির পিতা মিথ্যা এজাহার দিয়াছে। কূট বুদ্ধির কূট মীমাংসা! কিন্তু সত্য কি কখনও চিরদিন গোপনে থাকে? কোন বুদ্ধিমানই এ কথা ভাবিলেন না। সকলেরই বিশ্বাস, টাকার অসাধ্য কিছুই নাই।

আর একটা পরামর্শ হইয়াছে। দীপ্তির মাতাকে হাত করিবার কথা হইয়াছে। যেমন পরামর্শ অমনই হাতে হাতে কাজ। দীপ্তির মাতা ঘরে শুইয়াছিলেন, হরিগোপাল বাবুর স্ত্রীর দাসী তাঁহাকে যাইয়া বলিল, "মা আপনাকে ডাকিতেছেন।" শান্তিশীলার প্রতি পাড়ার সকল মেয়ের ভাল-ভাব। "মা ডাকিতেছেন" এই কথাটা দীপ্তির মায়ের প্রাণে যেন শান্তিধারার মত বোধ হইল, বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, "আমার দীপ্তির কি সর্ব্বনাশ হয়েছে, তা তিনি শুনেছেন কি? আমার কপাল ভেঙ্গেছে তা তিনি শুনে-ছেন কি?" দাসী বলিল, "শুনেছেন, সেই জন্যই আপনাকে ডেকেছেন।"

দীপ্তির মাতা উঠিলেন। দীপ্তিকে একবার দেখিলেন, একবার দীপ্তির মুখচুম্বন করিলেন, তারপর লীলা, সরলা, তিলোত্তমাকে বলিলেন, "তোমরা থাক, আমি শীঘ্রই আসিতেছি।" দীপ্তির পিতা তখনও পুলিস হইতে ফিরেন নাই, মাতা হরিগোপালের অন্তঃপুরে গেলেন। দীপ্তির মাতাকে দেখিয়া শান্তিশীলা উঠিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন, বধূগণও প্রণাম করিল। তারপর তিনি বসিতে বলিলেন। শান্তিশীলার দুনয়নে জল ধারা বহিতেছিল। দুঃখ কষ্টে তিনি যেন আজ শান্তিধারা ছাড়িয়া দিয়াছেন; অতিকষ্টে ভাব সংবরণ

করে শান্তিশীলা বলিলেন "দীপ্তির কি এখনও চৈতন্য হয় নি? আমাদের ডাক্তারকে বলিয়াছি, তিনি যাইয়া চিকিৎসা করিতে চাহেন। কি বলেন?"

দীপ্তির মাতা।—কর্ত্তা ঔষধ দিতে নিষেধ করে গেছেন, তিনি বলেছেন, "চতুর্দ্দিকে চক্রান্ত,মেয়ে যদি আমাদের হয় ত আপনি বাঁচিবে, ঔষধ খাওয়াইয়া আর মারিও না।" টাকায় যে সমগ্র দেশ বশ হতেছে, শুন নাই কি?

শান্তিশীলা।—সকলই শুনেছি। কর্ত্তা আমাকে ডেকে বল্‌তেছিলেন, নৌকা করে দীপ্তিকে ভাল ডাক্তারের নিকট পাঠাইলে কেমন হয়? সমস্ত ব্যয় তিনি বহন করিতে চাহেন।

দীপ্তির মাতা।—তাত বুঝিলাম, কর্ত্তা না আসিলে আমিত ভাল মন্দ কিছুই বুঝিনা। আমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে।

শান্তিশীলা।—দীপ্তির চিকিৎসায় অনেক খরচ হবে, আপনাদের অবস্থা তত ভাল নহে, কর্ত্তা সাদরে এই নোটগুলি আপনাকে দিতেছেন, গ্রহণ করুন।

দীপ্তির মাতা।—টাকা কড়ি দিয়া আর কি করিব বোন্? দীপ্তি যদি যায়, আমরা কুমারে ডুবিয়া মরিব। নোটগুলি তোমার নিকটে থাকুক, তুমি পুণ্যবতী, সতী সাধ্বী, আমাদের শ্রাদ্ধে ব্যয় করিও।

শান্তিশীলা।—এ টাকা আমার, এই রূপ মনে করে গ্রহণ করুন।

দীপ্তির মাতা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তোমার নিকট এই কথা শুনিবার জন্য আমি আসি নাই, তোমার নিকট দুটো প্রাণ-জুড়নের কথা শুনিব বলিয়া আসিয়াছি। কি ছাই টাকার কথা বলিতেছ? রেখে দেও তোমার টাকা! টাকা বিষ। টাকার মায়ায় আমাকে ভুলাবে?

শান্তিশীলা ভাল মন্দ কিছুই জানেন না, টাকার হাঁড়ি যে বিষভরা, এতক্ষণ পর বুঝিলেন। বলিলেন, দেবি, আমার অপরাধ লইবেন না, ক্ষমা করুন।

দীপ্তির মাতা।—রাগ করিও না, সত্যই বলিতেছি, টাকার বশ আমরা হইব না; তোমাকেও অনুরোধ, তুমি ইহার মধ্যে থাকিও না।

শান্তিশীলা।—দেবি, বুঝেছি। দেবী প্রসন্নময়ী বলেন, সাধুতার দ্বারা অসাধুতাকে, অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিতে হইবে। এবারও কি সেই শাস্ত্র?

দীপ্তির মাতা।—শাস্ত্র চিরকাল একই। দেবী প্রসন্নময়ী আজ এই গভীর

বিপদের দিনে, নির্ব্বিকার ও নিশ্চিন্তচিত্তে জগদম্বার ঘরে মহা সাধনায় নিযুক্তা, শুন নাই কি? সেখানে বৈকুণ্ঠ অবতীর্ণ। সেখানে নিত্যানন্দ। একবার পাল্কী চড়ে দেখে এস না, বিপদে সাধুতাকে, ধৈর্য্যকে, ধর্ম্মকে, অক্রোধকে কি প্রকারে রক্ষা করিতে হয়, বুঝিবে! জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

শান্তিশীলা, দীপ্তির মাতার কথা শুনিয়া অবাক্ হইলেন। তিনি জানিতেন যে, দেবী প্রসন্নময়ী স্বয়ং অন্নপূর্ণা, আজ এই সকল কথা শুনিয়া তিনি ভক্তিতে আরো পূর্ণ হইলেন। দীপ্তির মা তাকে বিদায় করিলেন। মনের মধ্যে যেন ভক্তির সপ্তসিন্ধু উথলিত হইতেছিল, ভক্তি বিশ্বাসে হৃদয় পূর্ণ হইতেছিল। আর কোন দিন যে কাজ করেন নাই, আজ তাহাই করিতে উদ্যত হইলেন। তিন গুণের পুত্র লইয়া স্বামী যেখানে বসিয়া ছিলেন, ভক্তি-বিহ্বল চিত্তে সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। মুক্তকেশী, ভক্তি-বিহ্বলার সেই স্বর্গীয় মূর্ত্তি দেখিয়া, কি জানি কেন, তিন পুত্রের চিত্ত আর্দ্র হইল, স্বামীর দারুণ উষ্ণপ্রাণও যেন একটু শীতল হইল। এ যেন অসুরনাশিনী ভগবতী মূর্ত্তি।

শান্তিশীলা স্বামীর চরণ ধরিয়া সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ, ঢের হয়েছে, আর না। এখন ক্ষান্ত হও। তারা নাথ গাঙ্গুলী, ভেবে দেখ, তোমার কোনই অনিষ্ট করে নাই, পরের উপকার তাঁহার নিত্য ব্রত, ধর্ম্ম তাঁহার জীবনের সার, কেন তুমি তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছ? তাঁহার পত্নী দেবী প্রসন্নময়ী, সাক্ষাৎ ভগবতী। শুনিলাম, কাল রাত্রি হইতে তিনি জগদম্বার ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া মহাযোগে নিমগ্না আছেন। আমাকে লইয়া চল, সেই স্বর্গীয় দেবী মূর্ত্তি দেখিয়া দগ্ধ প্রাণকে জুড়াই!"

সত্যই কি প্রসন্নময়ী সমস্ত রাত্রি জগদম্বার ঘরে? তিন ভ্রাতার অন্তরেই এই প্রশ্ন একই সময়ে সমুদিত হইল। তবে তিনি মানবী নন্, নিশ্চয় দেবী। তিন পুত্রই এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "বাবা, অন্যায় কাজ ত ঢের করেছি, একবার চল যাই ধর্ম্মের মূর্ত্তি, পবিত্রতার মূর্ত্তি দেখে আসি।"

অসুরের হৃদয়ও একটু দ্রব হইয়াছে, বলিল, আচ্ছা, পাল্কী আনিতে বল, দেখে আসি, সত্যই কি হইতেছে? আদেশ করিয়া গেলেন, ক্ষণকাল সমস্ত অত্যাচার বন্ধ থাকুক।

শান্তিশীলা, হরিগোপাল, তিন পুত্র সহ দেবী প্রসন্নময়ীকে দেখিতে চলিলেন। ভাগবতী-সত্তা-সলিলে নিমগ্না হইয়া সেখানে পুণ্যবতী, নির্ব্বিকার-

চিন্তা, দেবী প্রসন্নময়ী অসুর-জয়ের মন্ত্র-পূত অস্ত্র ভিক্ষা করিতেছিলেন, সকলে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু পরিবর্ত্তন সম্ভব কি? বিধির লীলা, কে কি বলিতে পারে?

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দেব-গৃহে দেব-লীলা।

দেবী প্রসন্নময়ীর পূর্ব্ব দিনের আদেশানুসারে, শান্তিশীলা এক অপূর্ব্ব কাজের আয়োজন করিয়াছেন; তারানাথের বাড়ীর নিকটস্থ পুকুরের ধারে ছাউনি করিয়া যজ্ঞের রান্নার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। বৃহৎ আয়োজন,আজ অনাথ কেহ না ফিরিয়া যায়,লোকদিগকে সে সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। কাহার আদেশে, কাহার খরচে বৃহৎ যজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে, তাহা কাহাকেও বলিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। আদেশ এইরূপ, তারানাথের অন্ন-ছত্রের লোকেরা আজ এখানে অন্ন পাইবে। গরীবদের মা বাপ যিনি, গরীবদের জন্য তিনি ভাবেন না, তিনি করেন না, তবে ভাবে কে, করে কে?

দেবী প্রসন্নময়ী মা জগদম্বার ঘরে কি করিতেছেন? আঁখি নিমীলিত করিয়া মহামায়ার আরাধনা করিতেছেন। মহেশ্বরী, জগদীশ্বরী, মহালীলাময়ী হৃদয়েশ্বরী মায়ের সহিত সমস্ত রাত্রি আলাপ করিয়াছেন। মায়ের কথা শেষ হয় নাই বলিয়া এখনও উঠিতে পারিতেছেন না।

অবিশ্বাসীরা যাহাকে কল্পনা বলে, সাধন-রাজ্যে তাহা নিত্য সত্য। বেদ-বেদান্ত, গীতা-ভাগবত, কোরাণ-বাইবেল মানুষ লিখিয়াছে, না আপ্তবাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে? মানুষ কে যে স্বর্গের কথা কিছু লিখিবে? মহাত্মা কেশবচন্দ্র বলিতেন, "কোন্ দিন কি ডাইল খাইব, তাহাও আদেশে জানা যায়।" ঘটনাটী সকলেই প্রত্যক্ষ করেন, কিন্তু অবিশ্বাসীরা বলেন, মানুষই সকল করে। সাধক, ভক্ত, বিশ্বাসী দিবারাত্রি বিধাতার আদেশ শ্রবণ করেন; সেই আদেশে তাঁহারা তন্ময়; প্রত্যক্ষ-দর্শনে তাঁহারা সংসারের অতীত নিত্যধামে নিত্য বিহার করেন। ভাল কথা, মঙ্গলের কথা, যাহাতে জীবনের উন্নতি হয়, এমন উপদেশ প্রতিনিয়ত বিধাতা মানুষের নিকট প্রকাশ করিতেছেন। দেবাসুরের সংগ্রাম প্রতিনিয়ত মানুষের অন্তরে

চলিতেছে। বিধাতা বলিতেছেন, এইটা কর ; মানুষ বলিতেছে,এটা না, এইটা করি। দ্বৈত ইচ্ছার সংগ্রামে মানুষ প্রতিনিয়ত জর্জ্জরিত। সাধনবলে যাঁহাদের ইচ্ছা সংযত হইয়াছে, যাঁহাদের ইচ্ছার স্বতন্ত্রতা ঘুচিয়াছে, অথবা যাঁহারা বিধাতার ইচ্ছা-সাগরে নিজের ইচ্ছা বিসর্জ্জন দিয়া তন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা, বিবেক-কর্ণে, মধুর হইতেও মধুর স্বরে মধুর ভাগবতী ইচ্ছার সুর বাজিতেছে, শুনিতে পান। যদি ইহা অসম্ভব হইত, ধর্ম্ম জগতে থাকিত না। ধর্ম্মের জন্য, নরনারী, বিষয় বিভব সকল পরিত্যাগ করিয়া, গহন বন বা বৃক্ষ-তলকে আশ্রয় করিতেন না। ধর্ম্ম জীবন্ত সত্য, ধর্ম্ম নিত্য সত্য। যদি কিছু সত্য থাকে, তবে ধর্ম্মই সেই সত্য। কিন্তু এই সত্য-রাজ্যে তাহারা কখনও উপস্থিত হইতে পারিবে না, বিধাতার আদেশ, বা ইচ্ছার তন্ত্রী হৃদয়ে সদা বাজিতেছে, ইহা যাহারা শ্রবণে বঞ্চিত বা ইহা যাহারা অস্বীকার করে। তিনি প্রত্যক্ষ, নিত্য প্রত্যক্ষ, মানুষের বিবেক-কর্ণের নিকট। যে তাহা অস্বীকার করে, সে ধর্ম্ম বুঝিবে কি ?

দেবী প্রসন্নময়ী সৌভাগ্য ক্রমে মহা বিশ্বাসে অনুপ্রাণিতা। তিনি মায়ের কথা অন্তরে সর্ব্বদা শুনিতে পান। চিন্ময়ী মাকে ডাকিলেই তিনি কাছে পান। দেবী প্রসন্নময়ী সংসারের অতীত নিত্যানন্দ ধামে আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। জগদম্বার ঘরে মা আজ মহা আলাপ করিতেছেন।

সমস্ত রাত্রি মা অনন্যগতি হইয়া ভক্তি-বিহ্বলচিত্তে কেবল বিশ্বেশ্বরীকে ডাকিয়াছেন। গভীর যোগ ও গভীর ধ্যানে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছে। যখন উষাদেবী পূর্ব্বাকাশ রঞ্জিত করিয়া উদয়াচলে আরোহণ করিয়াছেন, যখন পাখী কুলায় বসিয়া মধুরডাক ডাকিতেছিল, এমন সময়ে, প্রাতঃকালের গগন কাঁপাইয়া দেবী "মা, মা, মা," বলিয়া ডাকিতেছিলেন। দেবীর শরীর রোমাঞ্চিত, পৃষ্ঠদেশ ছাইয়া কেশরাশি পড়িয়াছে, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, পরিধানে পট্টবস্ত্র। ডাকিতে ডাকিতে দেবীর নয়ন হইতে দর দর ধারে জল পড়িতেছিল। ভক্তিতে ও প্রেমেতে অবগাহন করায় দেবীর এক অপরূপমূর্ত্তি হইয়াছে। সমস্ত রজনীর তপস্যার পর ভক্তবৎসলা মা জগদম্বা হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া যেন আবির্ভূতা হইয়াছেন। দেবী প্রসন্নময়ীর মূর্ত্তি স্বর্গীয় শোভায় শোভান্বিত হইয়াছে। প্রসন্নময়ীর বদন প্রসন্ন, নয়ন বিভাসিত, তনু পুলকিত।

মাকে অন্তরে পাইয়া প্রসন্নময়ী প্রথম প্রশ্ন করিলেন "মা,আজ তোমার এ কি রঙ্গ দেখিতেছি ? তোমার কি ইচ্ছা এই যে, তোমার আশ্রিত ছেলে

মেয়েরা ভেসে যাইবে? মা, জগন্ময়ি, ভক্ত-বৎসলা, তোমার আজ এ কি রঙ্গ দেখিতেছি?"

দেবী প্রসন্নময়ী শুনিলেন, মা জগদম্বা যেন অন্তরে বলিতেছেন, দেবাসুর-সংগ্রামে কার জয় হয়, দেখিতে আমার একান্ত বাসনা। তোরা আমার নাম করিস্ বটে, কিন্তু আমি দেখিতে চাই, সংসারের সর্ব্বস্ব আমার জন্য ছাড়িতে পারিস্ কি না? ভালবাসা কি কথার কথা!

প্রসন্নময়ী।—তাত বুঝেছি,মাটী দিয়া এই পাপশরীর কেন গঠন করিলে? রিপু দিয়া কেন মজাইলে?

জগদম্বা।—সকলই বিধান। যাহা দিয়াছি, সবই ঠিক হইয়াছে, রিপু থাকিবে, অথচ রিপুর অতীত হইবে, তবে ধর্ম্ম আসিবে। সংসারে আসক্তি-হীন হইতে হইবে, তবে ধর্ম্ম পাইবে। ধর্ম্ম কি সোজা জিনিস?

প্রসন্নময়ী।—আমাদের কি সাধ্য যে আমরা রিপু ভুলিতে পারিব? আমরা অহঙ্কার, আত্মাভিমানে স্ফীত, একটু হইলেই ক্রোধে অস্থির হই, আমাদের তবে উপায় কি?

জগদম্বা।—ধর্ম্মের উপায় ধর্ম্মই, কদাপি পাপ নহে। ধর্ম্ম পাইতে হইলে নিত্য ধর্ম্মাচরণই করিতে হইবে, সংসার থাকুক, আর যাউক।

প্রসন্নময়ী।—সে কিরূপ কথা?

জগদম্বা।—এক জন তোমার অনিষ্ট করিলে, তুমি কদাপি তাহার অনিষ্ট করিতে পারিবে না। অনিষ্ট চিন্তাকেও মনে স্থান দিতে পারিবে না। অনিষ্টের চিন্তাও যদি মনে উদয় না হয়, তবে বুঝিবে যে, এই স্থলে তুমি সিদ্ধ হইয়াছ। মনে কর, একজন বলপূর্ব্বক তোমার স্বামীকে নদীতে নিক্ষেপ করিল। তুমি নিকটে আছ। যদি দেখ যে, এই ঘটনা দেখিয়াও তোমার মন নির্ব্বিকার, অর্থাৎ আতাতয়ীর প্রতি তোমার কোন প্রকারই ক্রোধের উদয় হইতেছে না, তবে বুঝিবে যে, তুমি সিদ্ধ হইয়াছ। এইরূপে সকল ইন্দ্রিয়কে সংযত ও আয়ত্বাধীন করিতে হইবে। পাপকার্য্য করা দূরের কথা, পাপচিন্তাও যখন অসম্ভব হইবে, তখন ধর্ম্ম পাইবে।

প্রসন্নময়ী।—ক্রোধ, হিংসা, কাম—এ সকলের কোন প্রয়োজন নাই?

জগদম্বা।—ধর্ম্মার্থীর পক্ষে মোটেই নাই। এ সকলের অতীত হইলে তবে ধর্ম্মলাভ হয়।

প্রসন্নময়ী।—তা কি এই জগতে সম্ভব?

জগদম্বা।—অসম্ভব কিসে বুঝিলে ?

প্রসন্নময়ী।—অত্যাচারীর অত্যাচারে দেশ তবে ছারখারে যাইবে ?

জগদম্বা।—যায় যাউক, যাঁর বিশ্ব, তিনি যদি না রাখেন, তুমি কি করিতে পার, তুমি ত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র।

প্রসন্নময়ী।—তবে এ সকল রিপু কেন দিলে ?

জগদম্বা।—ধর্ম্ম অর্জ্জিত হইলে, তারপর এ সকলের প্রয়োজন বুঝিবে। মানুষ যখন ধর্ম্মগত জীবন লাভ করে, যশ নিন্দার অতীত হয়, যখন তন্ময় জ্ঞান জন্মে, তখন ধর্ম্ম সংরক্ষণের জন্য এ সকলের প্রয়োজন আছে। কিন্তু ধর্ম্মার্থী সংসারীর পক্ষে নহে।

প্রসন্নময়ী।—ধর্ম্মার্থী সংসারীর পক্ষে রিপু দমনই বিধি ?

জগদম্বা।—রিপুদমনই বিধি।

প্রসন্নময়ী।—লোকের নিকট হাস্যাস্পদ ও অপমানিত হওয়াই কি ধর্ম্মের রাজ্যে যাওয়ার প্রথম সোপান ?

জগদম্বা।—হাঁ, তাহাই।

প্রসন্নময়ী।—লোকের সকল প্রকার অত্যাচার, উৎপীড়ন সহ্য করিয়া নীরবে থাকাই কি ধর্ম্মের প্রথম সোপান ?

জগদম্বা।—হাঁ, তাহাই।

প্রসন্নময়ী।—আমাদের পক্ষে আজ কর্ত্তব্য কি ? এই বিপদের দিনে কি করিব ?

জগদম্বা।—ধর্ম্মাচরণ কর, আর করিবে কি ? পাপ-দমনের জন্য পাপ কার্য্যানুষ্ঠানের কোনই প্রয়োজন নাই। অসাধুতা বিনাশ করিবার জন্য সাধুতাকে পরিহার করিলে অধর্ম্ম হইবে। সত্যকে অবলম্বন করিয়াই সত্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, কদাপি মিথ্যা অবলম্বন করিতে পারিবে না।

প্রসন্নময়ী।—আজ যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সকলই ত তুমি জান। আজ পুণ্যপ্রভাকে কে রক্ষা করিবে ? আমার স্বামীকে কে রক্ষা করিবে ?

জগদম্বা।—ধর্ম্মকে তাহারা আশ্রয় করিয়া থাকে, ধর্ম্মই তাহাদিগকে রক্ষা করিবে। তোমার ভাবনা কি ? সে চিন্তা তোমার অপেক্ষা আমার বেশী।

প্রসন্নময়ী।—আজ তাহারা ঘোর পরীক্ষার মধ্যে পড়িয়াছে।

জগদম্বা।—তাত সত্যই। এ সংসারে প্রতিদিনই পরীক্ষা। কোন্ সময় এমন আছে, বলত, যখন পরীক্ষা নাই। দেবাসুরের সংগ্রাম প্রতিনিয়ত

চলিতেছে। পরীক্ষা আসিলেই ধার্ম্মিক চেনা যায়। মানুষ ধর্ম্ম চায় কি সংসার চায়, জানা যায়। যে ধর্ম্ম চায়, সংসারে তার মান প্রতিপত্তি যায়, ক্ষতি কি? প্রকৃত ধার্ম্মিক সংসার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত, নিরপেক্ষ। বাড়ী যায়, আর এক বাড়ী পাইবে, মান যায়, স্বর্গে সম্মান পাইবে। ভক্তির তুল্য জিনিস কি আর আছে? সংসারের জন্য কেন চিন্তিত হও, তোমার স্বামী, তোমার কন্যা নির্ব্বিকার-চিত্ত, কোন ভয় নাই; ধর্ম্মই তাহাদিগকে সকল বিপদে রক্ষা করিবে।

প্রসন্নময়ী।—আমি কি করিব?

জগদম্বা।—দিবারাত্রি পরসেবা কর। নির্ব্বিকার-চিত্ত হইয়া ধর্ম্মাচরণ কর। কামনা-বর্জ্জিতা হইয়া ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্মাচরণ কর। দিবা রাত্রি সকলের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা কর। যাহারা তোমার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত, প্রাণপণে তাহাদের কল্যাণ সাধন কর। যাহারা তোমার প্রতি বিরক্ত, দিবা রাত্রি তুমি তাহাদের অনুরাগী হও। দিবা রাত্রি প্রেম সাধন কর। সংসারের ধর্ম্মই প্রেম। সংসারের মুক্তিই প্রেম। সংসারের একমাত্র সুখের বস্তু প্রেম। হৃদয় ঢাল, মন ঢাল, শরীর ঢাল—বল ঢাল, বুদ্ধি ঢাল—সর্ব্বস্ব অকাতরে অন্যের জন্য ঢালিয়া দেও। ঐ মুক্ত বায়ু যেমন দিবা রাত্রি বহিয়া পরের হিত করিতেছে, অথচ জানে না পরের হিত কি, তুমিও সেই-রূপ কর। অহঙ্কারী হইবে না, তুমি পরের উপকার করিতেছ, মনেও স্থান দিবে না; উপকার করাই তোমার স্বভাব হউক। না করিয়া থাকিতে পার না, তাই কর্ত্তব্য কর, তোমার মনের এইরূপ ভাব হউক। কামনা-বর্জ্জিতা যোগিনী হও। তবেই বুঝিবে, ধর্ম্ম কি; আজ বিশেষ পরীক্ষার দিন, অন্তর পরীক্ষা কর, কোন শত্রুর প্রতি অহিতানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা হইতেছে কি না, দেখ।

প্রসন্নময়ী।—আমি সে সকল ত বুঝি না। তুমিই বুঝ, আমার অন্তর কিরূপ?

জগদম্বা।—বুঝিয়াছি বলিয়াই বলিতেছি, ধর্ম্ম লাভ তোমার পক্ষে অসাধ্য ব্যাপার নয়। আমি সত্যই বলিতেছি,অক্রোধের দ্বারা ক্রোধ,সাধুতার দ্বারা অসাধুতা এবং সত্যের দ্বারা অসত্য পরাজিত হইবে। আমি সত্যই বলিতেছি,তোমার দ্বারা অসাধ্য সাধিত হইবে। বেলা হইল,এখন তুমি কর্ত্তব্যে মন দেও। তোমার দিকে চাহিয়া অনেক গরীব অপেক্ষা করিতেছে, যাও কর্ত্তব্য করগে।

প্রসন্নময়ী।—আজ ভাণ্ডার শূন্য,তুমি জান, আজ গরীব রক্ষার উপায় কি ?

জগদম্বা।—যাঁর যে চিন্তা তিনি করিতেছেন, তুমি সেবা করিতে যাও। নির্ভরশীলা হও, ভয় কি ?

যখন দেবী প্রসন্নময়ীর সহিত জগদম্বার এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, তখন হরিগোপাল তিন পুত্র ও স্ত্রীসহ জগদম্বার মন্দিরে পৌঁছিলেন। মন্দির বলিলে পাঠক ইষ্টক-নির্ম্মিত মন্দির বুঝিবেন না। দেব-মন্দির—চৌচালা ঘর। দরমার বেড়া। বেড়ার ফাঁক দিয়া সকলে দেবী প্রসন্নময়ীর সে অপরূপ মূর্ত্তি দেখিলেন। দেখিলেন, প্রসন্নময়ী শূন্য ঘর পূর্ণ করিয়া জগদম্বার সহিত কথা বলিতেছেন। সে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য। জগদম্বা কি বলিতেছেন, কেহই শুনিতেছেন না। শুনা সম্ভব নয়। দেবাদেশ অন্তরে প্রতিভাত হয়, কর্ণে শ্রবণ করা যায় না। জগদম্বা চিন্ময়রূপে অন্তরে কথা বলিতেছিলেন। অন্য কেহই তাহা শুনিতে পান নাই। তবে তাঁহারা বুঝিলেন, উত্তর পাইয়াই দেবী প্রসন্নময়ী প্রতি উত্তর করিতেছেন। কেবল প্রশ্নগুলি শ্রবণ করিয়াই পাঁচজন মোহিত হইলেন, আত্মহারা হইলেন। ধর্ম্মটা এখনও যে জীবন্ত, সকলেই বুঝিতে পারিলেন। সাষ্টাঙ্গে সকলে মন্দিরে প্রণাম করিলেন।

এদিকে জগদম্বার শেষ আদেশ পাইয়া দেবী প্রসন্নময়ী মন্দিরের দ্বার খুলিলেন। পূজারী ব্রাহ্মণ পূজার ফুল বিল্বপত্র প্রভৃতি লইয়া বারাণ্ডায় অপেক্ষা করিতেছিল এবং দেবী প্রসন্নময়ীর কথা শুনিতেছিল। দেবী মন্দিরে প্রবেশ করিলে কেহই তাঁহাকে বিরক্ত করিত না। অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, দেবী মায়ের প্রিয়-পাত্রী। মন্দিরের দ্বার খুলিলে পূজারী ব্রাহ্মণ দেবী প্রসন্নময়ীর সে স্বর্গীয় মূর্ত্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। দেবীর আর পূর্ব্বের মূর্ত্তি নাই, সব যেন রূপান্তরিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। হরিগোপাল, শান্তিশীলা তিন পুত্র সহ লজ্জাশরম বিসর্জ্জন দিয়া আজ প্রকাশ্যে জগদম্বার মন্দিরের বারাণ্ডায় দেবী প্রসন্নময়ীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। মন্দিরের দ্বার খুলিয়া প্রসন্নময়ী বহির্গত হইয়াছেন শুনিয়া পাড়ার সকলে ছুটিয়া আসিল, অনেকের বিশ্বাস ছিল, দেবীর মনস্কামনা পূর্ণ হইলে দেবী বাহিরে আসিবেন। সকলে আসিয়া এক আশ্চর্য্য মূর্ত্তি দেখিয়া মোহিত হইয়া গেল, কাহারও মুখে কথা নাই, যে দেখে, সেই নীরবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। বেলা তখন দুই প্রহর অতীত হইয়াছে,প্রখর রৌদ্রের তাপে মৃত্তিকা উত্তপ্ত,কিন্তু তবুও দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। জন-সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। ক্ষুধা-

কাতর যে সকল কাঙ্গাল দরিদ্র আসিয়াছিল, গাঙ্গুলী বাড়ীর নিরানন্দ ভাব দেখিয়া সে সকলেই অশ্রু বিসর্জ্জন ও হায় হায় করিতেছিল। দেবী প্রসন্নময়ী, কাঙ্গালের মা, মন্দিরের বাহির হইয়াছেন শুনিয়া ক্ষুধা-কাতর রৌদ্র-দগ্ধ শত শত কঙ্কালময় নরনারী ছুটিয়া আসিয়া দেবীর চরণে প্রণাম করিতে লাগিল। এ এক অপরূপ দৃশ্য, বর্ণনা করি, আমার সে সাধ্য নাই। লিখিতে লিখিতে আমার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে, শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছে, লেখনী থামিয়া যাইতেছে। চতুর্দ্দিকের লোক ছুটিয়া ছুটিয়া আসিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইল, দেবী প্রসন্নময়ী সিদ্ধা হইয়া বাহির হইয়াছেন, হরিগোপাল সপরিবারে সপুত্রে দেবীর শরণাপন্ন হইয়াছেন। তখন যে সকল লোকদিগের প্রতি অত্যাচার হইতেছিল, তাহারা বন্ধন-মুক্ত হইয়াছে, তাহারাও ছুটিয়া আসিতে লাগিল, দল-বেদল, সপক্ষ-বিপক্ষ সব মিলিয়া একাকার। সরলার দাদা বন্ধন-মুক্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া জনতা দেখিয়া আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিল। অনেকের চক্ষেই জলধারা বহিতেছিল। দেবীর স্বর্গীয় মূর্ত্তি দেখিয়া পাষাণও গলিয়া গিয়াছে। সরলার দাদা আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল এবং ভক্তির সহিত দেবীর পদধূলি মস্তকে লইল এবং তারপর উচ্চৈস্বরে বলিল—"মা জগদম্বার জয়, দেবী প্রসন্নময়ীর জয়।" সেই স্বরে ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ, সমবেত সকলে মিলিয়া আকাশ কাঁপাইয়া উচ্চৈস্বরে বলিল "মা জগদম্বার জয়, দেবী প্রসন্নময়ীর জয়"। সে অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া দেবী প্রসন্নময়ীর প্রাণ বিহ্বল, তিনি স্পন্দহীন, অবিরল ধারায় তাঁহার চক্ষু দিয়া ভক্তির উৎস পড়িতেছে। এই ঘোর জনতার মধ্যে হরিগোপাল—আবার সাষ্টাঙ্গে দেবী প্রসন্নময়ীর চরণে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন "মা, আমার ন্যায় নরাধম পাপী ও অপরাধী এ জগতে আর নাই, আমি সোণার সংসারকে জ্বালাইয়াছি; আমাকে উদ্ধার করিয়া, চরণে স্থান দিয়া রক্ষা করুন।"

পাপী উদ্ধারের পুণ্যভূমিতে যত নরনারী সমবেত, আজ অলৌকিক পুণ্য প্রভাব দেখিয়া সে সকলেই অবাক্। ধর্ম্ম আজ জীবন্ত হইয়াছে। ক্রোধ,হিংসা, বিদ্বেষ, অসাধুতা সব পলায়ন করিয়াছে। দেবী প্রসন্নময়ী হরিগোপালের মস্তকে হাত রাখিয়া বলিলেন—"বাবা, তুমি ত কোন অপরাধ কর নাই।"

দেবী প্রসন্নময়ী হরিগোপাল অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়। আবার বলিলেন—"বাবা, আমি কি জানি, কি বুঝি, জগদম্বার চরণে আশ্রয় লও, সকল অপরাধ তিনি মার্জ্জনা করিবেন। আমি নিজে পাপী অপরাধী, তোমাদের

নিকট কত অপরাধ করেছি, কত কর্কশ কথা বলেছি, কত তিরস্কার করেছি। আজ আমাকে তোমরা ক্ষমা কর।"

শান্তিশীলা দেবীর চরণে তিন পুত্রকে সমর্পণ করিয়া বলিলেন—"আমি ইহাদিগকে আপনার চরণে অর্পণ করিলাম,আজ পুণ্যজলে ধৌত করিয়া পুণ্য-পাদোদক পান করাইয়া আপনি ইহাদিগকে উদ্ধার করিয়া লউন। আজ মহা শক্তি সঞ্চারিত হউক, আমরা সকলে উদ্ধার হয়ে যাই।''

দেবী প্রসন্নময়ী সকলের মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাঁহার নয়নের প্রবাহিত বারিধারা তাহাদের মস্তকে পতিত হইল। সেই পুণ্যময় ভক্তির বারিতে সকলের জীবন যেন সুশীতল হইল।

শান্তিশীলার ইঙ্গিতে সেইখানেই দরিদ্রদিগের আহারের আয়োজন হইতে লাগিল। দেবী প্রসন্নময়ী সে দৃশ্য দেখিয়া অবাক্ হইলেন। তিনি তখন ভক্তিতে বিভোর হইয়া বলিতে লাগিলেন—

"ভক্তবৎসলা মা জগদম্বা, তোমার নামের জয় হউক্, তুমি আজ এ কি লীলা দেখাচ্ছ ? মানুষ বলে আমি করি, আমি করি ; আমি প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছি, মানুষ কিছুই নয়, সকলই তুমি কর্‌ছ। দিবা নিশি তোমার জগতের জন্য তুমিই খাট্‌ছ। আজ তোমার পুণ্যময় নামের জয়, ধর্ম্মের জয় দেখিয়া আমরা করযোড়ে সকলে তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি,তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন প্রত্যহ তোমার জীবন্ত সত্তা এইরূপ উপলব্ধি করিয়া তোমার সেবা করিতে পারি, আশীর্ব্বাদ কর, তোমার সকল নরনারী যেন তোমার সৎ পুত্র কন্যা হইয়া, তোমার বিশ্বাসী হইয়া, তোমার নামের মহিমা কীর্ত্তন করিতে পারে। জয় মা আনন্দময়ী, বিশ্ব-বিমোহিনী, বিশ্বরূপিনী, ভক্ত-বৎসলা মা জগদম্বা।'' এই কথা বলিয়া পূজারী ঠাকুরের পাত্রে যে জল ছিল, তাহা হাতে লইয়া চতুর্দ্দিকে বর্ষণ করিলেন। ভাবে পূর্ণ হইয়া সকলে উচ্চৈ-স্বরে বলিতে লাগিল, "জয় মা আনন্দময়ী ভক্তবৎসলা জগদম্বা।"

ইত্যবসরে রাশিকৃত অন্নব্যঞ্জনাদি দেবী প্রসন্নময়ীর সম্মুখে আনীত হইয়াছিল, প্রাঙ্গণে, বাগানে, আটচালায়, অতিথিশালায়, নদীর পারে, স্কুল ঘরে ; সর্ব্বত্র ক্ষুদিত নরনারী বসিয়া গিয়াছে দেখিয়া তিনি স্বহস্তে অন্ন লইয়া সকলকে পরি-বেশন করিতে লাগিলেন। অনেকে সাহার্য্য করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, খ্রীষ্টান মুসলমান সকলে এক পংক্তিতে বসিয়া গিয়াছে। যেন পুরুষোত্তমের প্রসাদ ভক্ষণ, যেন শ্রীগৌরাঙ্গের মহোৎসবের প্রসাদ গ্রহণ। অন্নপূর্ণা রূপিণী

দেবী প্রসন্নময়ী পরিবেশন করিতে লাগিলেন। যাহারা প্রসাদ পাইল,তাহারাও ধন্য হইল, যাহারা দেখিল, তাহারাও কৃতার্থ হইল। সকলের অবিশ্বাস আজ দূর হইল।

বিশ্বাস ভক্তির জীবন্ত নিশান আজ বিধিকৃষ্ণপুরে উড্ডীন হইল। সকলের আহার সমাপ্ত হইলে,দেবী প্রসন্নময়ী সর্ব্বাগ্রে দীপ্তিকে দেখিতে গমন করিলেন। আর আর নরনারীর কতক দেবী প্রসন্নময়ীর সহিত চলিল, কতক সেখানে রহিল, আর কতক স্ব স্ব স্থানে গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

যুগলরূপ।

সব কথা লিখিতে পারি, কিন্তু দীপ্তির কথা মনে হইলেই মাথা ঘুরিতে থাকে। কতদিন দীপ্তির কথা ভাবিয়া মাথা-বেদনায় কষ্ট পাইয়াছি, আজ লিখিতে বসিয়াছি, আজ এখনই মাথা ঘুরিতেছে। মাথা ঘুরিতেছে—কি ছাই লিখিব? মানুষের সব যায়, সব সয়; ধর্ম্ম গেলে থাকে কি? হতভাগ্য পামরেরা দীপ্তির দেব-বাঞ্ছিত চিরোজ্জ্বল চরিত্র-রত্ন অপহরণ করিয়াছে। দীপ্তি গভীর কলঙ্কে আজ মলিন, লিখিব কি ছাই?

দীপ্তির আজ কান্তি নাই, এত রক্তপাত হইয়াছে যে, উজ্জ্বল বর্ণ বিবর্ণ হইয়াছে, হরিণ-নয়নার দেব আঁখি আজ রক্তের ন্যায় লাল, তাহাও নিমী-লিত; বেলা হেলিয়া পড়িয়াছে, তবুও চৈতন্য নাই। তিন সখী আহার নিদ্রা ভুলিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন। দীপ্তির মাতা জমীদার বাড়ী হইতে আসিয়া দীপ্তির শিয়রে বসিয়াছেন। রক্তমাখা দেহ, রক্তমাখা বস্ত্র, রক্তমাখা শ্যাম-কেশরাশি—রক্তমাখা সমুদয়। দীপ্তির পিতা এখনও ফিরেন নাই; আর পুলিস? আর ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের অল্প বেতনভুক্ত অসীম-ক্ষমতাধারী পুলিস্? গবর্ণমেণ্টের সুশাসনের বিজয় নিশান উড়াইয়া সুখ-শয্যায় শয়ন করিয়া, টানাপাখার বাতাস খাইতেছে, দরবার পায় কে? গবর্ণমেণ্টের সুশাসনে পুষ্প চন্দন বর্ষিত হউক!!

দেবী প্রসন্নময়ী আস্তে আস্তে ঘরে প্রবেশ করিলেন। দেবীকে দেখিয়া দীপ্তির মাতার সজল নয়ন হইতে ধারাবাহী হইয়া জল নির্গত হইতে লাগিল,তিনি আর আত্ম-সম্বরণ করিতে পারিলেন না,চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

হঠাৎ ক্রন্দন ধ্বনিতে দীপ্তি চমকিয়া উঠিলেন, একবার নয়ন মেলিতে চেষ্টা করিলেন, চেষ্টা বিফল হইল, অতি কষ্টে বলিলেন—"জল।"

দীপ্তির এহেন অবস্থা দেখিয়া প্রসন্নময়ীর প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল, মানুষের দেহে আর ধৈর্য্য থাকে না, তিনি দীপ্তির মুহুর্মুহুঃ মোহ হইলে বিপদ আরো নিকটবর্ত্তী হইবে ভাবিয়া, অতি কষ্টে আত্ম মনের শোকোচ্ছ্বাসের বেগ সংবরণ করিলেন এবং দীপ্তির মাতাকে ক্রন্দন করিতে নিষেধ করিলেন। দীপ্তির মাতা দীপ্তির মুখে জল দিয়া বলিলেন—"মা দীপ্তি, কে আসিয়াছেন, বুঝিতেছ কি? তোমার মা আসিয়াছেন।"

দীপ্তি কিছুই বলিলেন না, যেমন ছিলেন, তেমনই রহিলেন। গভীর অচেতন অবস্থা।

লীলা, সরলা ও তিলোত্তমার মুখের দিকে আর চাওয়া যায় না—৭ বৎসরের রোগে যাহা না হয়, ১৮৷২০ ঘণ্টায় ইহাদের শরীরের তাহা হইয়াছে—জীর্ণ শীর্ণ মলিন, মুখে কাহারও কথাটী নাই;—সকলে প্রাণপণে খাটিতেছেন, কিন্তু মুখে একটী কথা নাই। মৃত শরীর কখানা যেন নড়িতেছে, চলিতেছে—অথবা যেন পুতুল-নাচের কাষ্ঠ-নির্ম্মিত কখানা দেহ, কাহারও চেষ্টায়, কাহারও উত্তেজনায় যেন খাটিতেছে। সে উত্তেজনা স্বর্গীয় ভালবাসার।

বেলা যায়,—যায় যায় হইয়াছে। তবুও পুলিসের লোক আসিল না। বৈকালে হরিগোপাল ডাক্তার লইয়া আসিলেন। আজ এ বেলা বিধিকৃষ্ণপুরের সকলই রূপান্তরিত হইয়াছে, দীপ্তির ঘরে যাওয়ার সময় কেহ নিষেধ করিল না। যে যে ভাবে ছিল, সে সেই ভাবেই রহিল। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া, দীপ্তির শরীরাদি পরিষ্কার করিয়া ঔষধাদি দিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখ প্রফুল্ল নহে। কিছু করিতে হয়, তাই যেন করিতেছেন। ভাবে বুঝা যাইতেছে, দীপ্তির অবস্থা ভাল নহে। ঔষধ পথ্য অনেক ঘরে আসিয়া পৌছিল—অনেক টাকাও দীপ্তির বিছানার নিকট রহিল। দীপ্তির মাতাও কোন কথা বলিলেন না, দেবী প্রসন্নময়ীও নহে। ডাক্তার যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "মাথায় গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে, ঠাণ্ডা জলই এ অবস্থায় ভাল ব্যবস্থা, বরফ পাইলে আরো ভাল হইত। আমি আবার রাত্রে আসিয়া দেখিয়া যাইব।" হরিগোপাল ও ডাক্তার যখন গৃহ পরিত্যাগ করিলেন, তখনও কেহ কোন কথা বলিল না। আবাহন বা বিসর্জ্জন নাই—আদর বা ভৎর্সনা নাই। কলের পুতুলের ন্যায় দুই প্রাণী আসিয়া কিছু কর্ত্তব্য করিয়া চলিয়া গেল।

উভয়ে চলিয়া গেলে, দীপ্তির মাতা প্রসন্নময়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন; ডাক্তারের ঔষধ দেওয়া কর্ত্তার নিষেধ, ঔষধ দেওয়া ভাল হইল কি? প্রসন্নময়ী আস্তে আস্তে বলিলেন, "এখন ঔষধ কেবল জগদম্বার কৃপা। তিনিই কৃপা করিয়া ডাক্তার পাঠাইয়াছেন, আমরা ত ডাক্তার ডাকি নাই। তাঁহার কৃপাকে বাধা দেওয়া অকর্ত্তব্য। যে ভাবে সম্ভব, তাঁর কৃপা বর্ষিত হউক।"

দীপ্তির রোগ-শয্যার নিকট ইঁহারা থাকুন, আমরা ইত্যবসরে আর আর কথাগুলি বলিয়া যাই। দুই দিনের ঘটনা এত লিখিয়াও শেষ করা যাইতেছে না। সংক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু চেষ্টা সফল হইতেছে না। দুই দিনের ঘটনায় একটা মোকদ্দমার প্রকাণ্ড নজীর হয়, দুই দিনের ঘটনায় একখণ্ড ইতিহাস পূর্ণ হয়—দুই দিনে কেহ বা রাজা হয়, কেহ বা ফকীর হয়। কত মুহূর্ত্তময় দুই দিন কি সামান্য?

গ্রামের ঘটনা মুহূর্ত্তের মধ্যে দেশব্যাপী হইয়া থাকে। হাটে বাজারে লোক বহুদূর দূরান্তর হইতে সমাগত হইয়া থাকে। অনেক পল্লীগ্রামে ৮।১০ মাইল অন্তর, কোথাও বা ১২।১৫ মাইল অন্তর একটা ভাল বাজার বা হাট মিলে। ফরিদপুর একটা সামান্য দেশ—ভাল হাট, ভাল বাজার দূরে দূরে। বিধিকৃষ্ণপুরের বাজারটা খুব বড়, বহুদূরের লোক এই বাজারে আসিয়া থাকে। পূর্ব্ব বাঙ্গলার হাট বাজারগুলি পূজার পূর্ব্বে অপরূপ শ্রী-ধারণ করে। যেন পাহাড়িয়া নদী—বৎসরের ৫।৬ মাস শুষ্ক বালুকারাশি বক্ষে ধরিয়া কাটাইতেছে, বর্ষা আসিলে তাহার প্রকোপ বা দর্প দেখে কে? পূর্ব্ব বাঙ্গলার হাট বাজারগুলি সমস্ত বৎসর ভাঙ্গা হাঁড়ির অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা সকল বুকে করিয়া কাটাইতেছে, পূজার পূর্ব্বে তাহার শ্রী দেখে কে? দেশ-দেশান্তর হইতে দ্রব্যাদির আমদানি হইতেছে—দেশ-দেশান্তর হইতে লোকজন আসিয়া সব শূন্য স্থান পূর্ণ করিতেছে। সাধারণতঃ বর্ষাকালে ফরিদপুরের হাট বাজারগুলি অনেকটা শ্রী ধারণ করে, তায় আবার পূজা নিকটে, আজকাল ছোট ছোট হাট বাজারগুলিও বড় হইয়া উঠিয়াছে। নৌকায় নৌকায় অর্দ্ধেক হাট বসিয়া যায়। বাজার যদি দুই প্রহরে ভাঙ্গে, অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত নৌকার চলাচল্‌তি থাকে। সন্ধ্যায় যদি হাট ভাঙ্গে, রাত্রি দুপ্রহর পর্য্যন্ত নদী, খাল, বিল নৌকা চলাচল্‌তিতে তরঙ্গায়িত হইতে থাকে। কোন একটা সংবাদ হাটে বা বাজারে ফেলিয়া দেও, দুই প্রহরের মধ্যে ডিঙ্গিতে চড়িয়া, মানুষের মুখের ঢেউয়ে ঢেউয়ে তাহা দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।

কল্যকার রাত্রের সংবাদ মাদারিপুরের আট আনা গ্রামে এবং ফরিদপুরের অন্যান্য বহুস্থানে পৌছিয়াছে। কথাটা চাপা রাখিবার জন্য বিধিপূর্ব্বক জোর-জুলুম হইয়াছে, কিন্তু তাহা থাকে নাই। কথাটা মুখে মুখে চতুর্দ্দিক ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কোন পাড়ায় আজ আর অন্য কথা নাই। এরূপ ঘটনা দেশে সদা-সর্ব্বদা ঘটে না—যে শুনিতেছে, প্রায় সকলেই অবাক্ হইয়া যাইতেছে, এবং হরিগোপাল ও কালিকান্তের বাপের শ্রাদ্ধ করিতেছে। সর্ব্বত্রই সকলের পরিপোষক লোক পাওয়া যায়, আজও দুই দলে ভাল মন্দ বিচার হইতেছে বটে, কিন্তু আজ যেন সহানুভূতিটা তারানাথের দিকে অধিক ঝুঁকিয়াছে। তারানাথের যে কিছু কিছু নিন্দা হইতেছে না, তাহা নয়; হইলেও তাহা অল্প। শ্রাদ্ধের ঘটা আজ হরিগোপাল ও কালিকান্তের পিতৃ মাতৃ কুলের। উভয়ের নামে ও কুলে আজ অজস্রধারে কুবাক্য, তিরস্কার ও ভৎর্সনা বর্ষিত হইতেছে।

তারানাথের ইষ্ট কুটুম্বদিগের মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—তাঁহাদের ঘরে আজ কান্নাকাটির রোল উঠিয়াছে। কেহ কেহ ডিঙ্গি করিয়া বিধি-কৃষ্ণপুর রওয়ানা হইয়াছেন। কিন্তু পুলিস যে "তিমিরে, সেই তিমিরেই" আছেন। জাগিয়া যে ঘুমায়, কে তাহাকে জাগাইতে পারে?

প্রেমাঙ্কুর বাবু দুর্ভিক্ষের কেন্দ্রে চাউল বস্ত্র বিতরণ করিতেছেন, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত দরিদ্রের সেবা করিতেছেন। দরিদ্রদের বাড়ী বাড়ী দেখিয়া বেড়াইতেছেন ও যেখানে যেখানে প্রয়োজন হইতেছে, সাহায্য প্রদান করিতেছেন। তাঁহার নিকট পর্য্যন্ত কথাটা পৌছিয়াছে। তিনি শুনিয়া দুঃখে ও বিষাদে অধীর হইয়াছেন। প্রশান্ত মেঘনায় তরঙ্গ উঠিয়াছে। দেশে এত অত্যাচার আজও আছে, ভাবিয়া তিনি আত্মহারা হইয়াছেন। এত সভ্যতা, এত আন্দোলন, এত শিক্ষা বিস্তার—আজও দেশের এই অবস্থা! ইহা ভাবিতেছেন, আর বিষাদে, নৈরাশ্যে তাঁহার দুনয়ন হইতে জল পড়িতেছে। প্রেম যাহার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, সে ব্যক্তি পরদুঃখশ্রবণে কখনও ঠিক থাকিতে পারে না। নরনারীর দুঃখ দূর করা যাঁহার জীবনের ব্রত, তিনি এত অত্যাচারের কথা শুনিয়া, উপেক্ষার চক্ষে সমস্ত দেখিয়া নিশ্চিন্ত মনে সুখে নিদ্রা যাইতে পারেন না। ঘটনা শুনিয়াই প্রেমাঙ্কুর বিধিকৃষ্ণপুর অভিমুখে তাঁহার ডিঙ্গি ভাসাইয়াছেন। প্রেমের ডিঙ্গি অপরাহ্নে বিধিকৃষ্ণপুর পৌছিয়াছে। যে ঘাটে আর এক দিন

তাঁহার ডিঙ্গি লাগিয়াছিল, আজও সেই ঘাট, কিন্তু আজ সে ঘাট, অন্য রূপ। উৎসুক চিত্তে পুলিসের নৌকা প্রতীক্ষা করিয়া কয়েক জন লোক ঘাটে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সরলার দাদাও তাহার মধ্যে আছে। নৌকা ঘাটে লাগিলেই সরলার দাদা জিজ্ঞাসা করিল—"কোথাকার নৌকা ?"

ডিঙ্গির মাঝী বলিল—"এই দেশের নৌকা।"

সরলার দাদা বলিল, এই নৌকায় কি পুলিসের লোক আছে ?

মাঝী বলিল, "না—এ নৌকায় প্রেমাঙ্কুর বাবু আছেন।"

প্রেমাঙ্কুর বাবুর নাম সরলার দাদা সেদিনও সরলার নিকট শুনিয়াছে। সে পূর্ব্বেও প্রেমাঙ্কুরের নাম জানিত। তারানাথের পক্ষীয় লোক প্রেমাঙ্কুর বাবুর গোড়া ভক্ত। অনেকের এইরূপ বিশ্বাস যে,তারানাথের "মন্ত্রদাতা" প্রেমাঙ্কুর। অনেকে বলিত, "প্রেমাঙ্কুর বাবুর আদর্শেই তারানাথের জীবন পরিচালিত !" সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন ; আমরা ইহা জানি, এবার প্রেমাঙ্কুর বাবুর নাম দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত অনেকেই জানিয়াছে। প্রেমাঙ্কুর বাবু আজ এই বিপদের দিনে বিধিকৃষ্ণপুরে আসিয়াছেন, ইহা তারানাথের পক্ষীয় লোকদের পরম সৌভাগ্যের কথা। কাহার পক্ষেই বা নয় ? হিতৈষী বন্ধু গৃহে আসিলে কাহার না আনন্দ হয় ? ঘাটে দণ্ডায়মান সকলেরই আনন্দ হইয়াছে, সরলার দাদার হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না। বিপদের সময়ে আত্মীয়কে দেখিলে প্রাণটা উথলিয়া উঠে, দুঃখ যেন আরো বৃদ্ধি হয়। সরলার দাদা "প্রেমাঙ্কুর" বাবুর নাম শুনিয়া ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিল না। কাঁদিয়া বলিল—"আসুন, আজ বিধিকৃষ্ণপুরের কি দশা হইয়াছে, আসিয়া স্বচক্ষে দেখুন।"

একজন সামান্য লোকের এই ব্যাকুলতা দেখিয়া প্রেমাঙ্কুরের চক্ষে ধারা পড়িল। প্রেমাঙ্কুরের নয়ন যেন বঙ্গের আষাঢ় মাসের আকাশ—টিপ টিপ বারি পড়িতেছেই।

প্রেমাঙ্কুর বাবু ডিঙ্গি হইতে নামিলেন। প্রথমতঃ তারানাথের বাড়ীতে গেলেন। তারপর আদ্যন্ত সমস্ত ঘটনার কথা শুনিতে শুনিতে এবং দস্যু-লুণ্ঠনের সমস্ত চিহ্ন স্বচক্ষে দেখিতে দেখিতে চলিলেন। সরলার দাদা সমস্ত কথা বলিতে বলিতে এবং প্রেমাঙ্কুর বাবুকে দস্যু-লুণ্ঠনের জীবন্ত দৃষ্টান্ত,অত্যাচারের উজ্জ্বল চিত্র দেখাইতে "দীপ্তিদের" বাড়ীতে লইয়া গেল। পথে জমীদারের অত্যাচারের সমস্ত কথাও পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিবৃত করিল।

প্রেমাঙ্কুর বাবু আসিয়াছেন, বিধিকৃষ্ণপুরে একথাটা নিমেষের মধ্যে রাষ্ট্র

হইয়াছে। কোণের বৌ-ঝিরা স্বর্গীয় প্রেমের মূর্ত্তি দেখিবার জন্য বেড়ার ঝাঁপ দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতেছে। যাহারা দেখিতেছে, তাহাদের জীবন সার্থক হইল মনে করিতেছে, যাহারা দেখে নাই, তাহারা ছুটিয়া ছুটিয়া এক ঘর হইতে সম্মুখের ঘরের কোণে আশ্রয় লইতেছে। চতুর্দ্দিকে যেন ব্যাকুলতার একটা স্রোত চলিয়াছে, উপকারী বন্ধুর প্রতি কি মানুষের এতই ভালবাসা ও অনুরাগ? আর কাহারও না হউক, নিশ্চয় বলিতে পারি, মাতৃ জাতির ত বটে। রমণীকুল প্রেম-বৃন্দাবনের অসাধারণ স্বর্গীয়া দূতী, প্রেমিককে দেখিবার জন্য তাঁহারা কুলমান, লজ্জাশরম রাখেন না! বিধিকৃষ্ণপুরের কোণে কোণে প্রেমের ও সহানুভূতির একটা বিমল স্রোতের টান বহিতেছে।

প্রেমাঙ্কুর সকল বিবরণ শুনিতেছেন,আর যাইতেছেন,চক্ষের জলে তাঁহার দুই গণ্ড প্লাবিত, মূর্ত্তি সহানুভূতির স্বর্গীয় প্রভায় উদ্ভাসিত; উদ্ভাসিত নয়, নমিত;—নমিত নয় বিগলিত। অথবা কি যেন কেমন, ভাষায় তাহা ব্যক্ত হয় না। প্রেমের মূর্ত্তি প্রেমে গলিয়া রাস্তা বহিয়া যেন চলিয়াছে!

দীপ্তিদের ঘরে যাইতে আজ কাহারও নিষেধ নাই। বিপদের দিনে—সকলের গৃহই অবারিত-দ্বার! দেব-দুর্লভ সহানুভূতি নামক পদার্থটাকে মানুষ এতই ভালবাসে যে, বিপদের দিনে ঘর ও হৃদয়ের দরজা খুলিয়া রাখে সকলেই! মৃত্যুর দিনে ভাসুরের সম্মুখে কনিষ্ঠ-ভ্রাতৃবধূর ঘোমটা উন্মোচিত হয়। গ্রামের অবরোধ-প্রথা সহরের ন্যায় নয় যে, এক বাড়ীর লোক অন্য বাড়ীতে যাইতে পারিবে না। তাতে দীপ্তির পিতার বাড়ী। স্বর্গীয়া কন্যা দীপ্তি যে পিতা মাতার মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন, সে পিতা মাতা সামান্য নহেন। সেখানে লজ্জাটা অযথা স্থানে প্রয়োগের জন্য সঞ্চিত হইয়া রহে নাই। কুস্থানের কুকার্য্য ঢাকিবার জন্য যে লজ্জার জন্ম, পবিত্র-গৃহে তাহা থাকিবে কেন? যদি বা থাকে, তাহাও অস্থানে প্রয়োগের জন্য নয়, তাহা অহঙ্কারকে বিনাশ করিবার জন্য। আজ বিপদের বাড়ী—শোকের বাড়ীতে পরিণত হইতে যাইতেছে, কে কাহাকে সেখানে আসিতে বাধা দিবে? হরিগোপাল যে ঘরে প্রবেশ করিতে আজ বাধা পায় নাই, সে ঘরে যাইতে প্রেমাঙ্কুর বাধা পাইতে পারেন না। প্রেমাঙ্কুর বাবু অন্যমনস্ক,প্রেমে বিগলিত—সরলার দাদার সহিত যাইতে যাইতে একেবারে দীপ্তির শয্যা পার্শ্বে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

পাঠক, অজানা ভালবাসার এমন অপূর্ব্ব মিলন কখনও দেখিয়াছ কি?

প্রেমাঙ্কুর বাবু কিছুই জানেন না, সুতরাং তাঁহার মনে কোন ভাবান্তর নাই। সরলা, লীলা ও তিলোত্তমার চখের কোণে একটু হাসি চমকাইল ;—দারুণ মেঘের কোণে যেন ক্ষণ-বিদ্যুৎ,বর্ষার ধারার মধ্যে যেন নব সূর্য্যের ক্ষণ-কিরণ। আজ বিষাদ-রেখার মধ্যে এ হাসি তেমনি! সখীরাও ত কল্যকার সকল কথা জানেন না ; তবে এ হাসি কেন? না জানুন, দীপ্তির মন ত জানেন। তিন জনেই জানেন, দীপ্তি প্রেমাঙ্কুরের পবিত্রতার আদর্শকে চিরদিনের জন্য হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন। একটু হাসি অসম্ভব নয়।

একটু হাসির আরো কারণ আছে। এই যে ক্ষুদ্র দলটী, ইহা "প্রেমাঙ্কুরের" প্রেমের আদর্শ-গঠিত দল। কামিনীর হৃদয় যেন মোমের ছাঁচ, এখানে যেমন প্রতিকৃতি অঙ্কিত হয়, এমন আর কোথাও হয় না। ভাল ছবি এবং মন্দ ছবি, উভয়েরই ছাপ সহজে রমণীর হৃদয়ে অঙ্কিত হয়। যাহারা পাপ-আদর্শকে হৃদয়ে তুলিয়াছে, তাহারা ধর্ম্মনীতি, প্রেম-পবিত্রতা, লজ্জা-শরম ডুবাইয়া বাজারে ঘর বাঁধিয়াছে ; আর যাঁহারা পবিত্রতার আদর্শকে হৃদয়ে আঁকিয়াছেন, তাঁহারা পবিত্র হইতেও পবিত্র। ফুল সকলই সুন্দর, গোলাপ, বেল, যুঁই,চামেলী সকলই ত সুন্দর ; কিন্তু সকল মিলিয়া যখন গুচ্ছে পরিণত, তখন কত সুন্দর! সুর সকলই মধুর, কিন্তু সকল সুর ঐক্যতান-বাদ্যে যখন মিলিত, তখন আরো কত মধুর! রূপ হরেরও আছে, গৌরীরও আছে, শ্রীকৃষ্ণেরও আছে, শ্রীরাধিকারও আছে, কিন্তু যুগল-মূর্ত্তি,—হরগৌরী, কৃষ্ণ-রাধিকার যুগল-মূর্ত্তি কত সুন্দর! যুগল মূর্ত্তি অতুল শোভার ভাণ্ডার। প্রকৃতি-পুরুষের,—মিলন-পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের মিলন,পাহাড়-ঝরণার মিলন, কণ্টক-কুসুমের মিলন—অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আকর। যে দেখিয়াছে,সে-ই মজিয়াছে। রমণী-হৃদয়-মোমের-ছাঁচে পবিত্রতার আদর্শ যেমন সুন্দর, এমন সুন্দর জিনিস বুঝিবা এই জগতে আর নাই। এখানে স্বর্গের মন্দাকিনী, বৈকুণ্ঠের পারিজাত, অথবা যাহা কিছু ভাল, সকলই। এই ক্ষুদ্র-দলগত পবিত্রতার আদর্শ পাঠক একবার চিন্তা কর। যে আদর্শে এই দল গঠিত, যে আদর্শে এই ক্ষুদ্র দলে স্বর্গ-মর্ত্ত্য সম্মিলিত, যে আদর্শে রমণীকুলে ইহারা আজ দেবী বিশেষ, সেই প্রেমের আদর্শ, অন্য মুখে শ্রুত, সংবাদ পত্রে পঠিত ও কল্পনায় কল্পিত সেই প্রেমের চিত্র আজ সম্মুখে, অতি নিকটে ; আজ ইঁহাদের ক্ষণহাসি অসম্ভব নয়। এতকাল যাঁহাকে ভাবিয়াছে, যাঁহার রূপের ছাপ হৃদয়-মোমে তুলিয়াছে, যাঁহার প্রেমের তপস্যা করিয়াছে, সেই চিত্র সম্মুখে।

একটু হাসি, একই সময়ে, তিনের মুখে ও নয়নে প্রস্ফুটিত হইবে, ইহা অসম্ভব নয়।

আরো কারণ আছে। দারুণ মেঘাচ্ছন্ন দিবসে ভানুর কিরণ বড়ই মধুর লাগে, বিপদের দিনে শুভ সংবাদ বড়ই প্রাণে আরাম দেয়—আজ এই ঘোর দুর্দ্দিনে, দেশের একজন প্রকৃত সুহৃৎ, একজন হৃদয়বান ব্যক্তি নিকটে, একটু হাসি অসম্ভব নয়। প্রেমাঙ্কুর বাবুর সহিত ইঁহাদের আলাপ পরিচয় থাকিলে "ক্রন্দনই" আসিত, তাহা ছিল না, একটু হাসি আজ তিন জনের মুখেই গোপনে ফুটিয়া গোপনেই নিবিল।

সরলার দাদা বলিল, ইনিই দেবী দীপ্তি; কাল দস্যুরা ইহার এই দশা করিয়াছে! দেখুন কি সর্ব্বনাশ!!

দেবী প্রসন্নময়ী এবং দীপ্তির মাতা যাঁহার গুণে মুগ্ধ, তাঁহাকে এই বিপদের সময়ে পাইয়া তাঁহারা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। তাঁহাদের উভয়ের চক্ষু হইতেই আনন্দাশ্রু নিপতিত হইল। আর প্রেমাঙ্কুর কি করিলেন? আষাঢ়ের ধারা যেন শ্রাবণের ধারায় পরিণত হইল। তিনি বালকের ন্যায় হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দেবী প্রসন্নময়ীর নিষেধ করার শক্তি নাই। সে ক্রন্দন শুনিয়া তিনি যেন আত্মহারা। প্রেমাঙ্কুরের ক্রন্দনে দীপ্তি চমকিয়া উঠিলেন। একটু চাহিয়া দেখিলেন। ভাল কিছুই বুঝিতে পরিলেন না, একটা ছায়ার মধ্যে যেন কল্পনা মিশিয়া রহিয়াছে, মনের মধ্যে কি যেন লাগিয়া ছিল, মাথার ঠিক নাই, মোহের মধ্যে বলিয়া উঠিলেন "প্রেমাঙ্কুর, একটু জল।" আবার চক্ষু নিমিলীত করিলেন।

এ দুটা কথা, না একটা? দীপ্তি কি প্রেমাঙ্কুরকে জল দিতে বলিলেন? না, একবার প্রেমাঙ্কুর বলিয়া, পরক্ষণেই জল চাহিলেন। কেহই বুঝিল না। দেবী প্রসন্নময়ী দীপ্তির মুখে জল ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, "দীপ্তি, কে আসিয়াছেন, বুঝিতেছ কি? প্রেমাঙ্কুর বাবু আসিয়াছেন।"

প্রেমাঙ্কুর নাম দীপ্তির হৃদয়ে যেন অমৃতধারা বর্ষণ করিল; যে নাম প্রলাপে, সেই নামই কর্ণে প্রবেশ করিল। দীপ্তির সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া যেন একটী মধুর বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটিল, ক্ষতস্থান-সমূহ হইতে রক্ত নির্গত হইল, কিন্তু মুখের অপূর্ব্ব শোভা, এবার চাহিয়া দেখিলেন, সত্যই প্রেমাঙ্কুর নিকটে। যে প্রেমাঙ্কুর তাঁহার হৃদয়ের জপমালা, বহু দিন হইতে যাঁহার প্রেমে আকৃষ্ট, আজ কয় দিন যাঁহাকে হৃদয় প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন—কাল

আদর করিয়া ফুলে সাজাইয়া যে আদর্শ চিত্রের সহিত পুণ্যপ্রভা বিবাহ দিয়াছেন, আজ সেই আদর্শ নিকটে—শয্যাপার্শ্বে। দীপ্তির মনে হইল যেন আকাশের চাঁদ ভূতলে নামিয়াছে। মনে হইল, সে যেন স্বর্গে উঠিয়াছে। লজ্জা ভয় এ সময় আর থাকে না, তিনি প্রেমাঙ্কুরকে কাছে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। প্রেমাঙ্কুর নিকটে বসিলেন। প্রেমাঙ্কুরের পদধূলি মাথায় দিতে দীপ্তি সরলাকে ইঙ্গিত করিলেন। সরলা দুই হাতে আপনি প্রেমাঙ্কুরের চরণ-ধূলি মাথায় লইল,দীপ্তির মাথায় দিতে সাহস পাইল না। দীপ্তি লীলাকে ইঙ্গিত করিলেন,লীলাও পারিল না,শেষে তিলোত্তমাকে ইঙ্গিত করিলেন,সেও পারিল না। তখন আপনি অতি কষ্টে হাত বাড়াইয়া প্রেমাঙ্কুরের চরণ-ধূলি তুলিয়া মাথায় দিলেন এবং প্রেমাঙ্কুরের হাত টানিয়া মুখের কাছে লইয়া বারম্বার চুম্বন করিলেন ও মাথায় রাখিলেন। এই ঘটনার ভালমন্দ বিচার করিবার কাহারও প্রবৃত্তি হইল না, সকলে স্পন্দ রহিত হইয়া কেবল দেখিতেছে। প্রেমাঙ্কুর এই দৃশ্য দেখিয়া তাঁহাতে আর তিনি নাই। তিনি যেন এজগৎ ছাড়িয়া কোথায় গিয়াছেন। এই উত্তেজনায় দীপ্তির আবার মূর্চ্ছা হইল। সর্ব্বশরীর কম্পনের পর দীপ্তি আবার অচেতন হইলেন। সকলে চিত্রার্পিতবৎ সেখানে দাঁড়াইয়া ও বসিয়া শুশ্রুষা করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সোণা ও সোহাগার অপূর্ব্ব মিলন।

এক বাড়ীর ঘটনা চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, কোন্ কথা আগে বলি, ভাবিয়া ঠিক পাই না। দুই দিন তারানাথের সংবাদ নাই। হতভাগিনী পুণ্যপ্রভা কি করিতেছেন? ক্রমে ক্রমে এ সকল কথা লিখিতে পাঠকের অনুমতি চাই। দীপ্তির শয্যাপার্শ্বে যে সকল মহাজন আছেন, একটু নিশ্চিন্ত থাকিতে পারা যায়।

তারানাথকে গ্রেপ্তার করিয়া ডেপুটীর খাসমহলের এজলাসে লইয়া যাওয়া হইয়াছে, এইরূপ তাঁহার জবানবন্দি হইতেছে।

ডেপুটী জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কলিকাতার সংবাদ পত্রে আমার নিন্দা রটনা করিয়াছ কি?

হাকিমদের মুখে "তুই" ও "তুমি" শব্দই সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়।

তারানাথ।—নিন্দা রটনা কিছুই করি নাই, সত্য কথা লিখিয়াছি। নিন্দাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি।

ডেপুটী।—দুর্ভিক্ষে মানুষ মরিয়াছে, লিখিয়াছ কি ?

তারানাথ।—লিখিয়াছি, কেননা, তাহা সত্য ঘটনা।

ডেপুটী।—তাহার কোন প্রমাণ নাই। মৃতদেহ পরীক্ষা করা হইয়াছিল কি ? মৃতদেহ পরীক্ষা করা না হইলে ও কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়, উহা মিথ্যা কথা। তুমি মিথ্যা সংবাদ লিখিয়া গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছ, মানুষকে বৃথা উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিয়াছ। তোমার নামে লাইবেল হইবে।

তারানাথ।—লাইবেলের জন্য আমি চিন্তিত নহি, লাইবেল হয়, জেলে যাইব। না খাইয়া লোক মরিতেছে, নিজে দেখিয়াছি, আপনি বলিলেই ইহা মিথ্যা সংবাদ হইবে না। তাহার বহু সাক্ষী আছে। এইরূপ পবিত্র কাজ করিয়া জেলে গেলে, আমার স্বর্গসুখ হইবে।

ডেপুটী।—সে সকল সাক্ষী বিজ্ঞানের নিকট অগ্রাহ্য, তুমি জান কি ?

তারানাথ।—না, তাহা জানি না। সত্য সাক্ষী যদি অগ্রাহ্য হয়, মেয়াদ খাটিব, সে জন্য ভাবি না।

ডেপুটী।—তুমি লিখিয়াছ, আমি দুর্ভিক্ষস্থল হইতে অনেক মেয়ে অপহরণ করিয়াছি। এ কথা অসত্য। আমার বিরুদ্ধে তুমি মিথ্যা লিখিয়াছ, আমি তোমার নামে লাইবেল আনিব।

তারানাথ।—আপনি মেয়ে আনিয়া অন্দরে রাখিয়াছেন, সে কথা সত্য লাইবেল মোকদ্দমা করিলে বহু সাক্ষী সে কথা প্রমাণ করিবে।

ডেপুটী।—সত্য হইলেও একজনের যাহাতে সুনামের হানি হয়, তাহা করিলে যে লাইবেল হয়, তাহা তুমি জান কি ?

তারানাথ।—জানি, একজন যদি মদ খায় বা বেশ্যাবাড়ী যায়, সে কথা রটনা করিলে ব্যক্তিগত নিন্দা হয়, সুতরাং তাহা করিলে লাইবেল হয়। যে বিষয়ে সাধারণের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে, তাহাতে লাইবেল হয় না। আমি দেশের মঙ্গলের জন্য সত্য কথা লিখিয়াছি, আপনার দুর্নাম রটনার জন্য নয়।

ডেপুটী।—উহাতে যে আমার দুর্নাম রটনা হইয়াছে, তাহা তুমি এখন বুঝিয়াছ ত ?

তারানাথ।—দুর্নামের ভয় করেন, এইরূপ জঘন্য কাজ হইতে নিবৃত্ত

ুউন, মেয়েগুলিকে ছাড়িয়া দিন, মায়ের বুকের ধন মায়ের কোলে যাউক। দেশের হিতের জন্য আমি সত্য কথা লিখিতে অধিকারী।

ডেপুটী।—মেয়েগুলি না খাইয়া মরিতেছিল, তাহাদিগকে আমি মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে উদ্ধার করিয়াছি, কোনই অন্যায় করি নাই। তুমি বেয়াবের ন্যায় কথা বলিতেছ, সাবধান হইয়া না চলিলে, তোমার নামে নিশ্চয় াইবেল করিব।

তারানাথ।—হুজুরের যা ইচ্ছা করুন।

ডেপুটী।—তুমি যদি ঐ সকল কথা প্রত্যাহার কর, ক্ষমা চাও, তবে তুমি াবারকার মত মুক্তি পাইবে। তুমি জান, লোকের উপকার করাই আমার র্ম্ম। এই জন্যই তোমাকে সতর্ক করিতেছি।

তারানাথ।—আমার দ্বারা তাহা হইবে না,—প্রাণান্তেও হইবে না।

ডেপুটী।—দুর্ভিক্ষের সাহায্যের জন্য আমি খুব চেষ্টা করিব, তুমি আমার ম্বন্ধীয় কথাগুলি অন্ততঃ প্রত্যাহার কর।

তারানাথ।—আমার দ্বারা তাহা হইবে না, প্রাণান্তেও না।

ডেপুটী।—দেখ, তোমার মঙ্গলের জন্য বলিতেছি, কথা শুন, নচেৎ তামার ভাল হইবে না।

তারানাথ।—ভাল না হয়, মন্দই হইবে; সত্য ঢাকিতে আমি পারিব না।

ডেপুটী।—আবার বলিতেছি,এই বিজ্ঞ লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া এস।

এই কথা বলিবামাত্র পার্শ্বের একটী লোক তারানাথকে লইয়া গৃহান্তরে ইয়া বলিল, ডেপুটী সাহেব তোমাকে এই হাজার টাকা দিতেছেন, কথা ন, নচেৎ ভাল হইবে না, তোমার সর্ব্বনাশ করিয়া ছাড়িবেন। জানত, তনি কেমন দুর্দান্ত লোক।

তারানাথ কোন মতেই সম্মত হইলেন না, সুতরাং আবার ডেপুটীর নিকট ানীত হইলেন। ডেপুটী বলিলেন, আমার প্রস্তাবে রাজি আছ কি?

তারানাথ।—না হুজুর।

ডেপুটী বলিলেন, তবে তোমার শক্তি কত, দেখা যাইবে। ইহার পর ামার পা ধরিয়া কাঁদিলেও আর তোমার কথা শুনিব না।

ডেপুটী আদেশ করিলেন,ইহাকে হাজতে রাখ,যে সকল মোকদ্দমা ইহার রুদ্ধে উঠিয়াছে, কাল তাহার বিচার হইবে।

গবর্ণমেণ্টের হাজতের ন্যায় স্বেচ্ছাচারের এমন মনোহর ঘর আর নাই।

কতক সময় হাজতে কয়েদ করিবার ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেটদিগের উপর দেওয়ায়, সর্ব্ব সাধারণের প্রতি যে কি অত্যাচারের দ্বার মুক্ত হইয়াছে,সকলেই জানেন। তারানাথকে বিনা কারণে, বিনা চার্জ্জে হাজতে থাকিতে হইল, কেবল ডেপুটীর স্বেচ্ছাচারিতায়!! সমস্ত রজনী তারানাথকে যে কি ভাবে কাটাইতে হইল, বর্ণনা করা অসাধ্য। পরদিন প্রাতে ডেপুটী বিধিকৃষ্ণপুরের বিবরণ শুনিলেন। তাঁহার হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না। তারানাথ সম্বন্ধে সেদিনও লিখিত কোন হুকুম দিলেন না। পুলিসকে ইঙ্গিত করিলেন, সেদিনও তারানাথ যেন হাজতে থাকে।

দীপ্তির পিতা বেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায় মাদারিপুর যাইয়া তারানাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি পাইলেন না। পুলিস নানা কথায় ভুলাইয়া সমস্ত দিনটা কাটাইয়া দিল,তদন্তে বাহির হইল না। পুলিসের হিতোপদেশের কথাগুলি এই।

ইনেস্পেক্টর।—তুমি বলিতেছ,দস্যুরা তোমার মেয়েকে আহত করিয়াছে, তাহার প্রমাণ কি? সাক্ষী কোথায়? অপর পক্ষ যদি বলে যে, দীপ্তির দুই উপপতির এক জন হিংসা বশতঃ ঐ রূপ করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে তুমি কি বলিবে? কেলেঙ্কারীর কথা, যত চাপা থাকে, ততই ভাল। বিষ্ঠায় ঢিল মারিলে নিজের গায়ে ছিটিয়া লাগে, তুমি বিজ্ঞ, সকলই বুঝিতে পার, ক্ষান্ত হওয়াই ভাল নহে কি? বুঝিয়া দেখ। যদি মোকদ্দমা প্রমাণ করিতে না পার, শেষে তুমি উল্টা চাপের মধ্যে পড়িবে।

বেণীমাধব।—দীপ্তির যেরূপ অবস্থা, তাহার বাঁচিবার আশা নাই। গবর্ণমেণ্টের বাদী হইয়া মোকদ্দমা চালান উচিত নয় কি?

ইনেস্পেক্টর।—উচিত, কিন্তু সব উচিত কি সব সময়ে সম্পন্ন করা যায়? তোমাকেই ভুগিতে হইবে; তোমার ও তোমার কুলের নিন্দা রটনা হইবে। ভাবিয়া দেখ, কর্ত্তব্য কি? তোমার কন্যার শুশ্রূষা করগে, অবশ্যই সে রক্ষা পাইবে, যদি না রক্ষা পায়, প্রতিশোধ তুলিয়া কি করিবে, তাহাতে ত কন্যা ফিরাইয়া পাইবে না; বৃথা কষ্ট ভোগ হইবে। তাহা মানুষের কাজ নয়। বিপদের উপর আরো বিপদ বাড়িবে। যদি মৃত্যু হয়, লাস জ্বালাইয়া দিবে, চুপ-চাপ থাক, কোন গোলযোগের প্রয়োজন নাই।

বেণীমাধব।—এতবড় একটা ঘটনা চাপা থাকিবে মনে করেন কি? শেষে আপনিও কষ্টে পড়িবেন।

ইনেস্পেক্টর।—তুমি যদি আমাদের পক্ষে থাক, তবে কোন কষ্টেরই কারণ নাই?

বেণীমাধব।—আমি ত আর মিথ্যা বলিতে পারিব না।

ইনেস্পেক্টর।—কে তোমার কন্যাকে মারিয়াছে, তাহা তুমি জান কি?

বেণীমাধব।—তা জানি না বটে, কিন্তু তাতেই কি গোল চুকিবে?

ইনেস্পেক্টর।—আর যাহা দরকার আমরা করিয়া লইব, সে চিন্তা তোমার করিয়া কাজ নাই।

বেণীমাধব।—এতবড় মেয়ে চুরির মোকদ্দমাটা উড়িয়া যাইবে কি?

ইনেস্পেক্টর।—আমাদের শক্তি কত,জান না কি? আমরা তিলকে তাল করিতে পারি, তালকে শূন্যে উড়াইয়া দিতে পারি, জান না কি?

দীপ্তির পিতা সমস্ত দিন দরবার করিয়াও ইনেস্পেক্টরকে ষ্টেসনের বাহির করিতে পারিলেন না। রাত্রি ১০ টার পর, ইনেস্পেক্টর বলিলেন, তুমি আজ বাড়ী যাও, আমি কাল প্রাতে তোমাদের গ্রামে তদারকে যাইব। আজ আর কিছু হইবে না।

দীপ্তির পিতা রাত্রি ১১ টার সময় বাড়ী রওয়ানা হইলেন, তারানাথ সেদিনও হাজতেই রহিলেন। বেণীমাধবকে বিদায় করিয়া দিয়া ইনেস্পেক্টর সাহেব তারানাথকে হাজত হইতে ডাকিয়া বলিলেন,—"তোমাদের গ্রামে একটা বড় মোকদ্দমা উপস্থিত, আমি কাল প্রাতে তাহার তদারকে যাইব, তুমি সঙ্গে যাইবে কি?"

তারানাথ।—ডেপুটী সাহেব বলিয়াছেন, আমার মোকদ্দমা না হইলে ছুটী দিবেন না।

ইনেস্পেক্টর।—সে বন্দোবস্ত আমি করিব, তুমি যাইবে কিনা, বল। মোকদ্দমাটা তোমাদের ঘরের।

তারানাথ।—কি মোকদ্দমা?

ইনেস্পেক্টর।—সত্য মিথ্যা জানি না, একপক্ষ বলিতেছে, বেণীমাধব হরিগোপাল ও কালিকান্তের নামে একটা মিথ্যা মোকদ্দমা খাড়া করিতে চায়। বেণীমাধব বলে, তাহার মেয়েকে জখম করে, কালিকান্ত তোমার মেয়েকে লইয়া গিয়াছে। কোন্ কথা সত্য বুঝিবার উপায় নাই, তুমি যাইবে কি?

এ সকল কথা তারানাথকে এক অভূতপূর্ব্ব চিন্তার রাজ্যে লইয়া গেল। তিনি সংযমী পুরুষ, বিচলিত হইলেন না, বুঝিলেন, এই জন্যই তাহাকে

গ্রেপ্তার করিয়া আনা হইয়াছে। মানুষ এতদূর নীচ হইতে পারে, তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। কালিকান্তকে হাতে করিয়া তিনিই মানুষ করিয়াছেন, বলিলে হয়। সেই কালিকান্ত তারানাথের সর্ব্বনাশ করিতে পারে, এ বিশ্বাস তারানাথের বড় একটা ছিল না। কেহ কেহ তারানাথকে বলিয়াছিল, কালিকান্ত অবসর পাইলেই তোমার সর্ব্বনাশ করিবে। তারানাথ তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমার অনিষ্ট সে কখনও করিবে না—তাহাকে যে হাতে করিয়া আমি মানুষ করিয়াছি।" কালিকান্ত আর সকলই করিতে পারে, কিন্তু তারানাথের সর্ব্বনাশ করিতে পারে, এ ধারণা তারানাথের ছিল না। আজ ইনেস্পেক্টরের কথায়, তাঁহার মনে নানাদিনের নানা ঘটনা, নানা জনের নানা কথা যুগপৎ উপস্থিত হইল, মনে মনে ভাবিলেন,—"মানুষ কি এতই নীচ?" ভাবিলেন—"আমি কি দুধ-কলা দিয়া সাপ পুষেছিলাম?" ভাবিলেন—"আমি কি লোক চিনিতে এতই অপারক?" এই সকল কথা ভাবিয়া নিজকে ধিক্কার দিলেন। আবার ভাবিলেন—"না, আমি তার উপকার করেছি, ইহাই যথেষ্ট। আমিত তাহার কোন অপকার করি নাই। সে ঐ রূপ করিয়া থাকে, ধর্ম্মের নিকট অপরাধী হইয়াছে, আমি চিনি বা না চিনি, আমি বরাবর তাহার উপকার করেছি; তাহার কোন অনিষ্ট একদিনও করি নাই, ইহাই যথেষ্ট।" এই রূপ ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন। ইনেস্পেক্টরের কথার উত্তর দিতে একটু বিলম্ব হইল। বলিলেন—"আমি যাইতে প্রস্তুত আছি।"

ইনেস্পেক্টর বলিলেন।—ডেপুটী সাহেব তোমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, যদি তুমি এবার কোন আন্দোলন না কর। তুমি বিবেচক, বুদ্ধিমান ব্যক্তি, এই বিপদের দিনে, আমাকে ও ডেপুটী বাবুকে সহায় পাওয়া তোমার পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা নয়। তুমি এক কাজ কর, সংবাদ পত্রের কথাগুলি প্রত্যাহার কর এবং এই ঘটনা লইয়া আর আন্দোলন করিও না। তোমার মেয়ে রূপে গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, শুনিয়াছি। কালিকান্ত ধনে মানে আজ এদেশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। সোণায় সোহাগা মিলিয়াছে। তোমার পরম সৌভাগ্য, তোমার সামান্য বেতনের চাকরি আর করিতে হইবে না, পরমসুখে দিন যাইবে। উপযুক্ত জামাই পাইয়াছ, আর কি? আমার নিকট প্রতিশ্রুত হও, আর কোন আন্দোলন করিবে না।

তারানাথ কিছু সমস্যায় পড়িলেন। তিনি বুদ্ধিমান, সংযত ও সম্মানিত

ব্যক্তি; মোকদ্দমা করিলে আরো দুর্নাম রটনা হইবে,এই একটা চিন্তা মনে জাগিল। দ্বিতীয় কথা, পুণ্যপ্রভার মন যদিও তিনি জানেন, তবুও ভাবিলেন, এখন সে যদি এই বিবাহে সুখী হইয়া থাকে, অর্থাৎ সে যদি এই বিবাহের বিরুদ্ধে না চলে, তবে আন্দোলনে কি ফল হইবে? তৃতীয় কথা, একটা প্রবল পক্ষ বিরুদ্ধে, হরিগোপাল ও কালিকান্ত ধন গৌরবে দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত, ডেপুটী ও ইনেস্পেক্টর সাহেব! টাকার ক্ষমতা অপরিসীম— টাকায় আদালত কেনা যায়। টাকায় উকীল বশ, টাকায় হাকিম বশ, টাকায় পুলিস বশ, টাকায় সাক্ষী বশ! একজন উকীল ও একজন সাক্ষীও কি পাওয়া সম্ভব হইবে? তিনি এত দিন কতলোকের কত উপকার করেছেন, সত্যকথা বলিতে একজন সাক্ষীও কি পাইবেন না? তারানাথ কিছুই প্রত্যাশা রাখেন না, আজ বিপদের দিনে কাহারও উপর কিছুই প্রত্যাশা করিতে পারিতেছেন না। সত্য কথা বলাইতে মানুষকে যদি খোসামুদীটুকও করিতে হয়, তাহাতেও তিনি নারাজ। কাহারও নিকট প্রত্যুপকার প্রার্থনা করিবেন, তাঁহার মন এ নীচতায় যাইতে চাহে না। দশ জন লোককে ডাকিয়া সাহায্য করিতে বলিবেন, এ নীচতায় তিনি যাইতে রাজি নন্। একা আসিয়াছি, একা যাইব, কাহারও কোন ধার ধারি না, ধারিব না। যা করেন জগদম্বা, হইবে, তাঁহার অন্তরের ভাব এই। টাকার ক্ষমতার কথা ও দুর্নামের ভয়, জগদম্বার কথা মনে হওয়া মাত্র তিরোহিত হইল। মনে মনে ভাবিলেন— "টাকার ক্ষমতা অনেক, ধর্ম্মের ক্ষমতা আরো অনেক। আমিত কোন অধর্ম্ম বা অন্যায় কার্য্য করি নাই। দুর্নামের ভয় কি? নাম আবার কি? সুনামও বুঝি না, দুর্নামও বুঝি না, কেবল জগদম্বার কৃপা বুঝি। তিনি যাহা দেন, মস্তক পাতিয়া লইব, সুনাম দেন, তাহাও শিরোধার্য্য, দুর্নাম দেন, তাহাও শিরোধার্য্য। আমিত কখনও তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করি নাই, সাধ্যানুসারে ধর্ম্ম-ধন আশ্রয় করিয়া রহিয়াছি। মানুষকে ভয় করিব কেন? মানুষকে ভয় করা কাপুরুষতা। কিন্তু পুণ্যপ্রভার মত কি, তাহাত ঠিক বুঝিতেছি না? পুণ্যপ্রভা আমারই তনয়া, দেবী প্রসন্নময়ীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, অসামান্য পুণ্যপ্রভায় তাহার জীবন পূর্ণ; সে কি নীচ অর্থের দাসী হইবে? হইতে পারে কি?" ক্ষণকাল ভাবিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন,"না,তাহা অসম্ভব।" তবুও মনের মধ্যে একটু দ্বিধা, একটু সন্দেহ জমিয়া রহিল। পাছে তাহার মত বিরুদ্ধ হয়,এজন্য অনেক ভাবিয়া উত্তর করিলেন—"সাহেব, আমি

কি করিব, এখন কিছুই ঠিক বলিতে পারিতেছি না। বাড়ীর অবস্থা জানিব, পুণ্যপ্রভার মত জানিব, তার পর মত ঠিক করিব। তবে একথা আপনাকে বলিতে পারি, অকারণ কাহারও অনিষ্ট সাধন আমা দ্বারা হইবে না। দুর্ব্বলকে রক্ষা করা আমার ব্রত, ধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ রাখা আমার ধর্ম্ম, পুণ্যকে বজায় রাখা আমার কর্ত্তব্য—কাহারও অনিষ্ট করা আমার ধর্ম্ম নয়। আমার জীবনের ব্রত এই, কাহারও উপকার করিতে পারি, প্রাণপণে করিব, না পারি, চুপ করিয়া দিবানিশি কেবল অন্যের মঙ্গল কামনা করিব, কিন্তু কখনও কাহারও অনিষ্ট করিব না, চিন্তাতেও কাহার অনিষ্ট স্থান দিব না। অকুতোভয়ে আপনাকে সমস্ত কথা বলিলাম, আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, করুন।

ইনেস্পেক্টর তারানাথের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। কথাগুলি চিন্তা, বিবেচনা, বুদ্ধি, সংযম এবং ধর্ম্মানুমোদিত, ইহার বিরুদ্ধে কে কথা বলিতে পারে? ইনেস্পেক্টর তারানাথের অনেক প্রশংসা শুনিয়াছিলেন; এই দারুণ বিপদের দিনেও তিনি একটু ক্রোধ, একটু হিংসা, একটু বিদ্বেষের পরিচয় দিলেন না, অবিচলিত ভাবে রহিলেন—প্রলোভনেও টলিলেন না, ভয়েও দমিলেন না, ইহাতে ইনেস্পেক্টরের মনটা অনেক নরম হইল। ইনেস্পেক্টর মনে মনে ভাবিলেন "লোকটা প্রকৃতই মহাপুরুষ হইবে।" প্রকাশ্যে বলিলেন, তবে এখন তুমি নিদ্রা যাও, আমি প্রত্যূষে ডেপুটী সাহেবের আদেশ আনিব ও তোমাকে লইয়া বিধিকৃষ্ণপুর যাইব। আমাদের কার্য্য আমরা করি, তারপর তোমার যে কর্ত্তব্য হয়, করিও।

তারানাথ ধীরে ধীরে বিদায় লইলেন। হাজতে যাইয়া ঘুমাইতে চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু কোন রূপেই ঘুম আসিল না। সমস্ত রাত্রি নানা দুশ্চিন্তা মনকে অস্থির করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিতে লাগিলেন—"হায়রে সোণার পুণ্যপ্রভা, তোর ভাগ্যে কি শেষে এই ছিল!!"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

নদীর স্রোত আজ উজানে চলিয়াছে।

রাত্রে হরিগোপালের ঘরে বড় দরবার বসিয়াছে। হরিগোপাল একটু দুর্ব্বলতা দেখাইয়াছেন, ইহাতে তাঁহার পক্ষীয় লোকেরা দমিয়া গিয়াছে, চরনগরে এ সংবাদ পৌঁছিয়াছে। কালিকান্তের লোক বিধিকৃষ্ণপুরে আসিয়াছে।

বড় বৈঠক, কিন্তু বৈঠকে হরিগোপাল এখনও উপস্থিত হন নাই। দীপ্তিকে দেখিয়া আসার পর তাঁহার মনটা বড়ই খারাপ হইয়াছে;—পুণ্যপ্রভার প্রতি তাঁহার কুনজর ছিল, কিন্তু দীপ্তির প্রতি নহে। হরিগোপাল দীপ্তিকে বরাবর ভালবাসিতেন; সেই দীপ্তির এহেন দশা হইয়াছে, হরিগোপালের প্রাণটা সে জন্য আজ বড়ই অস্থির। অন্তঃপুরে শান্তিশীলার সহিত আজ দুঃখের কথা বলিতেছেন। রাজগিরির গিরিশঙ্কটের সুদৃঢ় কঠিন পাষাণে স্বচ্ছসলিলা বাণ-গঙ্গা প্রবাহিতা। অপূর্ব্ব দৃশ্য!

শান্তিশীলা স্বামীর অদ্যকার পরিবর্ত্তনে কিছু আশান্বিতা,কিন্তু দলে গেলে পাছে এই সদ্ভাবটুক যায়, এই আশঙ্কা প্রাণে। তিনি ভালবাসার ফাঁদ পাতিয়া স্বামীকে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু পুরুষের দুর্জ্জয় রিপুকে বশ করা রমণীর সাধ্যায়ত্ত কি? যদি তাহা হইত, তবে বঙ্গের ঘরে ঘরে আজ বিষ-বৃক্ষ অঙ্কুরিত হইত না, সোণার বাঙ্গলা ছারখারে যাইত না। কি জানি কেন, পুরুষের মন বড়ই প্রলোভন-প্রলুব্ধ, কি জানি কেন, পুরুষ বড়ই বাহিরের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট। অন্তঃপুর যেন বাঙ্গালীর বিষ। অন্তঃপুর যেন দুঃখের সাগর, অন্তঃপুর যেন বিষাদের পাহাড়। উহাতে ডুবিতে অথবা উহাতে মন-ঘর বাঁধিতে মানুষ বড়ই নারাজ! রমণীর সাধ্য কি যে পুরুষের মন বাঁধিবে? শান্তি-শীলা এ সকল জানিয়াও আজ একটু আশায় বুক বাঁধিয়া বলিতেছেন "দেখ, আজ আর তুমি বৈঠকে যেও না,যা হবার ঢের হয়েছে, এখন থামো। যে যার পথ দেখুক, সকলকে বলে দেও। যেরূপ দেখা যাইতেছে, দীপ্তির জীবনের আশা নাই। নিরপরাধিনী বালিকা গেলে, ঐ সংসার ডুবে যাবে। দীপ্তির মা বলেছেন, দীপ্তি মরিলে তাঁহারা কুমারে ডুবে মরিবেন। কি সর্ব্বনাশের কথা! ব্রহ্মশাপে সগর বংশ ধ্বংস হয়েছে, হায়, ব্রহ্মশাপে না জানি আমাদের কি সর্ব্বনাশ হইবে!! দীপ্তি পুণ্যপ্রভাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, বুঝি বা সে কাছে থাকিলে দীপ্তি এবার রক্ষা পাইত। বুঝি বা পুণ্যপ্রভার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়াই দীপ্তির এ অবস্থা। তুমি চেষ্টা করে কি তাহাকে একবার আন্‌তে পার না? কি বল, দুটা মিষ্ট আশার কথা বল, শুনি।"

হরিগোপালের প্রাণটা আজ কিছু চঞ্চল হয়েছে, বহিতেছিল তীব্র একটানা স্রোত, হঠাৎ জোয়ারটা থেমে গিয়াছে,জল এখন চলে কি না চলে। তিনি, কি করিলে কি হইবে,কিছুই ঠিক পাইতেছেন না,মোকদ্দমার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার আর উপায় দেখিতেছেন না। মাদারিপুরের পুলিস বশ হয়েছে,

ডেপুটী হাতে আছেন, কিন্তু ফরিদপুর হইতে লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছে যে, "সেখানে কোন তদ্বিরের সুবিধা হয় নাই। পুলিস সাহেব ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ক্ষুদ্র ষ্টিমারে তদারকে আসিতেছেন। অন্য পক্ষের ৮৷১০ জন লোক যাইয়া দেশের অরাজকতার কথা চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিয়াছে। অনেক সদাশয় উকীল জোট বেঁধেছেন, ফরিদপুরে বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে।" এ সংবাদে তাঁহার প্রাণটা বড়ই চঞ্চল হয়েছে, এক একবার ইচ্ছা হইতেছে, দেশ পরিত্যাগ করেন, কিন্তু যাইবেন কোথায়? ইংরাজের মুল্লুক ছাড়িয়া পলায়ন করা সম্ভব নয়, কোথায় যাইবেন? এক এক বার ইচ্ছা হইতেছে, আত্মহত্যা করেন, কিন্তু তাহাও সাহসে কুলাইতেছে না। তাঁহার মনটা আজ কিছু চঞ্চল। তার উপর দীপ্তির সেই অবস্থা প্রাণকে বৃশ্চিকের ন্যায় বারম্বার থাকিয়া থাকিয়া দংশন করিতেছে। হরিগোপালের মুখ মলিন, কিছুই ভাল লাগিতেছে না। শান্তিশীলার এতগুলি কথার উত্তরে বলিলেন—"তোমার ত অনেক গুণ, তুমি আমাকে রক্ষা কর্‌তে পার না? ভয়ে আমি বড় অস্থির হয়েছি, ধর্ম্মের জয় হবেই, আজ নিশ্চয় বুঝেছি, বল ত এখন কি করি? বল্‌তে পার, কি কর্‌লে রক্ষা পাই?"

শান্তিশীলা বুঝিলেন, পাপীর মনে অনুতাপের পূর্ব্বে যে অবস্থা হয়, এ অবস্থা তাহাই।

পাপ করিলে মানুষের ভয় হওয়া স্বাভাবিক। হরিগোপালের আজ তাহাই হইয়াছে। হরিগোপাল, দেবী প্রসন্নময়ীর সেই স্বর্গীয় ভাব দেখিয়া বুঝিয়াছেন, তিনি সিদ্ধাবস্থায় পৌঁছিয়াছেন, সুতরাং ধর্ম্মের জয় অপরিহার্য্য। বিষম ভাবনার মধ্যে পড়িয়াছেন। ইহা বুঝিয়া শান্তিশীলা উত্তর করিলেন—"রক্ষা করিতে পারেন যিনি, তাঁহাকে ডাকো; জগদম্বার আশ্রয় লইতে দেবী প্রসন্নময়ী বলিয়াছেন, তাহা করিয়া দেখ না?"

হরিগোপাল।—তাহারই বা সময় কই? রাত্রি প্রভাতেই পুলিসের লোক বাড়ী বেষ্টন করিবে। উপায় কি, বল? তুমি ত অসময়ের সহায়, বল না, কি করি?

শান্তিশীলা।—সত্যকে আশ্রয় কর। অকপটে সমস্ত সত্য ঘটনা বলিবে, তারপর যা অদৃষ্টে থাকে, হইবে; কোন কথা লুকাইও না। তুমিও বুঝিয়াছ, আমিও বুঝিয়াছি, ধর্ম্মের জয় হবেই, সত্য কখনও গোপন থাকিবে না, তবে আর কেন? পাপ ত অনেক করেছ, আর কেন, এখন সত্যকে আশ্রয় কর। জীবন যায়, সেও স্বীকার, তবুও মিথ্যা বল্‌বে না, দাসীর এই অনুরোধ।

হরিগোপাল।—সত্য প্রকাশ করিলে চির দিনের তরে জেলে যেতে হবে, তা বুঝ্‌তে পেরেছ কি ?

শান্তিশীলা।—তা বুঝেছি, কিন্তু তবুও আমি অন্য পথ দেখি না। মিথ্যা বল্লেও নিস্তারের উপায় নাই যখন, তখন বৃথা ধর্ম্ম ছাড়্‌বে কেন ?

হরিগোপাল।—কালিকান্ত বাবুর লোক এসেছে, আরো অনেক লোক এসেছে, উহাদিগকে বিদায় করে দিয়া আসি, তুমি আমার জন্য একটু ভাব।

শান্তিশীলা স্বামীকে যাইতে উদ্যত দেখিয়া নিষেধ করিলেন, পা ধরিলেন, হাত ধরিলেন, মধুর বাক্য বলিলেন।

হরিগোপাল বলিলেন, কোন ভয় নাই। আমি এখনই আস্‌তেছি, তুমি একটু বসো। হরিগোপাল এই বলিয়া দরবারে পৌঁছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলের মুখ প্রফুল্ল হইল, কালিকান্ত বাবুর লোক বলে উঠিল, "আসুন মহাশয়, আস্‌তে আজ্ঞা হউক।" হরিগোপাল সেই প্রসন্নতায় আজ যোগ দিতে পারিলেন না, মনে দারুণ চিন্তা, একদিকে পুলিসের ভয়, অন্যদিকে ধর্ম্মের ভয়। ফরিদপুরের লোক ফিরিয়া আসিয়া পুলিসের ভয় জাগাইয়া দিয়াছে, দেবী প্রসন্নময়ী ধর্ম্মের ভয় জাগাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিলেন,—"আজ আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন, আমার শরীরটা আজ বড় অসুস্থ, মনটা বড় খারাপ, আজকার রাত্রিটা বিশ্রাম করি, কাল প্রাতে যা হয় পরামর্শ করা যাইবে।"

কালিকান্তের লোক।—সে কি মহাশয়, কাল যে পুলিসের লোক হাজির হবে! আজই সব ঠিক কর্‌তে হবে; আর সময় নাই।

হরিগোপাল।—ফরিদপুর হতে লোক ফিরে এসেছে, সেখানে কোন তদ্বির হয় নাই। ফরিদপুরে বিষম আন্দোলন উঠেছে। ২০ হাজার টাকাতেও ফল হয় নাই। এখন আর উপায় নাই। আমি সত্য পথ অবলম্বন কর্‌ব, ভাব্‌তেছি।

কালিকান্তের লোক।—তা হলে সদ্য জেল, তা কি বুঝ্‌ছেন না ?

হরিগোপাল।—আপনারা মিথ্যা বল্লেই কি রক্ষা পাবেন, ভাব্‌ছেন ?

কালিকান্তের লোক।—অবশ্য পাব, কিসের ভয়, টাকার অসাধ্য কি ? পুলিস, ম্যাজিষ্ট্রেট, সেসন, তারপর হাইকোর্ট, এই চারি স্থানের এক স্থানেও টাকার জয় হবে না ? অবশ্যই হবে। ২০ হাজারের জায়গায় নয় লক্ষ টাকা লাগ্‌বে, ভয় কি মহাশয় ?

হরিগোপাল।—কালিকান্ত বাবু কি বলেন ?

কালিকান্তের লোক।—তিনি শেষ পর্য্যন্ত লড়িবেন, কল্যকার ঘটনাটা সবই মিথ্যা, ইহাই প্রমাণ করিবেন।

হরিগোপাল।—তারানাথের মেয়েকে কি করিবেন? সে কি মিথ্যা কথা বলিবে?

কালিকান্তের লোক।—প্রথমতঃ তাহাকে যাহাতে হাজির হতে না হয়, তাহার চেষ্টা করা যাইবে; সে কালিকান্তের বিবাহিতা স্ত্রী, তারানাথ স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক কন্যার বিবাহ দিয়াছে, কেবল সমাজের ভয়ে আজ দূরে রহিয়াছে, বহু সাক্ষীর দ্বারা একথা প্রমাণিত হইবে, ভয় পাচ্চেন কেন?

হরিগোপাল।—তারানাথের মেয়ে কি আপনাদের বশ হয়েছে?

কালিকান্তের লোক।—সে চেষ্টা বিধিপূর্ব্বক হইতেছে, কল্য রাত্রি ও অদ্যকার চেষ্টা পরাস্ত হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও চেষ্টা অবশিষ্ট আছে। সেই মেয়েকেই আমাদের একমাত্র ভয়; আর কোন ভয় নাই। সে এক অসাধারণ মেয়ে। তার বুদ্ধির নিকট আমরা সকলে হার মেনেছি। স্ত্রীলোকের এত বুদ্ধি থাকে, পূর্ব্বে জান্‌তাম না। তা যা হউক, সে এখন আমাদের হাতে, যেরূপে হউক, তাহাকে বশে আস্‌তেই হবে। কৌশলে না হয়, শেষে বল প্রয়োগে হইবে, একটা উপায় হবেই। সে জন্য চিন্তা নাই, শুনেছি, আপনি একটু দমেছেন, আমরা সেই ভয়ে অস্থির আছি। আমাদের সকলের মান সম্ভ্রম, এমন কি, জীবন ধন আপনার হাতে, ডেপুটী আপনার হাতে, ইনেস্পেক্টর আপনার হাতে, আমরা সকলেই আপনার হাতে, দোহাই আপনার, দোহাই আপনার ধর্ম্মের, আমাদিগকে ডুবাবেন না।

হরিগোপাল।—তারানাথের মেয়ে, সামান্য রমণী নয়, তাহার মাতা সিদ্ধা রমণী, বল প্রয়োগে সেই কন্যার কি করিবেন? মৃত্যুকেও সে ভয় করে না। আমরা কি এপর্য্যন্ত কম চেষ্টা করেছি। সব পরাস্ত হয়েছে। একাকিনী সে দেশ জয় কর্‌তে পারে, এমন শক্তি তাহার আছে? তাহার প্রাণ লইতেও আপনাদের শক্তি নাই। সে দীপ্তির ন্যায় মেয়ে নহে, সে স্বর্গের দূতী, মায়াবিনী, লীলাময়ী।

কালিকান্তের লোক।—আমরা আগে তাহা জানিতাম না, এখন সবই বুঝেছি। কিন্তু এখন আর উপায় নাই। তাহার জীবন লইলেও যে কথা, না লইলেও সে কথা। তাহাকে রাখিয়াই এখনকার সকল চেষ্টা। কালিকান্ত বাবু সমস্ত রাত্রি ও সমস্ত দিন সেই চরণে পড়িয়া আছেন। যাহা হয় একটা হইবে, আপনি এখন সদয় হউন।

হরিগোপাল।—আপনাদের অনুরোধ এড়ান বড়ই কঠিন, কিন্তু আমি বুঝিতেছি যে, আমার মেয়াদ হইলেই পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হয়। আপনারা দীপ্তির যে অবস্থা করেছেন, মানুষের প্রাণে তাহা সয় না। আমি বড়ই ব্যাকুল ও অস্থির হয়েছি; আজ আমাকে রক্ষা করুন। কাল প্রাতে লোক পাঠাইবেন, আমার বক্তব্য বলিব, আজ আমি একটু নির্জ্জনে থাকিব।

কালিকান্তের লোকে অগত্যা আর উপায় নাই দেখিয়া তাহাতেই সম্মত হইল, বলিল, মহাশয়, আমাদিগকে রক্ষা করা আপনার কাজ, যাহা হয় করিবেন।

হরিগোপাল বাবু চলিয়া গেলে, তিন পুত্রকে হাত করিবার জন্য কালিকান্তের লোক অনেক চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাদের হৃদয় আজও কোমল, আজও তেমন কঠোরতর হয় নাই; ধর্ম্মের যে জীবন্ত ছবি আজ তাহারা দেখিয়াছে, তাহাতে তাহাদের হৃদয় গলিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ পিতার বিরুদ্ধে চলিতে তাহাদের কোন মতেই ইচ্ছা হইল না। তাহারাও একবাক্যে বলিল, মহাশয়, কাল আসিবেন, যাহা হয়, হইবে।

কালিকান্তের লোক ভগ্নমনে অশ্বে উঠিয়া চরনগরে যাত্রা করিল। চরনগর মাদারিপুরের নদীর পাড়ে। এবার বর্ষায় কূল প্লাবিত হয় নাই, নদীর তীর ধরিয়া অশ্ব বেগে চলিল। রাত্রি দুই প্রহরের মধ্যে চরনগর পৌঁছিয়া সমস্ত কথা কালিকান্তকে বলিল। সমস্ত রাত্রি পরামর্শ চলিল। হরিগোপালকে বাদ দিয়া কি করা যায়, সেই রূপ চেষ্টাই হইতে লাগিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

এজাহার নয়, দুঃখের কাহিনী।

আড়িয়াল-খাঁ নদীতে বড় প্রখর স্রোত। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র ভারতবর্ষের দুই প্রধান নদী সম্মিলিত হইয়া গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার উৎপত্তি করিয়াছে;—এই বিবাহের প্রথম এবং প্রধান সন্তান ভুবনেশ্বর, তাহারই নামান্তর আড়িয়াল-খাঁ নদী। রাজনগরের রাজবল্লভের অতুল কীর্ত্তি ডুবাইয়া পদ্মা কীর্ত্তিনাশা উপাধি পাইয়াছে, মুখডোবার বাসুদেব-মন্দির ডুবাইয়া আড়িয়াল-খাঁ উপাধি পাইয়াছে বুঝি বা ভুবনেশ্বর। রাজনগরের বিগ্রহ সকল এখন পালং এবং মশু-

রার ভগ্নকুটীরে, খোলা ময়দানে ও কৃষকের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছেন ; মুখ-ডোবারবাসুদেব আশ্রয় লইয়াছেন,সাহেবের নীলকুঠীতে,—লোচনগঞ্জে। রাজ-বল্লভের বংশধরগণ আজ ফকীরের ন্যায় পর্ণকুটীরবাসী, বাসুদেবের পূজকগণ আজ খাটরার সরকারদিগের দ্বারে চির-ভিক্ষুক। অবস্থা দেখিলে পাষাণও বিগলিত হয়। দেবধামের দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ডুবাইয়া,রাজাকে ফকীর করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে ভিক্ষুক সাজাইয়া, সপুত্রে পদ্মা আজও মহাগৌরবে, মহা বেগে তরঙ্গ তুলিয়া, নিত্যানন্দে বিভোর, কাহাকেও কাঁদাইতেছে,কাহাকেও হাসাইতেছে। এক জনের ধন কাড়িয়া অন্যকে দিয়া কত রঙ্গেই ছুটিতেছে ! ফরিদপুর এবং ঢাকার অর্দ্ধেক মোকদ্দমা বুঝি বা পদ্মা এবং তাহার বংশধরগণ কর্ত্তৃক সূচিত। রঙ্গময়ী এত রঙ্গও জানে !!

আড়িয়াল-খাঁ নদীতে রাজার চর খুব প্রকাণ্ড। পদ্মা এবং আড়িয়াল-খাঁর কোন কোন চর এত বড় যে, দুই প্রহর, তিন প্রহর হাটিয়াও শেষ করা যায় না। আড়িয়াল-খাঁ নদীর রাজার চরটা খুব বড় ; বর্ষায় সকল স্থান প্লাবিত হয় না,গ্রাম সকল বহু দূরে দূরে। এবার বর্ষা আরো কম,এবার চরের অনেক স্থলেই জল নাই। প্রকাণ্ড মাঠ—দু-প্রহরেও পার হওয়া যায় না। কোন কোন স্থলে কিছু কিছু শস্য উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ যে যে স্থলে বর্ষার প্লাবন পৌঁছে, সেই সেই স্থলে কিছু কিছু শস্য হয়, কিন্তু অনেক স্থলেই অনন্ত বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে। বায়ু নিত্য নৃত্য করে, এই বালুকারাশির সহিত। আজও করিতেছে। এই চরের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে একখানি পান্‌সী লাগিয়াছে। পান্‌সী নদী উজাইয়া উত্তর দিকে যাইতেছিল, বায়ু আজ প্রতিকূল, উত্তর দিক হইতে বহিতেছে, স্রোত ত নিত্যই প্রতিকূল। গুণ টানিয়া টানিয়া মাঝীরা এখন ক্লান্ত হইয়াছে। উত্তরের প্রবল বায়ুতে দিক অন্ধকার করিয়া ধূলিরাশি উড়িতেছে, কাহার সাধ্য উত্তর দিকে যায় ? এই অবস্থায় রাজার চর পার হইতে পারিবে, মাঝীদের সাহসে কুলাইতেছে না। সূর্য্য বিষম তেজে পশ্চিমগগনে দাঁড়াইয়া এখনও তপ্তরশ্মি ছড়াইতেছেন। বায়ুর উল্লাস ক্রমেই বাড়িতেছে। নৌকা তীরে বাঁধা, তীব্রস্রোতে নৌকা কম্পিত হইতেছে,তরঙ্গে নৌকা আন্দোলিত হইতেছে। কোন ভদ্রলোক পরিবার লইয়া কলিকাতা যাইতেছেন,গোয়ালন্দে যাইয়া রেলে উঠিবেন। রাজার-চরটা আজ বড়ই বাধা দিতেছে, আর বাধা দিতেছে বায়ু, আর বাধা দিতেছে একটানা-স্রোত। রাজার চরে বড় দস্যুর ভয়, যদি প্রতিকূল বায়ু ও স্রোত ঠেলিয়া চর

পার হওয়া না যায়, তবে আসন্ন বিপদ—রাত্রিতে দস্যুর হস্তে প্রাণ যাইবে। আরোহীরা এই চিন্তা করিতেছেন। রমণী-মহলে,বালক-বালিকা-মহলে বমির ধুম পড়িয়াছে, নৌকার আন্দোলনে অনেকের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে,অনেকেই মাথা খাড়া করিতে পারিতেছে না। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে? নৌকায় কর্ত্তা মধুসূদনকে স্মরণ করিতেছেন ও ভাগ্যকে নিন্দা করিতেছেন এবং একান্ত বিরক্তির সহিত দেশের জমীদারের পিতৃকুল উদ্ধার করিতেছেন। এই সময়ে একখানি ছোট ষ্টিমার নদীর বক্ষে তরঙ্গ তুলিয়া,নদীকে যেন তুচ্ছ করিয়া, দুইখানি বজরাসহ, আকাশে ধূম উড়াইয়া, নৃত্য করিতে করিতে দক্ষিণ দিকে যাইতেছিল। ষ্টিমার খানি মধ্যে, দুই পার্শ্বে দুই খানি বজরা বাঁধা। যেখানে পান্সী লাগিয়াছে, সে স্থল ভাঙ্গন-কূল, সেখানেই স্রোত বেশী, সুতরাং সেখানেই জল বেশী। স্রোত উজাইতে না পারিয়াই পান্সীর বাহকেরা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। ষ্টিমার খানি ঐ তীব্র স্রোত ধরিয়াই যাইতেছিল। পান্সী দেখিয়া ষ্টিমারের সারঙ্গ জিজ্ঞাসা করিল, এ পান্সী কোথাকার?

পান্সী হইতে উত্তর হইল, বিধিকৃষ্ণপুরের।

সারঙ্গ।—পান্সী কোথায় যাইবে?

পান্সী হইতে উত্তর হইল, পান্সী গোয়ালন্দ যাইবে।

বিধিকৃষ্ণপুরের নাম শুনিবামাত্র জাহাজের গতি থামাইতে সারঙ্গ আদেশ প্রাপ্ত হইল। জাহাজ থামিল এবং পান্সীর নিকট লাগিল। আরোহীরা বিশেষতঃ মেয়েরা ভয়ে অস্থির হইলেন। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, "পুলিস সাহেবের নৌকা রে, কি সর্ব্বনাশ!"

ষ্টিমারের সাহেবগণ একটু গোপনে রহিলেন,একজন বাবু পান্সীর কর্ত্তাকে ষ্টিমারে ডাকিলেন। যমের হাত এড়ান যায়,তবুও পুলিস ও ম্যাজিষ্ট্রেটের হাত এড়ান যায় না; উপায়ান্তর নাই দেখিয়া পান্সীর কর্ত্তা ষ্টিমারে গমন করিলেন। নৌকার মেয়েরা হাহাকার করিতে লাগিল। পান্সীর কর্ত্তার সহিত ষ্টিমারের বাঙ্গালী বাবুর এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

বাঙ্গালী বাবু।—আপনি ভদ্রলোক, আমিও ভদ্রলোক, সত্য বলিতেছি, কোন ভয়ের কারণ নাই; আপনাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিব, ঠিক তাহার উত্তর দিবেন। সত্য কথা না বলিলে, কলিকাতা যাওয়া দূরের কথা, এখনই নৌকা ফিরাইয়া বিধিকৃষ্ণপুর যাইতে হইবে। এই ষ্টিমারে পুলিস সাহেব ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আছেন।

পান্সীর কর্ত্তা।—ভয়ের কোন কারণ নাই। এ যে পুলিস সাহেবের ষ্টিমার, তাহা জানি। আপনি জিজ্ঞাসা করুন, পৈতা ছুঁয়ে সপথ করিতেছি, সত্য বই একটীও মিথ্যা বলিব না।

বাঙ্গালী বাবু।—আপনার নাম কি?

পান্সীর কর্ত্তা।—আমার নাম নীলকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়।

বাঙ্গালী বাবু খাতায় সমস্ত কথা লিখিতে লাগিলেন।

বাঙ্গালী বাবু।—আপনার বাড়ী কোথায়?

নীলকান্ত।—বিধিকৃষ্ণপুর।

বাঙ্গালী বাবু।—বিধিকৃষ্ণপুরের তারানাথ গাঙ্গুলী ও হরিগোপাল দে জমীদারকে আপনি জানেন?

নীলকান্ত।—জানি।

বাঙ্গালী বাবু।—তাহারা কেমন লোক? উভয়ের সহিত ঝগড়া বিবাদ আছে কি?

নীলকান্ত।—তারানাথ দরিদ্র ব্যক্তি, হরিগোপাল বড় মানুষ, উভয়ের সহিত ঝগড়া বিবাদ থাকা সম্ভব কি? তারানাথ অতি সৎলোক বলিয়া সর্ব্ব সাধারণের নিকট পূজিত, হরিগোপাল ঘোরতর অত্যাচারী লোক। দুঃখী দরিদ্রকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন বলিয়া তারানাথ হরিগোপালের চক্ষের বিষ। তারানাথকে একদিনও হরিগোপালের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে বা কোন অন্যায় কাজ করিতে শুনি নাই বা দেখি নাই।

বাঙ্গালী বাবু।—আপনি সপরিবারে কোথায় চলিয়াছেন?

নীলকান্ত।—কলিকাতা চলিয়াছি।

বাঙ্গালী বাবু।—এই সময়ে আপনি কলিকাতা যাইতেছেন কেন? পূজা নিকটে আসিয়াছে, বিদেশ হইতে লোক বাড়ী আসিতেছে, আর আপনারা কলিকাতা যাইতেছেন, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য! কলিকাতা কি কাজে যাইতেছেন?

নীলকান্তের হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিল, এই পূজার সময় কোন্ বাঙ্গালী ঘর ছাড়িয়া বিদেশে যায়? নীলকান্তের চক্ষু হইতে দুই বিন্দু জল গড়াইয়া পড়িল। ভাব একটু সংবরণ করিয়া বলিলেন—"আমার ন্যায় দুঃখী আর পৃথিবীতে নাই, আমি নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তি, কুলীন ব্রাহ্মণ, ঘরে অনেক গুলি পোষ্য, ৩টী স্ত্রী, ৩টী মেয়ে এবং ৩টী পুত্র। তারানাথের কৃপায় কোন রূপে দিনপাত করিতাম। দিনান্তে নিশান্তে একবার খাইয়াও পরম

সুখে ছিলাম। এই দুর্ভিক্ষের বৎসর, লোকের আর দিনপাত হয় না। আমাদেরও দিনপাতে দারুণ কষ্ট ছিল, তবে তারানাথের কৃপায় কোন কষ্টই পাই নাই। কল্য রাত্রে তারানাথের সর্ব্বনাশ হয়ে গিয়াছে। ডেপুটী সাহেব কাল প্রাতে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে নিয়াছেন, রাত্রে কালিকান্তের ও হরিগোপালের অসংখ্য লাঠিয়াল বাড়ী বেষ্টন করে তাঁহার কন্যাকে অপহরণ করেছে। আজ প্রত্যুষ হইতে বেলা ১১টা পর্য্যন্ত বিধিকৃষ্ণপুরে অত্যাচারের ধুম চলিয়াছিল। তারানাথের অন্নে প্রতিপালিত যাহারা, তাহাদের সকলের ভিটা মাটী উচ্ছিন্ন করিয়া চাষ করিয়া শস্য বোনা হইয়াছে। আমরা নিরপরাধী, হরিগোপাল আমাদিগকে ২০০৲ টাকা ঘুষ দিতে চাহিয়াছিল, আমরা তাহা নেই নাই, এই অপরাধে আমাদের বাড়ী ভাঙ্গিয়া কুমারে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ভিটা চাষ করিয়া সর্ষপ ও মূলা বোনা হইয়াছে। মহাশয়, এ কষ্ট কি জীবনে সয়?

বলিতে বলিতে ভদ্র লোকের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল, দুনয়ন হইতে ধারাবাহী হইয়া জল পড়িতে লাগিল।

বাঙ্গালী বাবু বলিলেন, আপনি স্থির হয়ে সমস্ত বলুন, এ ত আর মগের মুল্লুক নয়, অবশ্যই প্রতিকার হবে, ভয় কি?

নীলকান্ত আবার বলিতে লাগিলেন—"আমাদের বাড়ী ঘর যখন নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হইল, তখন আমরা বৃক্ষতলকে সম্বল করিলাম, আর কোথায় যাইব? বেলা দু-প্রহরের পর তারানাথের স্ত্রী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা জগদম্বার ঘর হইতে বাহির হইলেন—দস্যু-লুণ্ঠনের পরই তিনি দেবী গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া অনেক লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। আমরাও গেলাম। তারানাথের বাড়ীর অন্নছত্রে প্রত্যহ শত শত লোক অন্ন পায়। আজও পাইয়াছে। আমরাও সেখানে অন্ন পাইলাম। স্ত্রীদিগের অলঙ্কার ও ঘটী বাটী পূর্ব্বেই বিক্রয় করে কয়টী টাকা সংগ্রহ করেছিলাম। আহারান্তে এই নৌকা ভাড়া করে রওয়ানা হইলাম, মুহূর্ত্তকাল আর গৃহশূন্য জন্মভূমিতে থাকতে ইচ্ছা হলো না। শুনেছি, কলিকাতা নিরন্নের উপায়, সেখানে যেয়ে দেখি, দিন কাটানের কোন উপায় হয় কি না! তাই কলিকাতা চলেছি।"

কথা বলিতে বলিতে নীলকান্তের দুনয়নে ধারা বহিতেছিল। সমস্ত কথা শুনে বাঙ্গালী বাবু অবাক্ হইলেন, পুলিসের কর্ম্ম করিলে কি হয়, মানুষ ত, তাঁহার চক্ষু হইতেও জল পড়িতে লাগিল। তিনি বলিলেন—"কলিকাতা যাইয়া কোথা

দাঁড়াইবেন? দীন দুঃখীর পক্ষে কলিকাতা যে মরুভূমি, কলিকাতা যে শ্মশান, তাহা কি জানেন না?”

নীলকান্ত।—সমস্ত বিক্রয় করে যে কয়টী টাকা পেয়েছি, রেল ভাড়া দিয়াও তাহার কিছু বাঁচিবে। শুনেছি সেখানে বিদ্যাসাগর নামে এক মহাত্মা আছেন, তিনি নিরুপায়ের উপায়। আর উপায় না পাই, তাঁহার আশ্রয়ে যাইব। আমার এক স্ত্রী খুব বুদ্ধিমতী, তিনি বেশ লেখা পড়া জানেন। তিনি শুনেছেন, কোন্ স্কুলে নাকি মেয়েরা ডাক্তারী শিখে এখন টাকা রোজগার কর্‌ছে। তিনি বলেন, তিনিও তাহাই শিখে আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। আমার আর এক স্ত্রী বলেছেন, তিনি ধাত্রী বিদ্যা শিখিবেন। আমার কোন বিদ্যা নাই, শেষ কালে স্ত্রীর রোজগারের উপরই নির্ভর কর্‌তে হবে! এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন।

বাঙ্গালী বাবু বলিলেন, ঐ দুই কাজের চেয়ে নীচ কাজ কি আর আছে? স্ত্রীর রোজগারের টাকা খাওয়ার চেয়ে মৃত্যু সহস্রগুণে ভাল। ভদ্র হিন্দু ঘরের কোন মেয়ে আজ পর্য্যন্ত ক্যাম্বেল স্কুলে বা মেডিকেল-কলেজ-হাসপাতালে ডাক্তারী বা ধাত্রী বিদ্যা শিখিতে যায় নাই; বেশ্যার দল গিয়াছে, অনেক ভদ্র লোকের উপপত্নী গিয়াছে, আর অলস, অপটু, দরিদ্র ও অকর্ম্মা ফিরিঙ্গি ও ব্রাহ্মদের মেয়ে ও স্ত্রী গিয়াছে, কোন হিন্দু সৎ বংশের মেয়ে এই কাজে আজ পর্য্যন্ত যায় নাই। মহাশয়, আপনি কখনও এই জঘন্য কাজে কুল-লক্ষ্মীদিগকে পাঠাইবেন না; যদি পাঠান, শেষে মান মর্য্যাদা রাখিয়া চলা দায় হইবে। বাজারে, দশের দ্বারে মেয়েদিগকে প্রেরণ করা, ছার অর্থের জন্য, কখনই উচিত নয়। এদেশের লোক এখনও রমণীর মর্য্যাদা শিখে নাই। রমণীদিগকে কুটিল চক্ষে দেখাই বড় ছোট সকলের কাজ। মেয়েরা যেন এ দেশে রিপু-সেবার দাসী। এই হতভাগ্য দেশে, মহাশয়, মেয়েদিগকে টাকা রোজগার করিতে কখনও বাড়ী বাড়ী পাঠাইবেন না। প্রত্যাবৃত্ত হউন। দেশে চলুন, তারানাথ গাঙ্গুলী, শুনিয়াছি, বড়ই পরদুঃখকাতর ব্যক্তি, তিনি শুনিলে কখনও আপনাকে বন্ধুহীন দেশে যাইতে দিবেন না। ছি, জন্মভূমি কি ছাড়্‌তে আছে? অতি দুঃখে এই সকল কথা মহাশয়কে বলিলাম, মহাশয় আমার কথা শুনুন।

সকল কথা শুনিয়া নীলকান্তের প্রাণটা আকুল হইল, ভদ্র-ঘরে জন্ম গ্রহণ করে শেষে পিতা মাতার নাম ডুবাব, যাহা কেহ করে নাই, তাহা কর্‌বো? এই কথা ভাবিয়া বলিলেন—“মহাশয়, শুনেছি, অনেক মহিলা অতি সম্মানের

সহিত এই কাজ করে, দশ জনের মধ্যে একজন হয়ে মহানন্দে ও মহাসুখে আছে। আপনি এই কাজকে এত নিন্দা করেন কেন? আমরা বড় আশায় বুক বেঁধে কলিকাতায় চলেছিলাম, আপনার কথায় প্রাণটা দ'মেছে।'

বাঙ্গালী বাবু।—মহাশয় আমার বাড়ী ঐ কল্‌কাতায়—ভাল মন্দ সকলই জানি। সে সম্মানের কথা মনে করিলে দুঃখে আমার প্রাণ অস্থির হয়। আপনি সকল সংবাদ রাখেন কি? দেশের রুচি এমন, তাঁহাদিগকে ঘৃণা না করেন, এমন লোক বিরল। ভাল মন্দ, সৎ অসৎ সকলের একদর, হাটে বাজারে, পথে ঘাটে তাঁহাদের নিন্দা। নিন্দার বোঝা যে কাজে মাথায় বহিতে হয়, তাহা কি করতে আছে? দায়ে পড়ে, ধাত্রীকে মানুষেরা ডাকে সত্য,কিন্তু ঘৃণা করে পনের আনা লোক। তাঁদের স্বামী গুলো কি অপদার্থ, একবার ভাবুন ত? নিজেরা বাবুগিরি করে অলস হয়ে বসে থাক্‌বেন, আর সন্তান-ধারণ, সন্তান-পালন ও গৃহকার্য্য রূপ মহারাজ্য যাঁহাদের জীবনের উপর নির্ভর করে, তাঁহারা স্বাস্থ্য ডুবাইয়া, ঘৃণিত ন্যক্কারজনক কাজ করিয়া, দশজনের উপহাস, ঘৃণা, অপমান ও অসম্মান মাথায় বহিয়া টাকা আনিয়া দিবেন, সেই টাকায় নবাবী কর্‌তে হবে!! ছি ছি, ছি, এই কুদৃষ্টান্ত কখনও অনুকরণ কর্‌বেন না। সমাজকে অধঃপাতে দিবার ইহা একটী সুন্দর উপায়। ইহার চেয়ে থিয়েটারে স্ত্রী নাচাইয়া খাওয়াও সহস্র গুণে ভাল। চন্দ্র, সূর্য্য অস্ত গেল, এখন জোনাকীর আলোকের ভরসা! নিজেরা করিলেন ঢের, এখন স্ত্রী হলেন ভরসা, হায়রে নবাবী!! খাল কাটিয়া কে লোণা জল বাড়ীতে আনে, বলুন ত? সতী সাধ্বীদিগের রাজ্যে তাঁহারা রাজ্ঞী, সম্রাজ্ঞী হইয়া থাকুন, কর্ম্মবিভাগে পুরুষ খাটিয়া টাকা রোজগার করুক। স্ত্রী টাকাও রোজগার করিবেন, সন্তান ধারণ ও সন্তান পালনও করিবেন, আর বাবুগণ করিবেন কেবল গোমস্তাগিরি! ছি, ছি, এমন কথাও মুখে আন্‌বেন না। চলুন বাড়ীতে। আমরা একটা উপায় করে দিব।

নীলকান্তের মনের উপর দিয়া একটা প্রবল বন্যা যেন বহিয়া গেল,আশার ছোট ছোট অনেকগুলি অঙ্কুর গজাইতেছিল, সে সকলকে বন্যায় একেবারে নির্ম্মূল করিল। বলিলেন, তবে আমার পক্ষে ভিক্ষা করা কি ভাল?

বাঙ্গালী বাবু বলিলেন, তাহাও ভাল। যার আর কোন উপায় নাই, অতি ঘৃণিত ভিক্ষাবৃত্তিও তার পক্ষে ভাল। তবুও মেয়েদিগকে ধাত্রী ইত্যাদি কার্য্যে পাঠাইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা ভাল নয়। দুর্নীতি ও প্রলোভনে পড়ার

উহা একটা প্রশস্ত উপায় মাত্র। এ সকল চিন্তা মন হইতে তুলিয়া ফেলুন, আবার বিধিকৃষ্ণপুরের কথা, আপনার পিতৃভূমির কথা, আপনার জন্মভূমির কথা ভাবুন। কলিকাতা কেন মরিতে যাইবেন? সোণার পরিবার ছারখার হইয়া যাইবে, স্ত্রী ও মেয়ে কয়টী হারাইয়া শেষে হাহাকার করিবেন। কথা শুনুন, বাড়ীতে চলুন। আচ্ছা মহাশয়, জিজ্ঞাসা করি, তারানাথের মেয়ের স্বভাব কেমন?

নীলকান্ত।—তার ন্যায় মেয়ে এদেশে আর নাই, রূপে গুণে যেন লক্ষ্মী, এমন সচ্চরিত্রা মেয়ে এদেশে আর নাই। শত্রুরাও বলিবে যে, পুণ্যপ্রভা দেবী বিশেষ।

বাঙ্গালী বাবু।—দীপ্তি নামে কোন একটী মেয়ে আছে জানেন কি? তাহার কি হয়েছে?

নীলকান্ত।—দীপ্তিকে বিশেষরূপে জানি। সেও বড় ভাল মেয়ে, তারানাথের মেয়ের সখী। কাল দস্যুদের হাতে তাহার দেহ ক্ষত বিক্ষত হয়েছে, সে মেয়ে বাঁচিবে বলিয়া মনে হয় না। তাহাকে দেখিলে পাষাণও ফেটে যায়।

বাঙ্গালী বাবু।—মাদারিপুরের পুলিসে কি এজাহার দেওয়া হয়েছিল?

নীলকান্ত।—কাল রাত্রেই এজাহার দেওয়া হয়েছে এবং ফরিদপুরেও লোক গিয়াছে, মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই কি? কিন্তু হলে কি হয়, রূপচাঁদের মায়ার হাত এড়ান বড়ই শক্ত। মাদারিপুরের পুলিস ত পুলিস, কত কত ভদ্রাভদ্র লোক টাকায় ভুলেছে, কে সংখ্যা কর্‌তে পারে? আমি দরিদ্র, কিন্তু আজও ধর্ম্ম ছাড়্‌তে পারি নাই, বিশেষতঃ আমার গুণবতী ভার্য্যা কিছুতেই ধর্ম্ম বিক্রয় কর্‌তে দিবেন না। মাদারিপুরের পুলিস, ডেপুটী, সব টাকার বশ। একজন কনেষ্টবলও বিধিকৃষ্ণপুরে দেখিয়া আসি নাই। এমনই চক্রান্ত! যাহারা টাকায় ভুলে নাই, তাহারা প্রহারে ভুলেছে। যাহারা প্রহারেও ভুলে নাই—তাহাদের দশা আমার ন্যায় হয়েছে। বলিব কি, এমন অরাজকতা আর কখনও দেখি নাই। মগের মল্লুকেও এরূপ অত্যাচার কখনও হয় নাই।

বাঙ্গালী বাবু বলিলেন, বিধিকৃষ্ণপুরের লোকেরা আজ প্রাতেই ফরিদপুর পৌঁছিয়াছিল, তাহাদের এজাহার অনুসারেই আমরা চলেছি, মাদারিপুরে যে চক্রান্ত চলেছে, তাহাও শুনেছি। সেই জন্যই এত আয়োজন করে চলেছি। কালীকান্তকে আপনি জানেন?

নীলকান্ত।—জানিব না কেন? সে দিনও তারানাথের কলিকাতার বাসায় সে ভাত মারিত। আজ সে সহস্রপতি, লক্ষপতি, আজ সে নবাব সেরাজদ্দৌলা, আজ সে দিল্লির বাদসাহ! নরহত্যায়, ব্যভিচারে, মদ্যপানে,

পরস্ত্রী-হরণে, পরধন-লুণ্ঠনে আজ সে বড় লোক! হা ধর্ম্ম, এমন লোকের হাতেও ধন পড়ে!! তারানাথ আজ ঘটী বাটী বিক্রয় করে, আর কালিকান্ত আজ গাড়ী ঘোড়া হাঁকায়! হা ধর্ম্ম, কলিকালে তোমার এই কীর্ত্তি!

নীলকান্ত দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন এবং বলিলেন, অনেক সময় গেল, এখন আমাকে কি আদেশ করেন?

বাঙ্গালীবাবু।—আজ আর আপনার গোয়ালন্দ যেয়ে কাজ নাই; আমাদের সহিত চরনগরে ও বিধিকৃষ্ণপুর আজ চলুন। নৌকা বিদায় দিয়া আমাদের সঙ্গেই থাকিবেন। তারপর তারানাথের সহিত পরামর্শ করুন। শেষে কর্ত্তব্য ঠিক করিবেন। এই কথা বলিয়া বাঙ্গালী বাবু কক্ষান্তরে পরামর্শ করিতে গেলেন, বলিয়া গেলেন, আপনিও আপনার গুণবতী ভার্য্যার সহিত পরামর্শ করিয়া আসুন।

নীলকান্ত নৌকায় যাইয়া সমস্ত কথা বলিলেন। বাঙ্গালীবাবু কক্ষান্তরে যাইয়া সমস্ত অবস্থা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিস সাহেবকে বলিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিস সাহেব একবাক্যে আদেশ দিলেন "ওস্কো ছোড় মৎ।" বাঙ্গালী বাবু কক্ষের বাহিরে আসিয়া নীলকান্ত বাবুকে ডাকিলেন। নীলকান্ত বাবু আসিলে বলিলেন—"কি পরামর্শ ঠিক করিলেন?"

নীলকান্ত।—আপনাদের আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিব না, যাহা বলিবেন, তাহাই করিব। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, প্রাণে মারা না যাই, দেখিবেন।

বাঙ্গালী বাবু আদেশ করিলে, সারঙ্গ পান্‌সা খানি ষ্টিমারের সহিত বাঁধিয়া লইয়া ষ্টিমারের কল টিপিয়া দিল, ষ্টিমার ধুম উদ্গীরণ করিতে করিতে নদীস্থিত নৌকা আন্দোলিত করিতে করিতে দক্ষিণ দিকে তীরবেগে ছুটিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

দেবী পুণ্যপ্রভার সমর সজ্জা।

সকল দিকের কথাই কিছু কিছু বলা হইল, এখন পুণ্যপ্রভার পুণ্যকাহিনী শুনিতে পাঠক একটু স্থির হইয়া বসুন। কালিকান্তের সাধের তরণী,—বাল্যের স্বপ্ন, যৌবনের কামনা, জীবনের সকল আশা ভরসা যে পুণ্যপ্রভা, তাহার পুণ্যকাহিনী শুনিবার সময় পবিত্র-চিত্ত হইয়া বসিতে হয়। আমরা

বিধাতার নাম স্মরণ পূর্ব্বক সরলা, সরলা নয়, উজ্জলা, উজ্জলা নয় বিহ্বলা, বিহ্বলা নয় প্রেমোন্মত্তার কথা কিছু কিছু করিয়া বিবৃত করি। আকাশ হইতে লেখনীর উপর পুষ্প-চন্দন বর্ষিত হউক।

যখন দীপ্তি দস্যুদিগের সহিত বাদ প্রতিবাদ করিতেছিলেন, তখন পুণ্যপ্রভা একটী কথাও বলেন নাই। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, পুণ্যপ্রভা বুঝিয়াছিলেন, এত লোকের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া বৃথা; কৌশল খাটিবে না, বুদ্ধি খাটিবে না, বল খাটিবে না, তবে নীরব না হইয়া বৃথা বাক্যব্যয়ে লাভ কি? পুণ্যপ্রভা মৌনাবলম্বন করিয়া ভবিষ্যতে যাহা যাহা করিবেন, তাহা ভাবিতেছিলেন, আর ভাবিতেছিলেন, একান্তমনে জগদম্বাকে। তিনি ফরাশীদেশের জেনীর নির্ভীকচিত্ততা, অকুতোভয়তা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব জগদম্বার নিকট বিনীত হৃদয়ে ভিক্ষা করিতেছিলেন। পুণ্যপ্রভার পৃষ্ঠদেশ ছাইয়া চুল পড়িয়াছে, হাতে দুগাছী পিত্তলের বালা, আর সর্ব্বাঙ্গে ফুল। দীপ্তিকে বাসর-ঘরের উপযোগী করিয়া পুণ্যপ্রভা সাজাইয়াছিলেন, পুণ্যপ্রভাকে, কি জানি কেন,দীপ্তিও ফুল দিয়া অপরূপ সাজে সাজাইয়াছিলেন। আজ বাসর-ঘরে চলিয়াছেন কে,ইতিহাস সাক্ষ্য দিতে রহিলেন। বাসর-ঘরে, না অসুর-দলনে?—এ বিবাহ-যাত্রা, না দানব-দলন যাত্রা? এ কামনা-চরিতার্থের যাত্রা, না আসক্তি-নির্ব্বাণের যাত্রা? এ মহা সম্মিলনের, না মহা বিচ্ছেদের যাত্রা? পুণ্যপ্রভা কেবল তাহাই ভাবিতেছিলেন। পুণ্যপ্রভা মনে মনে বলিতেছিলেন, "সৎসাহস, তুই আজ আমার কাছে আয়, পিতৃদত্ত বলে আমাকে বলীয়ান কর্। আমি মানুষকে ডরাইব? আমি কাপুরুষের ন্যায় কুল ডুবাইব? তা হইবে না, সৎসাহস, তুই আমার সর্ব্বাঙ্গে তোর স্বর্গীয় বাতাস লাগাইয়া এমন করে দে, ভয়, লজ্জা, কাপুরুষতা সব আজ চলে যা'ক। যে দেশে রিপুর বাতি জ্বালাইয়া মানুষ দগ্ধ হইতেছে, ভয়, লজ্জা, কাপুরুষতা আজ সেই রাজ্যে চলে যা'ক। আমার দুই পায়ে ভর দিয়া আজ একবার দাঁড়া, আমি তোকে ধরিয়া সেই রাজ্যে চলে যাই, সেখানে মানুষের অসাধ্য কোন কাজ নাই। দুঃখীর একমাত্র বল তুই, দরিদ্রের একমাত্র সম্বল তুই, মা জগদম্বার একমাত্র পুণ্য-আশীর্ব্বাদ তুই। দাঁড়া আজ আমার হৃদয়ে, প্রবৃত্তি, আসক্তি, রিপু, সব আজ নিবে যা'ক, বাসনা, কামনা, সুখেচ্ছা আজ কুমারে ভেসে যাক্; তুই আমাকে আজ একবার ধরে দাঁড়া, আমি পিতার বিচ্ছেদ, মাতার অদর্শন-কষ্ট ভুলি, এই বিপদে তাঁহারা অনেক

দূর, কেহ ত কাছে নাই! তাঁহাদের অঞ্চলের ধন আজ দস্যু কেড়ে নেয়, রক্ষা করার লোক নাই! যদি আকাশ ফাটাইয়া কাঁদি, দীপ্তি ভিন্ন আজ আর শুন্‌বার লোক নাই। দেব-দেশের দেবশিশু, তুই একবার আমাকে স্বর্গীয় শক্তিতে মাতাইয়া তোল। তোর নিত্য সহচর পুণ্যবল আজ কোথায়? ডাক্, তাকে ডেকে আন। তোর সহচর পবিত্রতা আজ কোথায়, ডাক, তাকে ডাক্। তোর ভৃত্য দুর্জ্জয় চরিত্র-বল কোথায়, এই অসময়ে, এই মহা বিপদে তাকে ডেকে আন্। তোর আশ্রয়ে যে শুভবুদ্ধির বসতি, তাকে আজ সঙ্গে নিয়ে আয়। মা জগদম্বার আদেশ, পুণ্যময়ী মাতৃদেবীর আদেশ, চির আরাধ্য পিতৃ দেবের আদেশ—আমি পাপ-সংগ্রামে প্রাণে না মরি। আমার সহায় সম্বল ত আর কিছুই নাই, তুই আমার হৃদয় মনকে পূর্ণ করে আজ দাঁড়া। আমি সংসার ভুলি, রিপু ভুলি, প্রলোভন ভুলি, মায়া ভুলি, আসক্তি ভুলি, কামনা ভুলি। আজ আমি তোর সাহায্যে শাক্যমুনি হই, এই কুমার আজ নিরঞ্জনা-তট হউক। যে রূপ রূপ করে জগৎ মত্ত হয়, সৎসাহস, আমার সেই রূপে তুই আজ কালী ঢেলে দে। যে সুখ সুখ করে মানুষ বিষয় মদে উন্মত্ত, সৎসাহস, তুই সে সুখে আমার বিষ ঢেলে দে। আজ তোর সাহায্যে আমি কামনা-বর্জ্জিত মহা যোগিনী হই, আমি তোর সাহায্যে আজ সংসার-বিজয়ী সন্ন্যাসিনী সাজি। আয়, আয়, কাছে আয়, কিসের ভয়? এই অস্ত্রহীনা, রূপহীনা, যৌবনহীনা, সুখহীনা, কামনাহীনা, রিপুহীনার কাছে আসিতে কিসের ভয়? আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি পিতা মাতার নাম ডুবাইব না। আমাকে ধর, আমি তোর নামে কলঙ্ক আনিব না। আমি ইন্দ্রিয় জয়ে, রিপু জয়ে সমর্থ হইব না বলে ভয় পাচ্ছিস্? মিথ্যা তোর ভয়। আমি ভূত মানি না, অন্ধকার মানি না, ব্রহ্মদৈত্য মানি না, কিছু মানি না ছেলে বেলা থেকে, আজ আমি দশ জন, বিশ জন, নয় দুশত জন, নয় দুই সহস্র জন দস্যু দেখে ডরাইব? কথনই না। মিথ্যা তোর ভয়। সপুত্র হরিগোপালের দল আমার নিকট পরাস্ত হয়েছে, এই বিধিকৃষ্ণপুরে দিনে রাত্রে আমি বেড়াই, কেহ আমাকে স্পর্শ করিতে সাহস করে না, দুটা ঠাট্টা করিতেও সাহস পায় না, আমি মা জগদম্বার কৃপায় কাহাকেও কোন দিন ডরাই নাই। তোর ভয় মিথ্যা নয় কি? আমি প্রজ্জ্বলিত আগুনের শিখায় হাত দিতে, ফণাধারী সর্প ধরিতে, তরঙ্গায়িত কুমারে সাঁতার দিতে একদিনও ডরাই নাই, আমাকে কত জন পরীক্ষা করেছে। মা জগদম্বার কৃপায় আমি সকল পরীক্ষায় জয়ী হয়েছি। আর

পুণ্যপ্রভা বলিলেন, "আমাকে একখানি আমগাছের ডাল কেটে দে এবং কতকগুলি পাতা এনে দে।" বেহারারা তাহা করিল। পুণ্যপ্রভা ডাল খানি ভাল করিয়া মাটীতে পুতিলেন এবং গ্রামের ও গৃহস্থের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন। পাল্কী আবার চলিল। এবার রাস্তায় যাইবার সময় চিড়া ও ফুলের সহিত পাতা ফেলিতে ফেলিতে পুণ্যপ্রভা চলিলেন।

এবার যে স্থানে বেহারা বদ্‌লি হইল, সেখানে আবার পুণ্যপ্রভা নামিলেন। মাথা হইতে কতকগুলি চুল ছিঁড়িয়া রাখিয়াছিলেন, এবার এক গৃহস্থের ঘরের চালের কোণে তাহা বাঁধিয়া রাখিলেন। ঘাটের কাজ শেষ করিয়া আবার পুণ্যপ্রভা পাল্কীতে উঠিলেন এবং পাতা, ছিন্নবস্ত্র ইত্যাদি ফেলিতে ফেলিতে চলিলেন। এইপথে এইবার একটী ক্ষুদ্র নদীপার হইতে হইবে। পাল্কী হইতে অবতরণ করিয়া পুণ্যপ্রভা নৌকায় উঠিলেন। বস্ত্রের একফালা ছিঁড়িয়া, নৌকায় যে কাঠের উপর বসিতে হয়, তাহাতে বাঁধিয়া রাখিলেন। তারপর চরনগর ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, বেহারাও লাঠিয়ালদের আনন্দের আর সীমা নাই। সকলে নৈশ গগন কাঁপাইয়া "রাজা কাসিকান্তের জয়" হাঁকিতে হাঁকিতে চলিতে লাগিল।

চরনগরে ইতিপূর্ব্বেই সংবাদ পৌছিয়াছে যে, কন্যা আসিতেছে। চরনগরে মহা আনন্দের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। রাস্তায় আলো, বাগানে আলো, পুকুরের ধারে আলো। দুই মাইল পর্য্যন্ত আলো জ্বলিতেছে। এবার যে বাড়ীতে পাল্‌কী আসিল, সে বাড়ীতে বিশেষ ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। বাড়ীর মেয়েরা দলে দলে কন্যা দেখিতে আসিতে লাগিল। কন্যার মুখে আনন্দ মাত্রেই নাই, যেন বিষাদের গাঢ় কালিমা দেখিয়া অনেকেরই ভাল লাগিল না; তবে পুণ্যপ্রভার রূপ দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করিতে লাগিল। এই বাড়ীতে নামাইয়া পুণ্যপ্রভার বেশ পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করা হইল। পুণ্যপ্রভা একটী যুবতীকে ডাকিয়া বলিলেন, দুই দিন আমার ঋতু হইয়াছে, স্নানের পূর্ব্বে বস্ত্র পরিবর্ত্তনের নিয়ম নাই, জান ত আমি কুলীন কন্যা। যুবতী সকলকে ঐ কথা বলিল। সকলে কাণাকাণি করিতে লাগিল, ঋতুর মধ্যে কিরূপে বিয়ে হবে? কিন্তু সে কথা শুনে কে? পুণ্যপ্রভা বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলেন না। যে পুরোহিত উপস্থিত ছিলেন, তিনি ব্যবস্থা দিলেন, গঙ্গাজল দিলে সকলই শুদ্ধ হইবে, কন্যা কাপড় না ছাড়ে, ক্ষতি নাই। অলঙ্কার পরাইবার জন্য তারপর বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা হইতে লাগিল। পুণ্যপ্রভা

বলিলেন, "আমার পিতৃকুলে পিত্তলের বালা ভিন্ন আর কোন অলঙ্কার পরার নিয়ম নাই, যে পরে, সে-ই বিধবা হয়। আমি বিধবার বেশ ধারণ করিব না।" একথার পর আর কে কি বলিবে? সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, "দরিদ্রের মেয়ে এসব কোথায় দেখ্‌বে? লক্ষ টাকার অলঙ্কার আজ রাণী তুচ্ছ কর্‌লেন! হায়রে কপাল!!" কোন এক বুদ্ধিমতী বলিল, "প্রয়োজনই বা কি, মেয়ের যে রূপ, কোন্ গয়েনা এ রূপের শোভা বাড়াতে পারে। রূপ ত রূপ নয়, জগৎ উজলা রূপগো।"

একজন বলিল, এই কন্যা ঘরে গেলে,রাজাবাবুর পূর্ব্বের স্ত্রীর আর আদর থাকবে না।

আর এক জন বলিল, তবে যে শুনেছিলাম, এই মেয়ে তার দাসী করবার জন্য আনা হয়েছে, সে কথা কি মিথ্যে?

একজন বলিল, এ মেয়েকে আর দাসী করতে হবে না! মেয়ের দাস হইবেন "রাজাবাবু।" শ্রীরাধিকার রাঙ্গা পায়ে কত কৃষ্ণচূড়া গড়াগড়ি যায়, জান নাকি? মেয়ে যেন সোণার প্রতিমা। ঠিক যেন গৌরবিনী, মানিনী শ্রীরাধিকা আর কি।"

সমালোচনার হাট আজ রাত্রেই বসিয়া গিয়াছে! স্ত্রীমহলে কালাকাল বিচার নাই, অবসর পাইলেই হয়,তা রাত্রি বা জানে কে, দিন বা জানে কে? মেয়ে সাজান যাহা হইল, পাঠক বুঝিলেন। কেবল সমালোচনাই চলিতে লাগিল। রাত্রি অধিক হয়,লগ্ন চলিয়া যায় বলিয়া পুরোহিত তাগাদা করিতে লাগিলেন। কোন বুদ্ধিমতী মেয়ে বলিয়া উঠিলেন "ঠাকুরের সব হিসাব আছেগো, যেমন মাস, তেমন বার, তেমনই লগ্ন!! পুরোহিত না যেন গাধার সর্দ্দার গো, কেবল বুঝেন, টাকা, টাকা, টাকা; শাস্ত্র ও পঞ্জিকা গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিয়াছেন, গলায় বেঁধেছেন দড়ি! এবার কলসি বেঁধে দিলেই সাজে ভাল গো।"

রাত্রি অধিক হইতেছে ত বটেই,অন্যান্য মেয়েরা বলিয়া উঠিলেন। সাজান ত কিছুই হলো না, না হউক, মেয়ে রূপে চতুর্দ্দিক্ উজ্জ্বল করেছে, এই কথা বলিয়া সকলে উলুধ্বনির সহিত কন্যাকে পাল্কীতে তুলিয়া দিলেন। পুণ্যপ্রভা এক হস্তের বালা খুলিয়া ইতিমধ্যে ঐ বাড়ীর এক গোপনীয় স্থানে রাখিয়া দিয়াছেন। পাল্কী এবার খুব সজ্জিত হইয়াছে। পাল্কীর চতুর্দ্দিকে আলো জ্বলিতেছে, লাল মক্মলের ঢাকনি সমস্ত পাল্কীকে আবৃত করিয়াছে।

বেহারাগণ এবার সুন্দর সুন্দর পোষাকে সজ্জিত হইয়াছে। আর একমাইল পরে চরনগর। বাদ্যের দল আসিয়া মহা উৎসাহে সানাই, ঢোল, নাগরা বাজাইতে লাগিল, বাজিকরগণ আকাশ বিদীর্ণ করিয়া বাজি ছুড়িতে লাগিল। মহা আনন্দ ও ধুমধামের মধ্যে সোণার প্রতিমা পুণ্যপ্রভা চরনগরে নীতা হইলেন। গ্রন্থকার বলেন, পুণ্যপ্রভা যে পথ দিয়া গেলেন, সে পথে অনন্ত-কাল পুণ্য-সংস্থাপনকারী দেবতারা শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বাসর-ঘরে পুণ্যের আবির্ভাব।

সানন্দে, সবাদ্যে, সহাস্যে, সপুষ্পে কন্যাকে বরণ করিয়া বিবাহ-মণ্ডপে লইয়া যাওয়া হইল। কালিকান্ত মণ্ডপে যথা সময়ে আগমন করিলেন। পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, যথারীতি সাত পাক ও শুভদৃষ্টি হইল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পরিণয় কার্য্য সমাধা হইল। অনুষ্ঠানাদি অন্তে কন্যা বাসর-ঘরে নীতা হইলেন। এ বিবাহে উপবাসের প্রয়োজন হইল না, আয়ুর্ব্বৃদ্ধ্যন্নের প্রয়োজন হইল না, অধিবাসের প্রয়োজন হইল না, পার্ব্বণের প্রয়োজন হইল না, কিছুই প্রয়োজন হইল না। সমাজের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়, একটা কিছু অনুষ্ঠান করা চাই ত? ইহার নামই বিবাহ!! মুসলমানের নিকা, বৈষ্ণবের মালা-বদল, সাঁওতাল ও কোলদিগের কপালে সিঁদুর দেওয়া প্রথা বুঝি বা ইহাপেক্ষা অনেক ভাল।

বিবাহান্তে কালিকান্ত পরম আনন্দে বাসর-ঘরে প্রবেশ করিলেন। এত কালের মনোবাঞ্ছা আজ পূর্ণ হইয়াছে, তাঁহার হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না। আজ সমস্ত পৃথিবীটা যেন আনন্দময় হইয়া গিয়াছে। তিনি আইন, আদালত, পুলিস,গবর্ণমেণ্ট সব ভুলিয়াছেন। তিনি আজ মত্ত মাতঙ্গ; তিনি পুণ্যপ্রভার জগৎ-উজলা রূপে আত্মহারা হইয়াছেন। কালিকান্তকে আজ আর পায় কে, স্বর্গ আজ তাঁহার ঘরে অবতীর্ণ। মরি, মরি, মরিরে! কি বাহার!!

বাসর-ঘরের শোভা বর্ণনা করিবার শক্তি দরিদ্র গ্রন্থকারের নাই। বাড়ীর মধ্যে যে ঘরটী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, সেই ঘরটী বাছিয়া লওয়া হইয়াছে। ঘর বাছিবার সময় কতবার কালিকান্ত ভাবিয়াছেন, "এই ঘর কি সেই দেবীর যোগ্য হইবে? সে যে সোণার প্রতিমা, সে যে রূপের অমিয়া, সে যে ফুলের

সুষমা, সে যে চাঁদের মধুরিমা—এ ঘর কি তাঁহার পছন্দ হইবে? না—এ ঘর না।” এইরূপ ভাবিয়া এক ঘর পরিত্যাগ করিয়া আর একঘর, তারপর আর একঘর—কোন ঘরই কালিকান্তের পছন্দমত হয় না। শেষে যে ঘরটা বাছিয়া লওয়া হইয়াছে, সে ঘরও ঠিক মনোমত হয় নাই, কোনরূপে পিত্তরক্ষা গোছের পছন্দ হইয়াছে। বাড়ীতে যত বহু মূল্যের সাজ-সজ্জা ছিল, সকল বাহির করিয়া ঘর সাজান হইয়াছে,—একবার সাজান হইয়াছে, আবার ভাঙ্গা হইয়াছে—বহুবার পছন্দ-সই হয় নাই। তারপর এইরূপ সাজ হইয়াছে। স্বর্ণখচিত রূপার পালঙ্গে মখমলের গদি, তাতে সাঁচ্চা জরি ও সাটিনের কাজ, ঢাকাই মস্‌লিনের মশারি, তাতে সাটিনের ঝালর, তাহার চতুর্দ্দিকে সদ্য-প্রস্ফুটিত গোলাপ-গুচ্ছ। তাহাতে উৎকৃষ্ট আতর ও গোলাপ জল মাখা। মশারির মধ্যে একখানি টানা পাখা ঝুলিতেছে; উৎকৃষ্ট মখমলে তাহা মোড়া, জরির অপূর্ব্ব কাজে সজ্জিত। পালঙ্গের সম্মুখে রূপার পিকদানি, পালঙ্গের পার্শ্বে সোণার ডিবায় গোলাপী খিলি। গৃহটী সুন্দর ২ ফুলে ও পাতায় এবং জরির কাজওয়ালা মখমলে একেবারে মোড়া। ঘরে উৎকৃষ্ট কারপেটের ম্যাটিং করা। প্রতি দেওয়ালে একটী করিয়া ডবল দেওয়াল-গিরি, তার নীচে ছবি, তার উপরে পুষ্পগুচ্ছ অপূর্ব্ব ভাবে সজ্জিত, তার উপরে আবার বড় ছবি। প্রতি দরজার খিলান হইতে বিবিধ শিল্পকার্য্যপূর্ণ বহুমূল্যের বস্ত্র দরজার দুই ধারে ঝুলাইয়া পিন মারিয়া দেওয়া হইয়াছে। এক কোণে হাতির দাঁতের একখানি ছোট টেবেল, তার উপর সুন্দর একখানি আয়না। একখানি মেহগনির চেয়ার, তার ধারে একখানি মেহগনির কোচ। কোচখানি সাটিন ও মখমলে মোড়া। হাতির দাঁতের টেবেলটীর এক পার্শ্বে একটী মেহ-গনি কাষ্ঠের বহুমূল্যের আলমারি, তার এক পার্শ্বে আবলুস কাঠে হাতির দাঁতের কাজ করা একটী গ্লাস-কেশ। টেবেলে সাজান একপার্শ্বে বহুমূল্যের আয়না চিরুণী, মধ্যে কলমদানিতে সোণার দোয়াত কলম, অন্য পার্শ্বে কয়েকখানি সুন্দর বাঁধান পুস্তক ও কাগজাদি। তাহার মধ্যে বহুমূল্যের হীরক-মুক্তা-মণ্ডিত বহু বাছা বাছা অলঙ্কারাদি সজ্জিত। তাহা ভিন্ন বহুমূল্যের বোম্বাই সাড়ী, বারাণসী সাড়ী, কেরেপের সাড়ী, সাঁচ্চাজরির কাজ করা বহুমূল্যের বডি জ্যাকেট অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত। এই একখানি ঘর সাজাইতে বুঝি বা লক্ষ টাকা লাগিয়াছে। কালিকান্তের তবুও মন উঠে নাই। মনে হইতেছে, বুঝি বা এ কিছুই পুণ্যপ্রভার যোগ্য হয় নাই। পুণ্যপ্রভার সৌন্দর্য্য তাঁহার হৃদয়কে এমন অধিকার করিয়াছে যে, পুণ্যপ্রভার যোগ্য বুঝিবা এই পৃথিবীতে কিছুই

নাই। হায় রে অনুরাগ !! তাঁহার মনে হইতেছে, সুবর্ণের পালঙ্কে শোয়াইতে পারিলে বুঝিবা পুণ্যপ্রভার যোগ্য হইত ; মনে হইতেছে, মণি করিয়া মস্তকে রাখিতে পারিলে বুঝি বা তাঁহার যোগ্য সমাদর হইত। মত্ত কালিকান্ত কত কি ভাবিতেছে, সে হিসাব কে দিতে পারে ?

দীনা পুণ্যপ্রভা বাসর-ঘরের সাজ সজ্জা দেখিয়া বিমোহিত হইয়া ভাবিতেছেন, "এ কি দেখিতেছি ! আমারই জন্য এত আয়োজন ? এ জীবন কেন বিধি গড়াইলে ? এই টাকায় লক্ষ লোকের প্রাণ রক্ষা হইত ! হায়, গড়াইলেত কেন আমাকে এত রূপ দিয়া সাজাইলে ? যে রূপে মানুষ পাগল হয়, সে রূপ কেন দিলে ? হায় রে যৌবন, তুই কেন আমার নিকট আসিলি ? পরদুঃখে চক্ষের জল ফেলা যাহার জীবনের ব্রত, পরপদ-সেবা যাহার অঙ্গের ভূষণ, জগতের কুরূপই তাহার সাজে ভাল। হায় রে রূপ, তোকে হারাইয়া কত কাঙ্গালিনী চির কালের জন্য স্বামীর চক্ষের শূল হইয়াছেন ; কত ঘরে ক্রন্দন, হাহাকার ! যাহার কোনই রূপের দরকার নাই, তার এত রূপ কেন ? আমি কুরূপা হইয়া সকলের চরণের ধূলি হইলাম না কেন ? আমাকে পায়ে দলিত করিতে লোকের সাধ যায় না কেন ? যদি জীবন দিয়া বিধি এ দেহ গঠন করিলে, বিশ্বাস দিয়া, ভক্তি দিয়া এ দেহকে মণ্ডিত করিলে না কেন ? আমার দেহে এমন জিনিস্ কেন দিলে, যাহা দেখিয়া মানুষ রিপুর উত্তেজনায় মত্ত হয় ? আমাকে দেখিয়া মানুষ ভক্তি বিশ্বাসে পূর্ণ হয় না কেন ? আমার কোন্ অপরাধে এই প্রায়শ্চিত্তের বিধান করেছ বিধি। গোলাপের সৌন্দর্য্যে, কোকিলের মধুর ঝঙ্কারে, চাঁদের জগৎমুগ্ধকর কিরণে মানুষ তবু মজিতে পারে, সে যে জড় প্রকৃতির সাজ, প্রভু, আমাকে ইন্দ্রিয়াধীন করিয়া কেন এত প্রলোভনের মধ্যে ফেলিলে ? মা জগদম্বার ইচ্ছা। মা আমার ইচ্ছাময়ী ! মা বলেন, সকলই জগদম্বা করেন। করেছেন তিনি, কিন্তু আমি কি এই কঠোর পরীক্ষায় উদ্ধার পাইব ? কে আমাকে একথার উত্তর দিবে ? এক সহায় সৎসাহস, তাহার রাজ্য এ নহে। আমি কোথায় আজ সেই বল পাইব, যাহাতে এই বহুমূল্যের রত্ন-খচিত মণি-মুক্তা-মণ্ডিত সমস্ত জিনিসকে পায়ে দলিত করিয়া ভাবিতে পারি যে, এ সকলই অসারের অসার, ধূলি অপেক্ষাও অসার ! আমি সাধনহীনা, ভক্তিহীনা, প্রেমহীনা, পুণ্যহীনা। মা জগদম্বা আজ কোথায় ? মা, আজ তুমি তোমার সাধের কন্যাকে কোলে তুলে ধর, নচেৎ আমার সাধ্য

নাই যে, আমি আত্মরক্ষা করিতে পারি। এত কাল পরে আমি কি পিতা-মাতার নাম ডুবাব! মা জগদম্বা, তোমার মেয়েকে ধর।" বাসর-ঘরের চাক-চিক্য দেখিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে কালিকান্ত বাসর ঘরে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে তাঁহার পূর্ব্ব পরিণীতা স্ত্রী। স্ত্রী নহেন, রাজরাণী। কিন্তু রাজরাণীর আজ দুনয়নে ধারা বহিতেছে। রাণীকে কালিকান্ত কেন আনিয়াছেন, পরে প্রকাশ পাইবে।

বাসর-ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পুণ্যপ্রভা দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। সজ্জিত গৃহ সুবাসে পূর্ণ,চতুর্দ্দিকে ডবল দেয়ালগিরিতে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে, মুক্তা মাণিক্য হীরা জরি চক্ চক্ ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে। ঘর দেখিলে মন মজে। কালিকান্ত মনে ভাবিলেন, এ কিছুই বুঝি পুণ্যপ্রভার যোগ্য হয় নাই, সেই জন্য দেবী দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি সম্বোধন করিবার পূর্ব্বেই দীনা পুণ্যপ্রভা কালিকান্তের দুচরণ ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—"আপনি বয়সে আমার অপেক্ষা অনেক বড়, ছেলেবেলা আপনাকে তাই দাদা বলে ডাকিয়া তৃপ্তি পাইতাম। আমার আর ভাই নাই, আপনাকে ঠিক সহোদরের ন্যায় ভালবাসিতাম। আপনি সকলই জানেন। কোন জিনিস পাইলে আপ-নাকে না দিয়া খাইতাম না। কোন জিনিস দেখিলে আপনাকে না দেখা-ইতে পারিলে তৃপ্তি পাইতাম না। সে সকলই আপনি জানেন। আমি বুঝাইতে পারিব না, কি পবিত্র ভাবে আপনাকে ভালবাসিতাম। সেই একদিন গিয়াছে, এখন আপনি বৃদ্ধ, আমি যুবতী। আপনি পরিণীত, আমি কুমারী। আমি এই অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া, মা জগদম্বাকে সাক্ষী করিয়া, বিবাহ-মণ্ডপে, আপনাকে আমি আজ পিতৃত্বে বরণ করেছি। আপনি পিতা, আমি দুহিতা, আপনি রক্ষাকর্ত্তা, আমি রক্ষিতা,—আপনার আশ্রিতা। আপনার নিকট আজ আমার এই ভিক্ষা, বাবা, চরণ-ধূলি আমার মাথায় দিয়া আমাকে পবিত্র করুন। আপনার এই স্ত্রী আমার মাতা। মা, তুমি তোমার কন্যার মাথায় চরণ-ধূলি দিয়া আশীর্ব্বাদ কর।"

কালিকান্ত কথা শুনিয়া অবাক্, পুণ্যপ্রভা কি বলিতেছে? পুণ্যপ্রভা কি পাগলিনী হয়েছে? এই রূপ ভাবিয়া,বলিলেন,"দেখ,বাল্যকাল হইতে তোমার জন্য আমি পাগল। তুমি আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিতে, কিন্তু এক দিনও আমি তোমাকে ভগ্নী বলিয়া ডাকি নাই। তুমি একরূপ ভালবাসিয়াছ, আমি অন্যরূপ ভালবাসিয়াছি। তোমার সেই বাল্যকাল হইতেই আমি তোমার

রূপে মত্ত। আমার ভালবাসা পৃথিবীর লোকেরা বুঝিবে না, আমি যে দিন তোমাকে দেখেছি, সেই দিন হতে তোমা বই আর কিছু জানিনে। বল্‌ব কি, তুমি শয়নে স্বপনে জাগরণে আমার মনপ্রাণ পূর্ণ করে রয়েছ। ক্ষুধা তৃষ্ণাও সময়ে সময়ে ভুলেছি, কিন্তু তোমাকে কখনও ভুলি নাই। আমি আর কিছু চাই না, তুমি আমাকে একবার স্বামী বলিয়া সম্বোধন কর, আমি চরিতার্থ হয়ে যাই। তোমার চরণ ধরিতেছি, আমাকে রাখ, চরণে ঠেল না। আমি তোমারি, আমি তোমারি।"

এই রূপ সম্বোধন করিয়া সত্যই কালিকান্ত পুণ্যপ্রভার চরণ ধরিলেন। চরণ ধরিয়া বলিলেন "মানময়ি কমলিনি রাই, অভিমানে আছ কি কারণ? আমি তোমার শ্রীকৃষ্ণ ধূলায় পড়ে পড়াগড়ি যাচ্ছি, একবার নয়ন তুলে চাও, প্রাণময়ি, প্রাণ রাখ। আমি তোমারি, আমি তোমারি।"

যে একমাত্র ঔষধ ছিল, সে ঔষধে কোনই ফল হইল না, পুণ্যপ্রভা দেখিলেন। *পিতা যদি কন্যার প্রতি কুদৃষ্টি করে, তবে এ পৃথিবীতে আর রমণী দাঁড়ায় কোথায়?* কালিকান্তকে পুণ্যপ্রভা পিতা বলিয়া সম্বোধন করিলেন, তারপরও কুদৃষ্টি! তবে পুণ্যপ্রভার আর উপায় কি? নিরাশ্রয়াকে আজ কে রক্ষা করিবে?

পুণ্যপ্রভা গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "পিতাকে স্বামী বলিতে আমি অভ্যস্ত নই। আপনি একবার বিবাহ করিয়াছেন, স্ত্রী বর্ত্তমানে কোন্ সাহসে কন্যার রক্তপান করিতে চাহেন?"

পুণ্যপ্রভার কথা এবার একটু কর্কশ হইল, কিন্তু উপায় নাই। সময়োচিত ব্যবহার না করিয়া করেন কি?

কালিকান্ত বলিলেন, তুমি কুলীনের মেয়ে, শত সতিনের ঘর করা তোমাদের অভ্যাস, ভয় কি? এ স্ত্রীকে তোমার দাসী করে দিব?

পুণ্যপ্রভা।—কুলীনের ঘরে জন্মেছি বলে দ্বিচারিণী কখনও হই নাই, কখনও হব না। জগতে এক পতি,এক স্ত্রী,ইহাই শাস্ত্র,ইহাই বিধি। কৌলিন্য ছারে খারে যাউক, আমি কখনও পিতার সহ-গমন করিতে পারিব না।

কালিকান্ত।—পিতা বল কাহাকে? তোমার পিতা তারানাথ, স্বামী কালিকান্ত। আজ বল পূর্ব্বক তোমার আস্পর্দ্ধা ভাঙ্গিব।

কথা শুনিয়া পুণ্যপ্রভার গৌরবর্ণ রক্তিম হইয়াছে, চক্ষুতে যেন অগ্নি জ্বলিতেছে। সম্মান রাখিয়া চলা অসম্ভব হইল। তেজের সহিত পুণ্যপ্রভা

বলিলেন, "সে সাধ্য তোমার নাই। চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী, এই অগ্নি সাক্ষী, মা জগদম্বা সাক্ষী,আমার এই মা সাক্ষী, তুমি বলপূর্ব্বক আমার আস্পর্দ্ধা ভাঙ্গিতে চাহিয়াছ,আমি দেখিব,তুমি আমার কি কর্‌তে পার। আমি তোমার ঘরে এসেছি বলে নরকে ডুবি নাই। কন্যার রক্ত পান করিতে যে পিতা ধাবিত, তাহাকে বিনাশ করিতে ধর্ম্ম, ন্যায়, পুণ্য ও পবিত্রতা বর্ত্তমান। তুমি কি ভয় দেখাও, কাপুরুষ? তোমার সাহস নাই যে, তুমি আমার এক গাছ চুল স্পর্শ করিতে পার? কাপুরুষের সাধ্য কি যে পুণ্যপ্রভার গায়ে হাত দেয়?"

কালীকান্ত সাহসের কথা শুনিয়া বড়ই দমিয়া গেলেন। কি করিবেন? যদি ধরিতে যান, কি জানি কোন গুপ্ত অস্ত্র যদি থাকে, সুতরাং নিকটে যাইতে সাহস হইল না। লোকে বলে তারানাথের স্ত্রী মা জগদম্বার প্রিয়-পাত্রী। কি জানি যদি পুণ্যপ্রভার প্রতি কোন দেবতার আশীর্ব্বাদ থাকে। কালীকান্ত কুসংস্কারাপন্ন লোক, এই কথা ভাবিয়া, পুণ্যপ্রভার অঙ্গে হাত দিতে সাহসী হইলেন না। বলিলেন "প্রাণময়ি, প্রেমময়ি, দেখ তোমার জন্য এই অতুল ঐশ্বর্য্য সাজাইয়াছি, এই সকল রত্ন-খচিত অলঙ্কার তোমারই, এই অপূর্ব্ব বস্ত্রাদি তোমারই, এই রূপার পালঙ্গ তোমারি, ইনি তোমার দাসী, আর আমি তোমার চিরদাস, দোহাই তোমার, আমাকে "স্বামী" বলিয়া একবার সম্বোধন কর। আমি আর তোমার নিকট কিছুই চাই না। তুমি ঘর আলো করিয়া থাক,আমি তোমাকে দিবারাত্রি কেবল দেখি। দেখে দেখে আত্মহারা হয়ে থাকি। দোহাই তোমার, আমাকে কলঙ্কিত করো না।"

কালীকান্ত নরম হইলেই পুণ্যপ্রভার বিপদ নিকটে ঘনায়। সাহস যেন পুণ্যপ্রভার একচেটে সম্পত্তি। কিন্তু মধুর ব্যবহার, পুণ্যপ্রভার বিষ। যদি পুণ্যপ্রভাকে বশে আনা সম্ভব হয়, তবে তাহা মিষ্ট ব্যবহারে। কিন্তু সে ঔষধ পৃথিবীতে জানে কয়জন?

পুণ্যপ্রভা বলিলেন, দুটী কথা তুমি যদি রাখ, তারপর আমি তোমার কথার উত্তর দিতে পারি। কথা এই, তুমি জান, আমার পিতা সর্ব্বস্ব ব্যয় করেছেন, কেবল দরিদ্র কাঙ্গালদের জন্য। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, তিনিই আমার স্বামী হইবেন,যিনি ধন-জন-জীবন সর্ব্বস্ব কাঙ্গাল দরিদ্রদের জন্য ব্যয় কর্‌তে পারেন। বিবাহ সেই দিন করিব, যে দিন, সেইরূপ বর পাইব। আমার প্রথম কথা এই, তোমার অতুল ঐশ্বর্য্য তুমি উইল করিয়া দরিদ্রসেবার জন্য ট্রষ্টির হাতে দেও। দ্বিতীয় কথা এই, তোমার এই স্ত্রীকে তুমি পুনঃ বিবাহ দেও। আমি

এক-স্বামী ও এক-পত্নী মানি, দ্বিপত্নী, দ্বিস্বামী মানি না। ইহকাল, পরকাল, চিরকাল,অনাদি ও অনন্তকাল একের সঙ্গে এক। যদি এই দুই প্রার্থনা তুমি পূর্ণ কর, আমি ভাবিয়া দেখিব, তোমাতে "স্বামীর" যোগ্যতা আছে কিনা।

কালীকান্তের মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল, এই দুটী কথার একটী পালন করাও তাঁহার পক্ষে সোজা নয়। হিন্দু সমাজে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনঃ বিবাহ অসম্ভব। দ্বিতীয় কথা, এই অতুল সম্পত্তি লিখিয়া দেওয়া বিষয়-মদ-মত্ত কীটের পক্ষে সোজা কথা নয়। কালীকান্ত বলিলেন, "তোমার এ ধনুর্ভঙ্গ-পণ আমা কর্তৃক রক্ষিত হইবে না। তুমি আমাকে স্বামী বলিবে কিনা, বল, আমার হাতে অন্য ঔষধ আছে, তাহা প্রয়োগ করি।"

পুণ্যপ্রভার তেজ এবার ষোল আনা আবির্ভূত হইল, বলিলেন, তবে আমার এই প্রতিজ্ঞা, এ জীবন থাকিতে তোমাকে স্বামী বলিব না, তোমার কি ঔষধ আছে, প্রয়োগ কর। আমি সেই ঔষধই চাই। মৃত্যুর অপেক্ষা আর তুমি কি অধিক করিবে? তারানাথের কন্যা তোমার বাড়ী যখন আসিয়াছে, নিশ্চয় জানিও, সে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। তুমি কি ভয় দেখাও? আমি কি কচি খুকী নাকি?

কালীকান্ত সত্যই এবার ক্রোধে উন্মত্তবৎ হইলেন। তিনি "বরকন্দাজ" "বরকন্দাজ" করিয়া ডাকিলেন। তখনই একজন বিশ্বাসী বরকন্দাজ "মহারাজ" বলিয়া হাজির হইল। কালীকান্ত বলিলেন, "আমি আদেশ করিতেছি, এই হতভাগিনীর শিরশ্ছেদ কর।" এই বলিয়া কালীকান্ত নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সেই ভীষণ রজনীতে।

এইরূপ কঠিন আদেশ পাওয়ার পর বরকন্দাজ কিছু আশ্চর্য্য হইল। কত বৎসরের চেষ্টার পর,কত অর্থ ব্যয়ের পর যাহাকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনা হইয়াছে,তাহার শিরশ্ছেদের আদেশ,এ কিরূপ কথা? মানুষে চঞ্চলতা সম্ভব বলিয়া এত চাঞ্চল্য কি সম্ভব? মানুষের ক্রোধ ও অভিমান নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার বটে, কিন্তু তা বলিয়া কি এত ক্রোধ ও এত অভিমান সম্ভব? এখনই আদেশ পালন করিলে মহারাজের মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়ে নাকি? বরকন্দাজ এই

সকল কথা ভাবিতে লাগিল। বরকন্দাজ একজন হিসাবী লোক, সে জানিত, তাহার মহারাজার জীবনই চঞ্চলতাময়, কখনও বা তিনি কাহাকে মাথায় তুলিয়া নাচিতেছেন, কত প্রশংসা করিতেছেন, আবার হয় ত দুই চারি দিন পরে তাহাকে নির্ব্বাসিত করিতেছেন! কখনও বা কাহাকে রাজা করিয়া দিবেন, প্রতিশ্রুত হইতেছেন, দুদিন পরেই হয় ত তাহাকে অপমানিত করিয়া বিদায় করিয়া দিতেছেন। হঠাৎ বড় মানুষ হইলে যেমন হয়, কালীকান্ত তাহার একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত। এক-পুরুষে ধনীদিগের যেমন মেজাজ হয়, কালীকান্ত তাহার একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত। কর্ম্মচারীগণ সকলেই তটস্থ হইয়া আছেন, কাহার কখন জবাব হয়। নিত্য যেন নূতন! আজ রাজমুখে যাহার প্রশংসায় সকলে বিমোহিত, কাল তাহার তীব্র নিন্দায় সকলে বিমর্ষ। ধনীর গৃহে তোষামোদ-কারী অনেক থাকে, কালীকান্তেরও আছে, জল উচু বলিলে সে দল অমনি বলে, "হাঁ মহারাজ জল উচু", জল নীচু বলিলে অমনি তাহারা বলে, "হাঁ মহারাজ, জলটা নীচুই বটে।" এ হেন তোষামোদকারীগণও কালীকান্তের মন সর্ব্বদা যোগাইয়া উঠিতে পারে না। কখন কি হয়, কখন বাবু কি বলেন, সকলেরই ভয়। কালীকান্তের আদর ও অভ্যর্থনার কোন মূল্য নাই, তিরস্কার বা নির্ব্বাসনেরও কোন মূল্য নাই। চঞ্চল হইতেও তিনি চঞ্চল। এতই কাণ-পাতলা লোক, যে কোন আশু-বিশ্বাসী ব্যক্তি একজনের বিরুদ্ধে বলিলেই হয়, অমনি তিনি বিরক্তির সাগরে ঝাঁপ দিয়া পড়েন। এ হেন লোকের চাকরী করা কত কঠিন! এ হেন লোকের গোলামী করা আরো কত কঠিন! এ হেন লোকের তোষামোদ করা কঠিন হইতেও কঠিনতর। টাকার মায়ায়, এ সকল জানিয়াও, নিত্যই নূতন লোক আসিতেছে। বাল্য-কালে বর্শী দ্বারা মাছ ধরিবার সময় ভাবিতাম, মাছগুলো কি বোকা, যে জিনিস খাওয়ায় চক্ষের সমক্ষে সঙ্গী বন্দী হইল, সেই জিনিসই সে খাইতেছে। শত শত দৃষ্টান্তেও অন্ধ মাছের শিক্ষা হয় না, সতর্কতার কারণ উপস্থিত হয় না। এখন ভাবিতেছি, মানুষগুলো বুঝিবা তদপেক্ষাও বোকা, যে লোকের কাছে দুমাসও এক জন লোক সসম্মানে থাকিতে পারে না, দুমা-সও চাকরী করিতে পারে না, সেই লোকের নিকটই আবার নিত্য নূতন লোক আসিতেছে। পতঙ্গের বহ্নি-প্রলোভন এ জগতের সর্ব্বত্র বিস্তৃত, মানব-প্রাণে আরো বেশী, আরো বেশী। তাহাতে পড়িবে, মজিবে, তারপর মান-সম্ভ্রম, তারপর জীবন পর্য্যন্ত হারাইবে। পণ্ডিতেরা উপদেশ দেন "অস্থির-

চিত্তের প্রসাদও ভয়ঙ্কর।” এ কথার মহা শিক্ষা জীবনে পালন করিতে পারে, অতি অল্প লোক। আজ দুটা কথার ফোঁড়ন দিয়া যে তোষামোদকারী অন্যের অন্ন মারিতেছে, দুদিন পরে অন্য-প্রদত্ত ঐ রূপ ফোঁড়নে তাঁহারও যে সর্ব্বনাশ হইতে পারে, এ কথা ভাবে অতি অল্প লোকে। টাকার প্রলোভন বড়ই শক্ত প্রলোভন। ইহার হাত এড়াইতে পারে কে? ঐ মধুর শব্দে মানুষ যখন জাগরিত, তখন পাদুকার আঘাত পুষ্প বর্ষণ, গালাগালিও তিরস্কার মধুবর্ষণ, পিতৃ-মাতৃকুল-উদ্ধার, অমৃত-প্রস্রবন! আজ রাজরাণীর শিরশ্ছেদের আদেশ হইল, কাল আবার কালীকান্ত নূতন বিবাহ করিতে চাহিলে, কত কন্যা লইয়া কত পিতা বা ভ্রাতা হাজির হইবেন! বারম্বার বিষ প্রয়োগে ধনী পতি স্ত্রীবধ করিতেছেন, দেখিয়াছি, আবারও তাঁহার বিবাহের পাত্রী জুটিতেছে। এ প্রলোভন বড় শক্ত প্রলোভন।

সামান্য বেতনের চাকর-বরকন্দাজ আজ বড় কঠিন সমস্যায় পড়িয়াছে! রাজরাণীর শির লওয়ার আদেশ সে কেমনে পালন করিবে? টাকার মায়া তাহার নাই, তবে এমন জঘন্য কাজ কিসের মায়ায় করিবে? নব-পরিণীতা রাজরাণীর সোণার অঙ্গে কেমনে অস্ত্র চালাইবে? মহারাজের মন ত অস্থির, মুহূর্ত্তের পর তাঁহার মন যদি পরিবর্ত্তিত হয়, তবে ত সর্ব্বনাশ! অন্য দিকে চাকরী স্বীকার করিয়া আদেশ লঙ্ঘন করিবে কি রূপে? এই অবস্থায় কি কর্ত্তব্য, বরকন্দাজ ঠিক করিতে পারিতেছে না। সে ইতস্তত করিতেছে, জীবনের কত কথা যেন ভাবিতেছে, তাহার মুখ বিষণ্ণ, হস্ত নিশ্চল, কেমন এক রূপ জড়ভরত হইয়া পড়িয়াছে। পুণ্যপ্রভা তাহার অবস্থা দেখিয়া সকলই বুঝিলেন। চাকরীর খাতিরে যে মানুষের এরূপ অবস্থা হয়, তাহা কখনও দেখেন নাই। সৎবুদ্ধি, ন্যায়-জ্ঞান, ধর্ম্মবিবেক চাকুরীর মায়ায় বিসর্জ্জন দিতে হয়, তিনি ইহা কখনও প্রত্যক্ষ করেন নাই। কিছু আশ্চর্য্য হইলেন। ভাবিলেন, চাকরী করিতে আসিয়া বেচারা কি কষ্টেই পড়িয়াছে। কর্ত্তার আদেশ লঙ্ঘন করাও কঠিন, অবাধ্যতা হয়, অথচ বিনা কারণে নিরপরাধিনী রাজরাণীর প্রাণ লইতে হয়। এ বড় কঠিন সমস্যা। সামান্য লোক হইলে, কোন চিন্তা ছিল না। মাছ ও পাখীকে যেরূপে বধ করে, এক শ্রেণীর লোক, সেইরূপ, বিনা ক্লেশে সামান্য মানুষেরও প্রাণ লইয়া থাকে। কিন্তু এ লোক সে রূপ নয়। রাণীর প্রাণ লওয়ার সময় লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয়, ভাবনা সকলই উপস্থিত হইতেছে, পুণ্যপ্রভা ইহা বুঝিলেন। বুঝিয়া বলিলেন—“ভয় কি বরকন্দাজ,

প্রভুর আদেশ পালন করা তোমার এক মাত্র কাজ, যখন চাকরী স্বীকার করেছ, তখন আর অন্য পথ নাই। নির্ভয়ে এস, আমি মাথা পাতিয়া দিতেছি, আমার শির লইয়া এই শরীরের রক্তে প্রভুর পা ধোয়াও।”

এই কথা বলিয়া পুণ্যপ্রভা ঘাড় পাতিয়া দিলেন। বরকন্দাজ রাণীর এই আগ্রহ দেখিয়া আরো আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, “মা, আমি এ কাজে এস্তাফা দিব। আমি এখানে আর থাকিব না।”

পুণ্যপ্রভা।—কাজের সময় এখন এস্তাফা দিতে পার না, তাহাতে তোমার অপরাধ হইবে, প্রভুর আদেশ পালন করিয়া তারপর কাজে এস্তাফা দিও। এস, নির্ভয়ে এস, ভয় কি? আমি তোমার কোনই অপরাধ লইব না, দেবতারা তোমার কোনই অপরাধ লইবেন না! সকল অপরাধের দায়ী তোমার প্রভু, তুমি নির্ভয়ে এস।

বরকন্দাজ।—না—আমি তাহা কিছুতেই পারিব না। মা, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি এ গ্রাম ছাড়িয়া পলাই।

পুণ্যপ্রভা।—দেখ, চাকরী গেলে তোমার পরিবারের কি কষ্ট হইবে, একবার ভাব। আমি একজন দরিদ্রের কন্যা, আমার প্রাণ লইতে কোনই দ্বিধার কারণ নাই। ইহা ত তোমাদের নিত্য ব্যবসা! অগ্রসর হও, যদি একান্তই না পার, তোমার তরবারি আমাকে দেও, আমি আমার মস্তক কাটিয়া তোমাকে দিতেছি।

এই বলিয়া পুণ্যপ্রভা বরকন্দাজের হাতের তরবারি ধরিলেন। অপমানে পুণ্যপ্রভার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছে। এ জীবন রাখিতে মুহূর্ত্তও ইচ্ছা হইতেছে না। বরকন্দাজের তরবারি এই অবস্থায় তিনি ধরিলেন।

বরকন্দাজ বলিল, মা, আমার চাকরীর জন্য চিন্তা নাই, চাকরীর খাতিরে চাকরী করিতে আসি নাই, এ পৃথিবীতে আমার আর কেহ নাই, আপনি এত চঞ্চল হইবেন না। আপনার নাম জগৎবিখ্যাত, আজ একবার পিতৃদেবকে স্মরণ করুন, মাতাকে স্মরণ করুন, মা জগদম্বাকে স্মরণ করুন, ধর্ম্মকে স্মরণ করুন; তারপর আমাকে বলুন ত এই কাজ আপনার ন্যায় মহিলার সাজে কি না? আপনি পিতৃকুল ও মাতৃকুলের মুখ উজ্জ্বল করিবার ব্রত গ্রহণ করেছেন, আপনার কি এই কাজ সাজে? ছি, অস্ত্র ছাড়ুন। আত্ম-হত্যার ইচ্ছা থাকিলে কুমারে ডুবিয়াও মরিতে পারিতেন, এতদূর আসিতে হতো না। অস্ত্র ছাড়ুন, আমি পলাই।

সহসা বরকন্দাজের কথার ভিতর দিয়া যেন দেববাণী প্রকাশিত হইল, মা জগদম্বা যেন আবির্ভূত হইয়া পুণ্যপ্রভাকে এই গর্হিত কাজ করিতে নিষেধ করিলেন। যেন শুনিলেন—"মান অপমান কিসের? ধর্ম্ম পালন করিতে যাহাদের জন্ম, ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিলেই তাহাদের জীবন সার্থক; মান অপমান আবার কিসের?" পুণ্যপ্রভা লজ্জিতা হইয়া অস্ত্র ছাড়িয়া বরকন্দাজের চরণ ধরিয়া বলিলেন—"কে হে তুমি বরকন্দাজ? তুমি কি সাক্ষাৎ জগদম্বা? বুঝেছি, এই অধম তনয়াকে রক্ষা করিতে মা আজ তোমার বেশ ধরে এসেছেন! আমার অপরাধ লইও না, আমাকে ক্ষমা করিও।"

বরকন্দাজের কথা বন্ধ হইয়াছে, পুণ্যপ্রভার এই ভাব দেখিয়া দুই চক্ষে বারিধারা পড়িতেছে। বরকন্দাজ বলিল, "আমি যে হই, পরে জানিতে পারিবেন। আমি আজ চলিলাম। এ জীবনে আর যেন নীচ চাকরী না করিতে হয়, এই আশীর্ব্বাদ করিবেন। আমি চলিলাম।"

বরকন্দাজ অস্ত্র লইয়া তখনই সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল। নিম্ন-লিখিত কথা একখানি কাগজে লিখিয়া মহারাজের হাতে দিতে জনৈক প্রহরীকে দিয়া সেই রাত্রেই চরনগর পরিত্যাগ করিল।

"মহারাজ, আমি আপনার নরাধম ভৃত্য, অকৃতজ্ঞ, আমা দ্বারা আপনার আদেশ প্রতিপালিত হয় নাই। আমি রাজ-সরকারে যত বেতন পাইয়াছি, শীঘ্রই প্রত্যর্পণ করিব, আমি আর জীবনে চাকরী করিব না। আমি ভিক্ষা মাগিয়া খাইলেও আর চাকরী করিব না। আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমার পোষাক ও অস্ত্রাদি সমস্তই রাখিয়া চলিলাম, বুঝিয়া লইবেন।"

বরকন্দাজ যখন চলিয়া গেল, তখন আর কথা বলিতে পুণ্যপ্রভা সময় পাইলেন না। অনেকক্ষণ বরকন্দাজের দিকে চাহিয়া রহিলেন, যখন সে দৃশ্যের অতীত হইল, বাসর-ঘরের উত্তর দিকের বারাণ্ডায় বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। রাত্রি তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, ঘুমভাঙ্গা পাখী আধস্বরে এক একবার ডাকিতেছে, আবার নীরব হইতেছে, বারাণ্ডায় বসিয়া অনন্ত আকাশের দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন, এবং ভাবিতে লাগিলেন। জনপ্রাণীর আর কোলাহল নাই, বায়ু সো সো রবে বহিতেছে, সেই বায়ুর সহিত মিশিয়া আড়িয়াল-খাঁর তীব্রস্রোত এবং তরঙ্গের শব্দ আসিতেছে। তাহা মধুর হইতেও মধুর। পুণ্যপ্রভা একাকিনী, রাজবাড়ীতে। রাজবাড়ী নয়, দস্যু-বাড়ীতে তিনি ত্রিযামান্তে আকাশের দিকে চাহিয়া

নক্ষত্রের অতুল শোভা দেখিতেছেন এবং ভাবিতেছেন ;—"এই বরকন্দাজ কে ? এ কি মানববেশে জগদম্বা ? কি মধুর কথাই বলিয়া গেল, আমার কাণে এমন মধুর কথা আর কেহ কখনও শুনায় নাই। এই দৈত্যপুরীতে এমন লোকও থাকে ! দৈত্যপুরীই বা বলি কেন, সর্ব্বত্রই ত মা আছেন। আজ আমাকে রক্ষা করিতে মা জগদম্বা না আসিলে এ জীবন ত গিয়াছিল ? পিতার অতি আদরের, মাতার অতুল স্নেহের, লীলা, দীপ্তি, সরলা ও তিলোত্তমার নয়নের মণি আজ ত গিয়াছিল ? আমি কি নিষ্ঠুর, আমি এত অল্পেই সকলের মায়া ভুল্‌তে পারি ? এত ভালবাসা নিমেষে ছাই কর্‌তে পারি ? আমি গেলে, আমার পিতামাতার আর থাকিবে কি ? সখীদের জীবনের সুখের আর থাকিবে কি ? এত সহজে, দুটা শক্ত কথায় যে প্রাণ দিতে চায়, প্রেম-সাধন তাহার মোটেই হয় নাই। যাহা হউক, আমি এখন করি কি ? ধর্ম্ম, চরিত্র, পুণ্য, পবিত্রতা বেচিয়া আমি কখনও এখানে থাকিতে পারি না। ইহাদের অনিষ্ট হয়, তাহাই কি করিতে পারি ? কালীকান্তের কি ভালবাসা, আমার জন্যই তাহার সর্ব্বস্ব ! না—ছাই তার ভালবাসা, মুহূর্ত্তের মধ্যে যে শিরশ্ছেদের আদেশ করে, তাহার ভালবাসায় ছাই ! সে ত নিমেষে আমার শিরশ্ছেদের আদেশ করিল, আমি কি তাঁর বুকে ছুরি মারিতে পারি ? না—তা কখনই নহে। আমার বাবা বলেন—পরের অনিষ্ট করা ত দূরের কথা, পরের নিন্দাও যে করে, ধর্ম্ম সে পায় নাই, কখনও পাইবে না। তিনি বলেন, ধর্ম্ম কেবল প্রেমে ! সকলকেই প্রেম করিতে হইবে ? পিতাও বলেন, মাতাও বলেন, সকলকেই প্রেম করিতে হইবে। যে সর্ব্বনাশের চেষ্টায় আছে, তাহারও ইষ্টচিন্তা করিতে হইবে ! ইহা ত বড় শক্ত কথা। আমার যদি আজ শিরশ্ছেদ হইত, পিতা কি কালীকান্তকে ক্ষমা করিতে পারিতেন ? শিরশ্ছেদ না-ই বা হইল, যাহা হইয়াছে, ইহাও ত কম নয় ; বাবা কালীকান্তকে ক্ষমা করিতে পারিবেন কি ? আমার ত বোধ হয় পারিবেন, তিনি ত মানুষ নন্, তিনি যে দেবতা। দেবতার পক্ষে অসম্ভব কি ? কত লোক কত অনিষ্ট করেছে, বাবা আত্মরক্ষা করেছেন, এক দিনও কাহারও অনিষ্ট করেন নাই। বাবা কখনও কাহারও একটী নিন্দার কথা শুনিতে পারেন না। বাবা বলেন, নিন্দা করা কাপুরুষের কাজ। কালীকান্ত যতই নীচ ও পামর হউক, বাবার দয়া তার নীচতা হইতে অনেক অধিক। যেরূপ বোধ হইতেছে, একটা ত শক্ত মোকদ্দমা হইবেই, বাবা এবার কি করিবেন ? আমিই বা

কি করিব? কালীকান্তের সর্ব্বনাশের ইচ্ছা বর্জ্জন করে, সত্যের জন্যই সত্য বলিতে হইবে। আমার বোধ হয়, দীপ্তিও তাহাই করিবে। দীপ্তি কি আত্মত্যাগই শিখেছে, আমি তার ভালবাসা দেখে একেবারে মজেছি। অনায়াসে সে দস্যুর হস্তে প্রাণ দিতে যুদ্ধ কর্‌তে লাগ্‌ল! দীপ্তি বুদ্ধিমতী, সে ত জান্‌ত পরিণাম ভাল নয়, তবুও সে ক্ষান্ত হতে পারে নাই। আমার জন্য সে না পারে, এমন কাজ নাই। আমার জন্যই বা কেন? সে সকলের জন্যই প্রাণ দিতে পারে! হায়, দীপ্তি দস্যুদিগের নিষ্ঠুর আঘাতের পরও বেঁচে আছে কি? আমি কি আর সেই সোণার প্রতিমা দেখ্‌ব না? আমার অদৃষ্টে আর কি সেই আনন্দলোক, পুণ্যলোক দেখা ঘট্‌বে না? কে জানে! আমি সে কথা ভাব্‌লে আর ঠিক থাক্‌তে পারি না। দীপ্তি, দীপ্তি, তুই আজ কোথায়? তোর বিরহে আমার প্রাণ আজ যায়! আমাকে ছেড়ে এক দিনও ত তুই দূরে থাকিস্‌নে, আজ তুই কোথায়! আমি তোকে ছেড়ে এসেছি বলে অভিমানে কি চুপ করে আছিস্? ছি, তোর আবার অভিমান কিরে ভাই?” পুণ্যপ্রভার দুনয়নে ধারা বহিতেছে, সকল কথা তিনি ভুলিতে পারেন, কিন্তু দীপ্তির কথা ভুলিতে পারেন না। দীপ্তি যেন পুণ্যপ্রভাকে পূর্ণ গ্রাস করে রয়েছেন। পুণ্যপ্রভা উন্মত্তার ন্যায় বলিতে লাগিলেন—“দীপ্তি চায় দয়া, পবিত্রতা এবং প্রেম। প্রেমাঙ্কুর বাবু আজ কোথায়? পরের দুঃখে তিনি ত ঠিক থাক্‌তে পারেন না, আমাদের এই দুঃখের দিনে তিনি আজ কোথায়? তিনি যদি থাক্‌তেন, না জানি, দীপ্তির কত আনন্দ হতো! আমি সেই দেবতাকে কখনও দেখি নাই। দেবদর্শন আমার ভাগ্যে কি ঘট্‌বে? দীপ্তির আদর্শকে আমি কি কখনও দেখ্‌ব? কাল দীপ্তিকে সাজাবার সময় একবারও ত মনে করি নাই, আমাদের বিচ্ছেদ ঘট্‌বে; হায়, আজ দীপ্তি বা কোথায়, আমি বা কোথায়? দীপ্তি প্রেমের পাগলিনী, পুণ্যের সোহাগিনী, দয়ার কাত্যায়নী। দীপ্তিতে আর কাহাতে তুলনা হয়? দীপ্তির তুলনা কেবল দীপ্তিই। দীপ্তি আমাদের সকলের চেয়ে বড়। সরলা, লীলা, তিলোত্তমা—সকলের চেয়ে দীপ্তি প্রেমে বড়, পুণ্যে বড়, দয়ায় বড়, না—সৌন্দর্য্যেও বড়। না—কেবল আমাদের চেয়ে বড় নয়—দীপ্তি, বাবার চেয়ে বড়,—মায়ের চেয়েও বড়। সে সকলের বড়। তার মত ভালবাস্‌তে কে পারে? ভালবাসার জন্য তার মত প্রাণ দিতে কে পারে? তার ন্যায় ধর্ম্মই বা কে বুঝে? আমি যদি দীপ্তির মত প্রেমিকা, পবিত্রা ও দয়াময়ী হইতে পারিতাম, না জানি, আমি কত সুখী হইতাম।

আমি আজ কালীকান্তকে ডরাইয়া চলিতেছি, কিন্তু দীপ্তি ত কাহাকে এক দিনের জন্যও ডরায় নাই। তার সাহস কত অধিক! পাপ দেখে, প্রলোভন দেখে আমি ভয় পাই। সে ত এক দিনের জন্যও ভয় পায় নাই। ফুৎকার দিয়া সে সব উড়াইয়া দেয়। সে বলে "প্রলোভন আবার মানুষের কি করতে পারে? মানুষ না ধরা দিলে পাপ কি আবার মানুষকে ধরতে পারে?" কি স্বর্গীয় কথাই সে বলে! তার কথা শুনলে আমি যেন স্বর্গে উঠে যাই। সে মেয়ের কি গুণ, কি রূপ? গুণ না, যেন গুণের সাগর। রূপ না, যেন রূপের সাগর। ঐ গুণে, ঐ রূপে আমি মজেছি। আমি সব ভুলতে পারি, দীপ্তিকে কিছুতেই ভুলতে পারিনে। আমার এ দুর্ব্বলতা কি দেবতাদের মার্জ্জনীয় নয়? বাবাকে ও মাকে যে ভুলতে পারে, সে দীপ্তিকে ভুলতে পারে না! দীপ্তি যেন আমার সব গ্রাস করেছে। আমার জীবন যেন দীপ্তিময়ী। এক মানুষ অন্য দেহ ধারণ করতে পারে না, লোকে বলে। আমি বলি, তাহা মিথ্যা কথা। তন্ময়ত্ব জন্মিলে বুঝি বা মানুষ সম্পূর্ণরূপে অন্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। আর কেহ হয় কি না, আমি জানি না। কোন স্ত্রী, স্বামীর গুণে তন্ময় হন কিনা, কিম্বা কোন স্বামী স্ত্রীর গুণে তন্ময় হন কি না, আমি জানি না। আমি কিন্তু দীপ্তির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অনুপ্রাণিতা হয়েছি। আমিই ত দীপ্তি! দীপ্তিকে কেহ দেখতে চাও, আমার নিকট এস! ছি, ছি, এমন কথা আমি বলি? না—আমি দীপ্তির চরণ-সেবারও যোগ্যা নহি। সে আকাশের চাঁদ, স্বর্গের মন্দাকিনী, আমি তার চরণ ছুঁতেও অনধিকারিনী! সে কেবল সে-ই; তার তুলনা কেবল তাতেই, আমি তাহাকে স্পর্শ করে ধন্য হয়েছি। আমি তার কথা শুনে ধন্য হয়েছি; আমাকে সে ভালবাসে, ইহাতে আমি অমরা হয়েছি। অমরাবতীর অমরার সংস্পর্শে আমিও অমরা হয়েছি। দীপ্তির ইতিহাস কেহ লিখিলে আমার কথাও লিখবে, কেন না, আমি তাকে ছুঁয়েছি। কেন না, আমি তাকে ছুঁয়ে কলঙ্কিনী করেছি। সে আমাকে ভালবাসিল কোন্ গুণে? তার নামে কলঙ্ক রটিবে, একবারও সে ভাবিল না! ছি, এ তার কি প্রকৃতি! "দয়া, পবিত্রতা, প্রেম" তাহার আদর্শ, আমার ন্যায় দয়াহীনা, অপ্রেমিকা পাপীয়সীর সহিত তাহার ভালবাসা কোন্ শাস্ত্রানুমোদিত? এটা তার বড় ভ্রান্তি হয়েছে! তার এ কলঙ্ক কখনও ঘুচবে না! আমার কেবল এই দুঃখ। কোন্ সাহসে আমি তাহার অঙ্গে কাল ফুল গুজে দিয়াছি? সে একটী কথাও বলে নাই, এ তার বড় কলঙ্ক! কেবল চরণ-পূজারই আমি অধিকারিনী, দেবীর অঙ্গ

স্পর্শের অধিকার আমাতে নাই। দীপ্তিকে আজ মহা-স্নান করান উচিত! চাঁদের কলঙ্ক আমার অসহ্য।”

এইরূপ প্রলাপ বকিতে বকিতে রজনী প্রভাত হইয়া গেল। পুণ্যপ্রভা তন্ময়, ভাবে বিভোর। রজনী প্রভাত হইয়া আসিল, পাখী ডাকিয়া ডাকিয়া মানুষ জাগাইল, উষা অমৃত কিরণে জগৎকে জাগাইলেন, পুণ্যপ্রভা তবুও ভাবে অচেতন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

অমৃত-মুখ বিষের হাঁড়ি।

অতি প্রত্যূষে কালীকান্তের স্ত্রী, পুণ্যপ্রভার নূতন মা, পুণ্যপ্রভা জীবিতা আছেন, না চিরদিনের জন্য গিয়াছেন,সংবাদ লইতে আসিলেন। বাড়ীর লোক তখনও জাগে নাই,আজ সর্ব্বাগ্রে জাগিয়াছেন, মায়াবিনী চন্দ্রকলা! পুণ্যপ্রভা বাঁচিলে চন্দ্রকলার জীবনের আর সুখের আশা নাই, পুণ্যপ্রভার সংবাদ না লইয়া আজ তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য দেখার একান্ত প্রয়োজন; হয় চিরানন্দ, নয় নিরানন্দ, যা ভাগ্যে আছে, একটা বুঝিয়া নিশ্চিন্ত না হইলে চন্দ্রকলা ঠিক হইতে পারেন না। সমস্ত রাত্রি স্বামীর সেবা করিয়াছেন,—আজ স্বামীকে কত আদরই করিতেছেন! আজ স্বামীর চক্ষে ঘুম বসাইতে কত চেষ্টাই করিয়াছেন; কিন্তু উন্মত্ত কালীকান্ত সমস্ত রাত্রি, কি জানি কেন, ঘুমাইতে পারেন নাই, শয্যা কণ্টকবৎ হইয়াছে। উষার শীতল বায়ু বহিয়াছে যখন, তখন হতভাগ্যের চক্ষে একটু ঘুম বসিয়াছে। স্বামীর চক্ষে ঘুম বসিলেই চন্দ্রকলা উঠিয়া পুণ্যপ্রভার সংবাদ লইতে আসিয়াছেন। কি প্রাণ গো!! চন্দ্রকলা আসিয়া দেখিলেন, পুণ্যপ্রভা অচেতন অবস্থায় বসিয়া আছেন। চন্দ্রকলার মাথায় যেন বজ্রপাত হইল। স্বামীর আদেশ প্রতিপালিত হয় নাই? কি কথা? কি উপায়ে এই মেয়েটা বাঁচিল, চন্দ্রকলার মনে এই চিন্তা জাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, “লোকেরা বলে যে, তারানাথ একজন সিদ্ধপুরুষ, তাঁর মেয়েও কি সিদ্ধা? আজ দেখে তাহাই বোধ হচ্চে। বাবুর আদেশ অগ্রাহ্য করে, এবাড়ীতে এমন লোক নাই, কি করে হতভাগিনী এখনও বেঁচে আছে? আমি কি

এই অবসরে পথ পরিষ্কার করব? এই সতিন ঘরে থাকৃতে আমার মঙ্গলের আশা নাই,সুখের আশা নাই। স্বামীকে পাই,বা না পাই; সে জন্য চিন্তা নাই, এ সতিন ঘরে থাকিলে টাকা কড়ি কিছুই পাইব না। আমার সকল চতুরতা কি ধরা পড়্বে? কঠোর আদেশ দেওয়ার পর স্বামীর যে অনুশোচনার ভাব দেখেছি, আজ এই সোণার প্রতিমা দেখিলে কিছুতেই তিনি থাকৃতে পার্বেন না। এই অতুল রূপে পুরুষকে পাগল করিবে, অসম্ভব কি? আমিই যে পাগল হই। কোন অলঙ্কার নাই, কোন বেশভূষা নাই, কোন সাজ সজ্জা নাই, এক হাতে কেবল একগাছি পিত্তলের বালা, পরিধানে একখানি মলিন কাপড়, কিন্তু তবুও দেখ রূপে দিক্ আলো করেছে। "সূর্য্য বুঝি আজ এই বারাণ্ডায় উদিত হবে। কি মনোহর রূপ গো! রাত্রে ভাল দেখি নাই, আজ দেখে আমার প্রাণ জুড়ালো। প্রাণ জুড়ালো নয়—প্রাণে আগুন জল্লো। ঘরে বাবুর শিয়রে বোঝাই করা পিস্তল আছে, এনে এখনই মেয়ের গর্ব্ব খর্ব্ব করি না কেন? তারপর মাথাটী কেটে বাবুর চরণে অঞ্জলি দেই। কিন্তু তাতে কি বাবু সুখী হবেন? তাত মনে হয় না। বুঝি বা, তা হলে বাবু পাগল হবেন। বুঝি বা, তা হলে বাবু উদাসীন হবেন!! তাতেই আমার সুখের পথ পরিষ্কার হয় কই? বুঝি বা আমাকে ডুবাবার জন্যই এই সোণার প্রতিমার উদয়! কি উপায় করি, কে পরামর্শ দেবে?"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে চন্দ্রকলা একবার পিস্তল আনিতে দুপা পশ্চাতে ফেলেন, আবার দুপা সম্মুখে ফেলেন। প্রাণ জুড়িয়া দুটী চিন্তা,— "মারি, কি রাখি? মারিলেই ভাল হবে, না রাখিলেই ভাল হবে?" এই দুই চিন্তার মীমাংসা হয় না। প্রাণটা ধড়ফড় করিতেছে। আর সময়ও নাই। ভাবিতেছেন—"মারিলে যদি স্বামীকে হারাই, এজন্মে আর স্বামীকে পাব না, রাখিলে স্বামীকে হারাইবার সম্ভাবনা তত নাই, নয় স্বামীর ভালবাসাই হারাইব, কিন্তু লোকটা ত থাকিবে। স্বামীর ভালবাসার কাঙ্গালিনী আমি নই, কেবল টাকার কাঙ্গালিনী। আমি ঐযুগলচরণ পূজা করে মন পাব না? খোষামোদীতে স্বর্গ পৃথিবীতে নামে,তা আমি স্বামীর মন ভুলাইতে পারিব না? আমি একবার চেষ্টা করে দেখি না কেন, কে অধিক ভালবাস্তে পারে, কে অধিক স্বামীসেবা কর্তে পারে? আমাপেক্ষা এ মেয়ে অধিক যাদুগিরি জানিবে, সম্ভব নয়। আমি একবার ইহার সহিত প্রতিযোগিতা করে দেখি না কেন? তার আগে মেয়েটাকে বুঝাইয়া যদি হাত করিতে পারি, তবে ত সব দিকই রক্ষা

পায়। কিম্বা যদি ইহাররূপে কলঙ্ক চাল্‌তে পারি, তবে ত সবই সিদ্ধ হয়, তাই একার দেখি না কেন ?,

এইরূপ ভাবিয়া এবার চন্দ্রকলা সম্মুখের দিকেই একাদি ক্রমে কয়েকবার পা ফেলিলেন। যখন চন্দ্রকলা খুব নিকটে আসিলেন, তখন হঠাৎ পুণ্যপ্রভার সুখের স্বপ্ন যেন ভাঙ্গিল, তন্ময়ত্ব ঘুচিল, চাহিয়া দেখিলেন "একটী স্ত্রীলোক কাছে।" অন্যমনস্কের দরুণই হউক, বা রাত্রে ভাল করিয়া না দেখার দরুণই হউক, কিম্বা খুব অন্ধকার ঘুচে নাই বলিয়াই হউক, পুণ্যপ্রভা চন্দ্রকলাকে চিনিতে পারিলেন না। চন্দ্রকলা বলিলেন—"আমাকে চিন্‌তে পার নাই ? তুমি কেমন আছ, দেখ্‌তে এলাম।"

পুণ্যপ্রভা।—আপনি কে ?

চন্দ্রকলা।—আমি তোমার দিদি, নাম চন্দ্রকলা ; কাল রাত্রে আমাকে দেখ নাই ?

পুণ্যপ্রভা।—ক্ষমা করিবেন, আমি চিন্‌তে পারি নাই।

চন্দ্রকলা।—কাল স্বামীর আদেশ শুনে আমার প্রাণটা অস্থির হয়েছিল, কি করি বোন্, কিছুত করবার যো নাই, ভয়ে ভয়ে চলে যেতে হলো। আজ রাত্রে তোমার চিন্তায় আর আমার ঘুম হয়নি। বরকন্দাজ কোথায় গেল বোন্ ? তুমি যে আছ, দেখে বড় সুখী হলেম।

পুণ্যপ্রভা।—আপনি আমার মা, আপনি সুখী হবেন বই কি ? সে লোকটা কোথায় গেছে, আমি কিছুই জানি না। সে লোকটা কে গো মা ?

চন্দ্রকলা।—আজ আর "মা" বলো না, তুমি বাবুকে স্বামী বল্‌তে না চাও, বলো না, তাতে কিছু এসে যায় না, একটু মন রাখিয়া চল, কোনই গোল হবে না। আমিই সব ঠিক করে লব ; তুমি কোন কথা ব'ল না।

পুণ্যপ্রভা।—আপনি যদি মা না হতেন, কখনও এত সকালে আমায় দেখ্‌তে আস্‌তেন না। আপনার কি শুভ ইচ্ছা !

চন্দ্রকলা।—ওকথা এখন থাক্। এখন হাত মুখ ধোবে চল। তোমার মুখ মলিন হয়েছে, চল, হাত মুখ ধুয়ে তারপর দুজনায় অনেক কথা হবে।

পুণ্যপ্রভা চন্দ্রকলার মিষ্ট কথায় ভুলিলেন। মিষ্ট কথায় ভুলে জগতের সকলেই। উঠিয়া হাত মুখ ধুইতে গেলেন। চন্দ্রকলার মনে ভরা কেবল বিষ, কেবল বিষ।

এদিকে কালীকান্ত গাত্রোত্থান করিলেন। আজ মহা গত্রোত্থান। প্রত্যুষ হইতে না হইতে বৈঠকখানা লোকে ভরিয়া গিয়াছে। সকলেই

কালীকান্তের তোষামোদকারী, কিছু অর্থ-প্রত্যাশী, আজ পরামর্শদাতা। কালীকান্তের উঠিতে বিলম্ব দেখিয়া সকলে এইরূপ বলাবলি করিতেছে ;—

১ম ব্যক্তি।—সুখের রজনী পোহায় না গো ? সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর আজ "বাবুর" কি শীঘ্র ঘুম ভাঙ্গ্‌বে ?

২য় ব্যক্তি।—তাত বটেই, আজ গগনের চাঁদ গৃহে উদয় হয়েছে, আজ বাবু রূপে মত্ত।

৩য় ব্যক্তি।—চক্রান্তটা কেমন সুফলই ধরেছে গো ! যা যা মনে করে পরামর্শ দিয়েছি, তাহাই সফল হয়েছে।

৪র্থ ব্যক্তি।—এখন শেষটা রাখ দেখি ? একটা ত বড় কাজ করেছ, এখনকার উপায় ভাব। "মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।"

৩য় ব্যক্তি।—লোকে বলে, "জগৎটা কার বশ ? উত্তর—জগৎটাকার বশ" একথা জাননা কি বাপু ? টাকায় সব হবে, ভাবনা কি ?

৪র্থ ব্যক্তি।—সাহসে শেষে কুলাবে না হে ! সেই প্রসিদ্ধ মোক্তারের ন্যায় সাহসী হয়ো না হে বাপু।

৩য় ব্যক্তি।—মোক্তারের ন্যায় কেমন ?

৪র্থ ব্যক্তি।—সেকথা জান না ? এক খুনে আসামীকে মোক্তার সাহস দিয়াছিলেন, ভয় কি, পুলিস থেকে খালাস করে আন্‌ব। যখন পুলিস চালান দিল, তখন সাহস দিলেন, ম্যাজিষ্ট্রেটের হাত হতে খালাস করিবেন। যখন ম্যাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা সেসনে দিলেন,তখন খুব সাহস করে বল্লেন,এবার আর ভাবনা কি,সেসনে ত নিশ্চয় খালাস। যখন সেসনে ফাঁসির হুকুম হলো, তখন মোক্তার সাহস দিলেন,ভয় কি,হাইকোর্টে গেলেই খালাস। ব্যারিষ্টারের সম্মুখে দাঁড়ায় কে ? যখন হাইকোর্টে সেসনের রায় বহাল রহিল, তখন মোক্তার সাহস দিলেন, লাটের নিকট লিখে খালাস কর্‌ব। যখন সেখানেও কিছু হলো না, এবং যখন "শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর" উপস্থিত, তখন আসামী কাতর ভাবে মোক্তারকে বলিল, "কই, কি করিলেন, এখন যে যাই !" তখন মোক্তার গম্ভীর স্বরে বলিলেন "ভয় কি, দুর্গা বলে একবার ঝুলে যাও, শেষে বিলাত আপিল করে দেখা যাবে।" বুঝ্‌লে, মোক্তারের ন্যায় সাহসী হওয়া কেমন ?

কথাটা শুনে সকলের হাসির তরঙ্গ উঠিল, তৃতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ প্রধান পরামর্শ-দাতা কথাটা শুনে একটু বিমর্ষ হইয়া বলিলেন—"সকলেই ত পরামর্শের মধ্যে আছেন, শুধু আমাকে ঠাট্টা কেন ?" ,কও াহংসাটার প্রকৃতি তা

৪র্থ ব্যক্তি।—তুমি যে বড়ই কিস্তিমাত করেছ, বল্‌ছিলে, তাই কথাটা বল্লুম, তা কিছু মনে করোনা।

এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময়ে কর্ত্তাবাবু বৈঠকখানায় আসিলেন। আনন্দ, উল্লাস, অভিবাদনাদি প্রচুর পরিমাণে চলিল, তারপর এইরূপ পরামর্শ হইল—

১। বিধিকৃষ্ণপুর, মাদারিপুর ও ফরিদপুরে আরো টাকা ও আরো লোক পাঠান হউক। পূর্ব্বে যে সকল লোক পাঠান হয়েছে, তাহাদের অধীন থাকিয়াই ইহারা কাজ করিবে। বড় উকীল আনিতে ঢাকা ও বড় ব্যারিষ্টার আনিতে কলিকাতা লোক প্রেরিত হউক।

২। দুই প্রহরের পথের মধ্যে যত স্থানে হাট বাজার আছে; সর্ব্বত্রই লোক ও টাকা পাঠান হউক। তহবিলে টাকার অভাব হইলে কর্জ্জ করা হইবে।

৩। একদল এমন সম্ভ্রান্ত সাক্ষী প্রস্তুত করা হউক যে, তাঁহারা বলিবে, তারানাথ ইচ্ছাপূর্ব্বক মেয়ের বিবাহ দিয়াছেন, কেবল সমাজের ভয়ে এখন তাহা অস্বীকার করিতেছেন।

৪। লাস্ সকলই জ্বালান হইয়াছে, মৃত ব্যক্তিদিগের বাড়ীতে এমন বন্দোবস্ত করা হউক যে, কেহ যেন কিছু না বলে। কোন বাড়ীতেই যেন ক্রন্দনধ্বনি না উঠে। এজন্য যত ব্যয় লাগে, দেওয়া হউক। এই সকল পরামর্শ ধার্য্য হওয়ার পর বৈঠকখানার সকলেই অভিমত জানাইলেন যে, তাঁহারা "নবরাণী দর্শন করিতে চাহেন।" কালীকান্তের মনটা একটু কেমন কেমন করিতেছে। এতক্ষণ সকল চাপা দিয়া কথা বলিতেছিলেন, এখন আর চাপা দেওয়া চলে না। তিনি রজনীর সকল কথা বলিলেন। ঠিক এই সময়ে প্রহরী বরকন্দাজের পত্র কর্ত্তাবাবুর হাতে দিল। পত্র পাইয়া কালীকান্ত বড়ই আনন্দিত হইলেন। তাঁহার আদেশ কার্য্যে পরিণত হয় নাই, ইহাই আনন্দের কারণ। আদেশ প্রদানের পরই অনুশোচনা উপস্থিত হইয়াছিল, চন্দ্রকলার কথায় তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। লজ্জার খাতিরে তখনই আদেশ পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। তখনই আদেশ পরিবর্ত্তন করিলে চন্দ্রকলা কি ভাবিবে? চন্দ্রকলা তাঁহার সকলই জানে, সে জন্য তত চিন্তা নাই। আদেশ পরিবর্ত্তন করিলে, "পুণ্যপ্রভা" কি ভাবিবে? এই লজ্জাতেই তখন আদেশ পরিবর্ত্তন করেন নাই। সে জন্য সমস্ত রাত্রি কষ্টে গিয়াছে। গাত্রোত্থানের পর সংবাদ লইতে পারেন নাই, প্রত্যূষ হইতে না হইতেই বাবুদের কথা বলিয়াছে, তাই তিনি একেবারে

বৈঠকখানায় আসিয়াছেন। সংবাদ লইতে সাহসও হয় নাই। প্রথম কারণ, যদি আদেশ প্রতিপালিত হইয়া থাকে, তবে মাথায় বজ্রপাত হইবে। দুঃখ বিপদের নিশ্চয়াত্মক সংবাদের সম্ভাবনা যেখানে, সেখানে মানুষ সংবাদের জন্ত তত লালায়িত হয় না; খারাপ সংবাদের ভয়ে সদা উৎকুণ্ঠিত থাকে। খারাপ সংবাদ এড়াইবার জন্ত মানুষের সর্ব্বদা অভিলাষ। প্রহরীর কথায় কালীকান্ত একটু আশ্বস্ত হইলেন, নারায়ণকে স্মরণ করিলেন। তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হয় নাই,এজন্ত একটুও কষ্ট হইল না, বরকন্দাজের প্রতি আরো প্রসন্ন হইলেন এবং তাহার অনুসন্ধান লইতে লোক পাঠাইলেন। এদিকে সাহসে ভর করিয়া অন্তঃপুরে সংবাদ জানিতে পাঠাইলেন, নূতন স্ত্রী কেমন আছেন।' লোক আসিয়া বলিল, ভাল আছেন। কালীকান্ত অমাত্য-বন্ধুবর্গ লইয়া নব পত্নী সন্দর্শনে চলিলেন।

ইতিমধ্যে অন্তঃপুরে এক বিষম দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

হিংসারাক্ষসী সতিনের কোলে।

চন্দ্রকলার মধুর মিষ্ট ব্যবহারে পুণ্যপ্রভা এতই ভাবে বিভোর হইয়াছিলেন যে, তাহার নিকট হইতে কোন বিপদ আসিতে পারে, এচিন্তাই মনে স্থান পায় নাই। সতিনের দৌরাত্ম্য কুলীন কুমারীর অজ্ঞাত বিষয় নহে, পুণ্য-প্রভা জানিতেন, সতিনের ঘর করা কি বিষম কষ্টকর ব্যাপার। কিন্তু তিনি ত আর সতিনের ঘর করিতে আইসেন নাই। তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত চন্দ্রকলার সম্মুখে বলিয়াছেন "কালীকান্তকে কখনও স্বামী বলিবেন না।"এত-ভিন্ন চন্দ্রকলাকে তিনি "জননী" সম্বোধন করিয়াছেন। জননীর হাতে মেয়ের সর্ব্বনাশ হইতে পারে, এ শিক্ষা তিনি পান নাই। কালীকান্ত তাহার শির-শ্ছেদ করিতে আদেশ দিয়াছেন, সেই জন্ত জননীর প্রাণ ব্যাকুল, এই কথাই ভাবিতেছেন। হিংসাটা যে জননীর হৃদয় মনে বাসা নির্ম্মাণ করিয়াছে, ইহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। সরলা বালিকা বই পুণ্যপ্রভাকে আজ আর কি বলিব? অথবা ইহাই বলিব, বালিকা মিষ্ট কথার বড়ই কাঙ্গালিনী। এ দরিয়ায় মিষ্ট কথা মিলে কই?

ক্রোধটা হঠাৎ বিনা কারণে জ্বলিয়া উঠে না; কিন্তু হিংসাটার প্রকৃতি তা

নয়। ক্রোধের কারণ অন্যে,হিংসার কারণ নিজের মন। হিংসাটা দিবা নিশি জাগে কেবল অন্যের অনিষ্ট করিবার জন্য। সম্ভব কি অসম্ভব, এসকল হিংসা গণিবে না, অন্যের ভাল মোটেই সে দেখিতে পারে না। তোমার কোন ব্যক্তি অনিষ্ট করিলে রাগ হইতে পারে, কিন্তু হিংসা হইতে পারে,কেহ কিছু না করিলেও। হিংসা,অন্যের প্রাধান্য দেখিতে পারে না। হিংসা অন্যের ভাল সহিতে পারে না। হিংসার মত দুর্জ্জয় রিপু, বিনা কারণে উত্তেজিত দুর্জ্জয় রিপু আর নাই।

হিংসা-রাক্ষসীর বসতি সকল ঘরেই, কিন্তু ইহার বিশেষ দুর্গ সতিনের হৃদয়ে। রামায়ণের যুগ হইতে আজপর্য্যন্ত ঘোষিত হইতেছে, সতিন-হৃদয়ে দুর্জ্জয় হিংসা-রাক্ষসীর একাধিপত্য। কৈকেয়ীর আবির্ভাব ঘরে ঘরে, কত দশরথের অকাল মৃত্যু ঘটিতেছে, কত সোণার রামচন্দ্র রাজ্যাভিষেকের দিনে বনবাসী হইতেছেন,—কত সোণার সহর ছারখার হইয়া যাইতেছে,—দুর্জ্জয় হিংসা-রাক্ষসীর উত্তেজনায়। চন্দ্রকলা আজ ইহারই একাধিপত্যে পড়িয়াছেন। পুণ্যপ্রভা তাহার কোনই অনিষ্ট করে নাই, অনিষ্টের আশ-ঙ্কাও এখানে এক বিন্দু নাই, তবুও চিত্ত বিষে জর্জ্জরিত। একবার যদি পুণ্যপ্রভার রূপের গৌরব বাহির হয়, তবে আর রক্ষা নাই। যাহা কর্ত্তব্য, ইতিমধ্যেই করা চাই। চন্দ্রকলা ইহা ভাবিতেছেন; আর যাহা ভাবিতেছেন, তাহা ঘটনায় প্রকাশ পাইবে। পুণ্যপ্রভাকে পায়খানার পথ দেখাইয়া দিয়া, হিংসার উত্তেজনায়, চন্দ্রকলা, ডাক্তারের নিকট যাইয়া অনেক পরামর্শ করিলেন এবং কতকখানি সৌন্দর্য্যনাশক জিনিস চাহিয়া আনিলেন। ডাক্তার বাবুর সহিত তাহার আত্মীয়তাটা বড়ই বেশী। ডাক্তার রাণীর গোলাম। রাণী ডাক্তারের প্রণয়ে আবদ্ধ। ঔষধ ত ঔষধ, ডাক্তার রাণীর জন্য সব করিতে পারেন। পায়খানা হইতে আসিবার পূর্ব্বেই চন্দ্রকলা মুখ প্রক্ষা-লনের জলের মধ্যে ঐ জিনিস মিশাইয়া রাখিলেন। পুণ্যপ্রভা পায়খানা হইতে আসিবামাত্র চন্দ্রকলা ছুটিয়া যাইয়া হাত-মাটীর জল দিলেন এবং বলিলেন, "তোমাকে দেখিবার জন্য বাবুরা আসিতেছেন, এদিকে পাড়ার মেয়েরা আসিয়া জমিয়াছে, তুমি তৎপর হও। তোমার চুলে তেল নাই। জটা ধরিয়া গিয়াছে, লোকেরা দেখিয়া কি বল্‌বে? এস চুল গুলি ঠিক করিয়া দি" এই বলিয়া আলুলায়িত সুচিক্কণ সুন্দর কেশরাশি ধরিয়া ধারাল কাঁচি দ্বারা অর্দ্ধেক পরিমাণ কাটিয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন, "এইবার দেখ্‌তে বেশ হয়েছে।" পুণ্যপ্রভা এখনও কিছুই বুঝিতেছেন না, মাথায় হাত

দিয়া বলিলেন, "এ কি করিলেন?" চন্দ্রকলা বলিলেন "এইবার দেখ্তে বেশ হয়েছে। বড় চুলের জন্য এত ব্যস্ত কেন, শীঘ্রই আবার চুল গজাবে।" পুণ্যপ্রভা আর কথা বলিলেন না। ইতিমধ্যে দাঁত মাজিবার গুঁড়ি চন্দ্রকলা হাতে দিলেন, এবং জলপাত্র ধরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "দাঁত মাজো, আমি জল ঢালিয়া দিচ্ছি।" পুণ্যপ্রভা দাঁত মাজিবার গুঁড়ি দাঁতে দিলেন। এমন কটু কষায় গুঁড়ি তিনি আর কখনও দাঁতে দেন নাই। মুক্তা-বিনিন্দিত উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ দাঁতগুলি মুহূর্ত্তের মধ্যে কাল হইয়া গেল। পুণ্যপ্রভা এখনও কিছু বুঝিতেছেন না। মুখ বিকৃত হইতেছে দেখিয়া চন্দ্রকলা বলিলেন, "এই জল চখে মুখে দেও, মুখ পরিষ্কার হবে।" পুণ্যপ্রভা এক গণ্ডুষ জল মুখে দিলেন, তাহাও ভয়ানক বিকৃত লাগিল। তিনি বলিলেন, "মা, এ কি দিলেন?" চন্দ্রকলা, ত্বরায় এক গণ্ডুষ জল লইয়া চখে, মুখে, গালে, কপালে ছিটাইয়া দিয়া বলিলেন "কি দিলাম? এই তোমার রূপে ছাই ঢালিলাম। হারামজাদি, কোন্ লজ্জায় আমাকে মা ডাকিস্? আমার সোণার স্বামীকে কাল অপমান করেছিস্, তা আমি ভুলি নাই।" এই বলিয়া আর এক গণ্ডুষ জল লইয়া আবার মুখে ছিটাইয়া দিলেন। এতক্ষণ পরে পুণ্যপ্রভার চৈতন্য হইল। দারুণ যন্ত্রণা আরম্ভ হইল,—যন্ত্রণায় তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। হতভাগিনী চন্দ্রকলা—হি হি করিয়া হাসিতে লাগিলেন। চন্দ্রকলার হাতের চর্ম্মও বিকৃত হইতে লাগিল, এবং একটু জ্বালা করিতে লাগিল বটে, কিন্তু হতভাগিনী তাহা সহ্য করিলেন এবং হি হি করিয়া হাসিয়া বলিতে লাগিলেন—"হারামজাদি, তোর সোণার রূপের বড়াই ভেঙ্গেছি, এখন স্বামীর চরণে তোর মাথা লুটাইয়া তবে ছাড়িব! তোর পুণ্যের বড়াই কদিনের? এই বাড়ীর মেথরের সহিত সহবাস করাইয়া তোর সর্ব্বনাশ কর্‌ব! আমার সাম্‌নে স্বামীর অপমান? কেমন, আজ কেমন লাগে?"

এইরূপ তিরস্কার করে চন্দ্রকলা ছুটে দাস দাসীদিগকে বলিলেন, "বাবুকে খবর দিয়ে আয়, ছোট বউ আজ মুখে কি মেখে পেত্নী সেজেছে, একবার এসে দেখে যান।"

ক্রমেই যন্ত্রণা বাড়িতে লাগিল। যন্ত্রণায় পুণ্যপ্রভা মাটীতে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। একজন লোকও সহানুভূতি করিবার নাই! এদিকে চন্দ্রকলা বাড়ীর অঙ্গন কাঁপাইয়া বলিতে লাগিলেন, "রূপের বালাই লয়ে মরি, কি বউ বাবু ঘরে এনেছেন গো, মুখপোড়া বানরী আর কি! সকলে দেখ এসে

কেমন বউ!" যাঁহারা বউ দেখ্তে এসেছিলেন, তাঁহারা চন্দ্রকলার কথা শুনে এবং পুণ্যপ্রভার ক্রন্দন শুনে অবাক্। ব্যাপারটা বুঝ্তে কাহারও কিছু বাকী রহিল না, সকলে কাণাকাণি কর্‌তে কর্‌তে যে যেমন এসেছিল, প্রস্থান করিল। কালীকান্তের নিকট সংবাদ পৌছিলে, কালীকান্ত অন্যান্য বাবুদিগকে বিদায় দিয়ে ছুটে আসিয়া দেখিলেন, পুণ্যপ্রভা মাটীতে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছেন।

চন্দ্রকলা আসিয়া মিষ্টস্বরে স্বামীকে বলিতে লাগিলেন, "এমন মেয়ে ত আর দেখি নাই, জল আন্‌তে গেছি, তা দেরী সইলো না, মুহূর্ত্তের মধ্যে কি মুখে মেখে ছট্‌ফট্ করে কাঁদ্‌তেছেন! আমি বলিলাম, কি হয়েছে? আমার দুই হাত পাত্‌তে বল্লে, আমি কিছু জানিনে, যেই হাত পেতেছি, আমার দুহাতে ঐ জল ঢেলে আমার দুহাত পোড়ালে! কি সর্ব্বনাশী বউ ঘরে এনেছো? আমাকে পোড়ালে তাতে কিছু ক্ষতি নাই, এখন তোমার জীবনটা থাক্‌লে বাঁচি।"

কালীকান্ত স্ত্রীর কথা শুনে অবাক্, কিছুই বুঝ্তে পার্‌ছেন না! পুণ্যপ্রভা নিজের মুখ নিজে পোড়াবেন কেন?—কালীকান্ত ভ্যাবাগঙ্গারাম, বোকচন্দ্র ঠাকুর, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। পুণ্যপ্রভা তাহার জীবনের সর্ব্বস্ব, তাহাকে আজ ছট্‌ফটু করিতে দেখে মনটা বড়ই চঞ্চল হয়েছে, চন্দ্রকলাকে রাগ করে বলিলেন,—"দ্যাখ কি, তুলে বিছানায় নিতে নাই কি? একটা মানুষ তোমার সম্মুখে মর্‌ছে, আর তুমি তামাসা দেখ্‌ছ? বোধ হয় এসকলই তোমার চক্রান্ত!" এই কথা শুনে চন্দ্রকলা তেলে বেগুণে জ্বলে উঠে বলিতে লাগিলেন, "তা যত দোষ আমার বই কি? তুমি নবপ্রেমে মেতেছ, আজ ত সব দোষ আমারই কাঁধে চাপাবে! বলি, কাল ইহার শিরশ্ছেদ কর্‌তে আদেশ করেছিলে না? বলিহারি তোমার অনুরাগ ও বিরাগ! তা তুমি এখন ইহাকে মাথায় করে নাচো। আমার বাবার শ্রাদ্ধ পড়ে নাই যে, আমি তুলে নিব? আমি কি ওর দাসী নাকি? এইরূপ অপমানের কথা বল, পুলিসে হাজির হয়ে সব সত্য প্রকাশ কর্‌ব।" এইরূপ শাসাইতে শাসাইতে, এইরূপ ভৎর্সনা করিতে করিতে হিংসাদেবী গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন। সেখানে রহিলেন, কেবল কালীকান্ত আর পুণ্যপ্রভা। বিপদের দিনে এ পৃথিবীতে বিপদ ভিন্ন আর সহায় মিলে না। ঘোর বিপদে আজ একাকিনী পুণ্যপ্রভার পার্শ্বে ঘোরতর জীবন্ত বিপদ একমাত্র কালীকান্ত! বিধাতা এরূপ রঙ্গ দেখে সুখী হন, কিন্তু মানুষের প্রাণে সহ্য হয় না। হা অ-দৃষ্ট!!

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

দুর্ব্বল ও প্রবলের সংঘর্ষণ।

বিপদের সময় বিপদও মানুষের বন্ধু হয়; একটী গুরুতর বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য মানুষ লঘুতর বিপদকে সাদরে আলিঙ্গন করে। বৈদ্য বলেন, "বিষে বিষক্ষয়।" হোমিওপ্যাথিক-প্রবর্ত্তক হ্যানিম্যান বলেন, "যে কারণে যে রোগের উৎপত্তি, সেই কারণেই সেই রোগের উপশম হয়।" পুণ্যপ্রভার মহা বিপদ কালীকান্ত, আশুবিপদের বন্ধুরূপে আজ পরিণত। পুণ্যপ্রভা উপায়ান্তর নাই দেখিয়া আজ কালীকান্তের সাহায্যও সাদরে গ্রহণ করিলেন।

কালীকান্ত আজ একটু নরম হইয়া বলিলেন, "তুমি কিছু মনে করো না, আমি যদি তোমার কোন উপকার করি, তোমার পিতার ঋণ শোধ দেওয়া হইবে, এই ভাবে নয় আজ আমার উপকার গ্রহণ কর। ধূলিশয্যা তোমার সোণার অঙ্গে সাজে না, ঘরে চল, ডাক্তার ও ঔষধের অভাব নাই, এখনই যন্ত্রণা নিবারণ হবে।"

পুণ্যপ্রভা ইশারায় বলিলেন, তুমি আমাকে স্পর্শ করো না, আমি যাই-তেছি। এই কথা বলিয়া পুণ্যপ্রভা অতি কষ্টে কালীকান্তের সহিত ঘরে গেলেন। কালীকান্ত ডাক্তার ডাকিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা করিতে বলিলেন এবং আপনি পুণ্যপ্রভাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। পুণ্যপ্রভা আজ এতটুক নীচে নামিতে বাধ্য হইলেন।

ডাক্তার ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন বটে, কিন্তু দুই প্রহরের মধ্যে চক্ষু ও মুখ ফুলিয়া উঠিল। ডাক্তার সকলই জানিতেন। তিনি আরো তীব্র ঔষধ দিলেন। যন্ত্রণা উপশম হওয়ার পরিবর্ত্তে অপরাহ্নে আরো যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইল। পুণ্য-প্রভা শয্যাশায়িনী হইয়া রহিলেন। কিছুই আহার করিতে পারিলেন না। ডাক্তার ও চন্দ্রকলার আনন্দ আর ধরে না।

অপরাহ্নে চরনগরে ফরিদপুরের লোক ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে, সেখানে কোনরূপ তদ্বির হয় নাই; পুলিস সাহেব ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং তদারকে আসিতেছেন। এদিকে বিধিকৃষ্ণপুর হইতে সংবাদ আসিল যে, হরিগোপাল বাবুর কিছু ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে যেন ডাক বসিয়া গিয়াছে, একদিনের পথের সংবাদ আসিতেছে, ৩।৫ ঘণ্টায়।

কোথাও নৌকার ডাক, কোথাও ঘোড়ার ডাক, কোথাও লোকের ডাক বসিয়া গিয়াছে। কোথাও ডিঙ্গি ছুটিতেছে, কোথাও ঘোড়া ছুটিতেছে, কোথাও লোক ছুটিতেছে। টাকা জলের ন্যায় ব্যয় হইতেছে। এসকল যাঁহার জন্য, তিনি কিন্তু শয্যাশায়িনী; তিনি কিন্তু এখনও হাতের বাহিরে। কোন্ আশায় কালীকান্ত আজ মত্ত? আশার গঙ্গাযাত্রা হইয়াছে, এখন প্রাণের দায়ে যা কিছু কাজ হইতেছে।

হরিগোপাল বাবুর নিকট একজন প্রধান কর্ম্মচারী প্রেরিত হইল। তিনি রাত্রি ১২টার সময় আসিয়া সংবাদ দিলেন, "হরিগোপাল বাবুর শরীর আজ অসুস্থ, মনটা যেন আজ ভারি ভারি বোধ হইতেছে, তাঁহার নিকট বড় কিছু আশা নাই। যাহা হউক, কোন্‌পথ অবলম্বন করিবেন, সে সম্বন্ধে কাল প্রাতে তিনি স্পষ্ট উত্তর দিবেন।"

রাত্রি ১২টার পর ধলামেঞার বাড়ী লোক প্রেরিত হইল। ধলামেঞা আর এখন বর্ত্তমান নাই, কিন্তু সংগুণান্বিত এক বংশধর তাঁহার গৌরব ও সুনাম রক্ষা করিতেছেন! ফরিদপুরের ইতিহাসে রাজনগরের রাজা রাজবল্লভ যেমন বিখ্যাত, ধলামেঞাও তেমনি বিখ্যাত। ধলামেঞা মুসলমান সম্প্রদায়ের এক বিখ্যাত বিভাগের নেতা। ধলামেঞার অত্যাচার নিবারণ করিতে এক সময়ে গবর্ণমেণ্টকে পর্য্যন্ত হাবুডুবু খাইতে হইয়াছিল। অসংখ্য লোক ধলামেঞার বশ ছিল, তিনি যাহা মনে করিতেন, তাহাই করিতেন। শত শত হিন্দু রমণী অপহরণ, শত শত গৃহস্থের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া এক সময়ে ফরিদপুরের কালাপাহাড় রূপে ইনি প্রতিভাত হইয়াছিলেন। শিশুদিগকে ঘুম পাড়াইবার সময় "বর্গী এলো দেশে" প্রভৃতি গান গাহিয়া লোকেরা ভয় দেখাইয়া থাকে। ফরিদপুরে এক সময়ে ধলামেঞার গান গাইয়া শিশুদিগকে ঘুমপাড়ানের সময় ভয় দেখান হইত। সে সকল অত্যাচারের কথা লিখিতে বা বলিতে পারে, এমন সাধ্য লোকের নাই। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, সকল জাতির লোকেরা ভয়ে অস্থির ছিলেন, কখন কাহার কি সর্ব্বনাশ হয়। ধলামেঞার ভয়ে কেহ কথাটী বলিতে পারিত না। শুনা গিয়াছে, এক সময়ে কোন ব্রাহ্মণ তাহার নিন্দা করিয়াছিল। মেঞা সে কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের সম্মুখে তাহার স্ত্রীর সতীত্ব নাশ করিয়াছিল এবং ব্রাহ্মণের শিশুকে পিতা মাতার সম্মুখে জলে ডুবাইয়া দিয়াছিল। সে সকল কথা লিখিতে গেলে পুস্তক বড়ই বাড়িয়া যায়। তাহার পরাক্রম গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় শেষে খর্ব্ব হয়। এখন পূর্ব্বের ন্যায়

তাহার বংশের প্রতাপ না থাকিলেও, বংশধর পূর্ব্বের দুর্জ্জয় গৌরব কতকটা রাখিতেছেন। মেঞার বংশধর আজও উপস্থিত হইবামাত্র পঞ্চাশ সহস্র কি ততোধিক মুসলমান ফরিদপুরের যে কোন স্থলে উপস্থিত হইবে। আমরা তাহার বাড়ী দেখিয়াছি, সেখানে নমাজের বেশ বন্দোবস্ত আছে, ধর্ম্মচর্চ্চাও আছে, কিন্তু শুনিয়াছি, অত্যাচারও প্রচুর পরিমাণে আছে। তাহার বংশধরের অত্যাচার খর্ব্ব করিতে পাঁচ্চরের চক্রবর্ত্তী বংশে জনৈক মহাত্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু দরিদ্র ব্রাহ্মণ আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই, শেষে জেলে প্রাণ দিতে হইয়াছে। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে চক্রবর্ত্তী বাবু জীবিত ছিলেন। রাত্রি ১২টার পর ধলামেঞার বাড়ীতে কালীকান্ত সাহায্যের জন্য লোক পাঠাইলেন। ডাক্তারের চিকিৎসা ডাক্তারগণ বিনা টাকায় করেন; উকীলের মোকদ্দমা রুজু হইলে বিপক্ষ উকীল পান না, বিনা টাকায় উকীলগণ উকীলের মোকদ্দমা করেন; হাকিমের মোকদ্দমা উঠিলে হাকিমগণ অন্য পক্ষকে শাস্তি দিয়া হাকিমকে রক্ষা করেন; অত্যাচারী জমীদারের সাহায্য অত্যাচারী লোক করিবে, বিচিত্র কি? কথায় বলে, "চোরে চোরে মাসতুতো ভাই"। গ্রিফিথ্‌স্ সাহেব একজন নিরপরাধী বালককে চাপরাশী দ্বারা প্রহার ও অপমান করিলেন, তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে অবতরণ করিলেন, স্বনামখ্যাত মহামতি ক্রপ্ট সাহেব! সর্ব্বত্রই নিয়ম এই, সমকক্ষকে রক্ষা করিতে সমকক্ষ দল নিত্য হাজির। কালীকান্তকে সাহায্য করিতে ধলামেঞার বংশধর যে অগ্রসর হইবে, কিছুই বিচিত্র নয়। কালী কান্ত আজ মেঞার শিষ্যানুশিষ্য, সুন্দরী কন্যাহরণরূপ মহাসাধনায় তিনি সিদ্ধ হইয়া আজ তাহারই নাম রক্ষা করিতেছেন। এহেন কালীকান্তকে সাহায্য করিবেন যে ধলামেঞার বংশধর, কিছুই বিচিত্র নয়। রাত্রেই মেঞার বাড়ীতে জয়ঢাক নিনাদিত হইল, রাত্রের মধ্যেই বিশ ত্রিশ সহস্র লোক সংগৃহীত হইল। লুসাই সর্দ্দারেরা যুদ্ধ করিবার পূর্ব্বে গ্রামে গ্রামে সঙ্কোচ-সূচক লাঠী চালায়। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে লাঠী মুহূর্ত্তের মধ্যে হাতে হাতে চলিয়া যায়; সঙ্কেত-সূচক লাঠী পাইলে, যে যে অবস্থায় থাকিবে, অন্যকে সংবাদ দিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হইবে। ধলামেঞারও নিয়ম এই, জয়ঢাকের শব্দ শুনিবা মাত্র তাঁহার পক্ষের লোককে সমবেত হইতে হইবে। আজ শেষ রাত্রে জয়ঢাকের শব্দ শুনিয়া অনেকের প্রাণ চম্‌কাইল। সকলে ভাবিল, নিশ্চয় কাহারও সর্ব্বনাশ হইবে। কিন্তু কাহার সর্ব্বনাশ, কে জানে?

যে সময়ের কথা লেখা যাইতেছে, এই সময়ে মাদারিপুর. উপবিভাগে, সাধারণের পক্ষসমর্থন করিবার এবং দরিদ্রের সাহায্যের জন্য আরো দুই মহাত্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন, একজন পাঁচ্চরের চক্রবর্ত্তী বংশে, আর এক জন খালিয়ার রায়বংশে। দরিদ্রদিগকে যাঁহারা সাহায্য করেন, দরিদ্রদিগের যাঁহারা মা বাপ, কোন কালে কোন দেশেই তাঁহাদের প্রতিপত্তি, সম্মান বা প্রশংসা হয় নাই। কাঁদিতে তাঁহাদের আগমন, চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতেই গমন। খ্রীষ্ট ছিলেন দরিদ্রের বন্ধু,ক্রুসে প্রাণ হারাইলেন। শ্রীচৈতন্য ছিলেন, দরিদ্রের বন্ধু, কোথায় কি ভাবে কাহার হাতে তাঁহার প্রাণ গেল, কোন ব্যক্তি নির্ণয় করিতে আজ পর্য্যন্ত পারেন নাই। অস্বাভাবিক কথা অর্থাৎ কাষ্ঠময় জগন্নাথ মূর্ত্তিতে তাঁহার লীন হওয়ার কথা যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা করুন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক যুগে সকলের মন সে কথায় প্রবোধ মানে না। ম্যাট্‌সিনি ছিলেন দরিদ্রের বন্ধু, কারাগারে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটাইয়া শেষে বিনা চিকিৎসায় ফুস্‌ফুস্‌-প্রদাহে আল্‌পস্‌ পর্ব্বতে প্রাণ হারান! বিদ্যাসাগর ছিলেন দরিদ্রের বন্ধু,সম্মান তাঁহার এমনই,তাঁহার স্মৃতি-রক্ষা করা দূরের কথা,তাঁহার বোধোদয় খানিকে স্কুল-পাঠ্য হইতে তুলিয়া দিয়া, কলেজটীকে কিনিয়া লইয়া, তাঁহার নাম রক্ষার্থ কৃতীগণ বদ্ধপরিকর এবং তাঁহাকে গালাগালি দিতে জীবন-চরিত-লেখক অবতীর্ণ! গ্লাডোষ্টোন আজ কাল দরিদ্রের বন্ধু,ঠাট্টা বিদ্রূপ রূপ কলঙ্কের পশরা মাথায় বহিয়া,আজ তাঁহাকে, যে ব্যক্তি তাঁহার পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলির সমতুল্য লোক নয়, তাহারও কথার তলে চাপা পড়িতে হইতেছে। বিলাতের লর্ডগণ তাঁহার কুশপুত্তলিকা দাহ করিয়া সুখী! এই সকল মহাজনদিগের সহিত তুলনা করিতেছি না, দরিদ্র দেশের অবস্থার কথা কেবল বলিতেছি। বড় রাজ্যে বড় ব্যক্তিদের কথা যেমন, ছোট রাজ্যে ছোট ব্যক্তিদের কথাও তেমনি। বরং ছোট ব্যক্তিদের সম্বন্ধে নিন্দা আরও অধিক। খালিয়ার হতভাগ্য রায় এবং পাঁচ্চরের হতভাগ্য চক্রবর্ত্তী কেবল চক্ষের জল ফেলিবার জন্যই ফরিদপুরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অপমান, নির্য্যাতন, নিন্দা মাথায় বহিয়াই তাঁহাদিগকে যাইতে হইয়াছে। বিধিকৃষ্ণ-পুরের তারানাথ, পাঁচ্চরের চক্রবর্ত্তী, খালিয়ার রায় তিন জনই দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন। দেশের সভ্যমহলে রাষ্ট্র, তিন জনই অত্যাচারী, তিন জনই নীতি-হীন ব্যক্তি, ডাকাতের সর্দ্দার। পাঠক বুঝুন, কথাটা কিরূপ! গরিবের সাহায্য করিলেই, অর্থাৎ গরিবগণ বাধ্য থাকিলেই ডাকাতের সর্দ্দার উপাধি পাওয়া

যায়। রাজ্যের বড় বড় লোকেরা যাহাকে যেরূপ ভাবে প্রচার করেন, তাহাকে সেই রূপই হইতে হইবে। কথায় বলে "দশের মুখে ভগবান ভূত হন"। নিন্দা-সাগরের ঢেউ থামাইতে সাধ্য কাহার? হিংস্নুকের মুখ বন্ধ করে কার শক্তি? সভ্য-জগতের বিচারে হরিগোপাল ও কালীকান্তই ক্ষনজন্মা মহাপুরুষ। হায়রে বিচার!

অপ্রাসঙ্গিক কথা লিখিতেছি না। ধলামেঞার বাড়ীর জয় ঢাকের শব্দ শুনিয়া সকলের আগে ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, আজ পাঁচ্চরের চক্রবর্ত্তীর। কাহার সর্ব্বনাশ হইবে, তিনি ঠিক পাইতেছেন না। তিনি ব্যাকুল হইয়া সংবাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। রাত্রি প্রভাত হইলে সংবাদ পাইলেন যে, "বিধিকৃষ্ণ-পুরের তারানাথ গাঙ্গুলীর কন্যা অপহরণ করে চরনগরের কালীকান্ত বিবাহ করেছে! কালীকান্ত আজ মেঞার সাহায্যপ্রার্থী, এই জন্য জয় ঢাকের শব্দ।" চক্রবর্ত্তী ভাবিতেছেন, কন্যা যদি অপহরণ হয়ে থাকে, তবে আবার যুদ্ধের আয়োজন কেন? তারানাথ দরিদ্র ব্যক্তি, তিনি কি করিবেন? ভাবিয়া ঠিক পাইলেন না, কিন্তু তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। প্রত্যূষে ঘাটের ডিঙ্গিতে উঠিয়া বিধিকৃষ্ণপুর যাত্রা করিলেন। তিনি দরিদ্র ব্যক্তি, কিছু যে সহায়তা করিতে পারিবেন, সে সম্ভাবনা নাই, কিন্তু তবুও থাকিতে পারিলেন না, প্রাণটা অস্থির হইল, তিনি যাত্রা করিলেন।

দূর দূরান্তরের লোক যখন ধলামেঞার বাড়ী যাইতে লাগিল, তখন দেশে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। থালিয়ার রায় বাবুর নিকটও সংবাদ পৌঁছিল। তিনি তখন পীড়িত, উঠিবার শক্তি রহিত, তখন কিছু করিবার সামর্থ্য নাই, তবুও চারি জন লোক পাঠাইলেন। তারানাথকে এই পত্র লিখিলেন,— "দেব, আমার এই হাড়কখানি আপনারই সেবার জন্য। আপনার বিপদের কথা শুনে আমি আজ মৃতবৎ হইয়াছি, দুঃখে কষ্টে অধীর হইতেছি, ইচ্ছা হইতেছে, এখনই কালীকান্তের মাথা চিবাইয়া খাই, কিন্তু বিধি বাম, আমি আপনার সেবায় আজ লাগিলাম না। আমি রোগ-শয্যায় বসিয়া রহিলাম, আপনার জন্য প্রাণ দিবার প্রয়োজন হইলে দিব। আপনার বিপদ যেন আমারই, আমার প্রাণের গভীর সহানুভূতি ও যোগ সদা আপনার প্রতি রহিল। প্রাণ দেওয়ার কখন প্রয়োজন, সে সংবাদ যেন পাই। আমার এই কয়জন লোক ভৃত্যের ন্যায় আপনার সেবা করিবে।" অনুগত, শ্রী*** রায়।

দেশে যেন দুর্ব্বল ও প্রবলে আজ সংগ্রাম বাঁধিয়াছে। সৌভাগ্য যে,

দুর্ব্বলের পক্ষে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী। তিনি যদি বড় বড় ফৌজদারী মোকদ্দমার বাদী না হইতেন, এতদিন এদেশের দরিদ্র কাঙ্গালগণ অত্যাচারের প্রবল স্রোতে ভাসিয়া যাইত। দুর্ব্বল ও প্রবলের সংগ্রামে আজ মাদারিপুর যেন মাতিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু প্রাণ দিতে প্রস্তুত কে? সরলার দাদা আজ প্রাণ দিতে পারে, দিপ্তীর পিতা পারেন, চক্রবর্ত্তী পারেন, আর পারেন, রায়-কুলতিলক। শক্তিসামর্থ্যহীন কয়েকটী দরিদ্র আজ তারানাথের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। যাহা হউক, একটী লোকও আছে, ইহাও সৌভাগ্য। একটী প্রকৃত হৃদয়বান লোকও যে দেশে থাকে, সে দেশ ভবিষ্যতের আশা-হীন নহে। ফরিদপুরের বুঝিবা একটু আশা আছে। আজ আমাদের মনে পড়িতেছে, ফরাশী দেশের লামিনে মহাত্মার কথা। ভিক্টর হুগো প্রভৃতি দেশহিতৈষীগণ জাতীয় সমরে প্রাণ দিতে যাইতেছেন, লামিনে চলৎশক্তি রহিত, তিনি ভিক্টর হুগোকে বলিয়া দিলেন যে, "জাতীয় সমরে যখন প্রাণ দিবার সময় হইবে, আমাকে সংবাদ দিও, আমি বৃদ্ধ, যুদ্ধ করিতে পারিব না, তোমাদের সঙ্গে যাইয়া প্রাণ দিব"। এইরূপ শুনা যায়, তিনি বহু ঘণ্টা অনাহারে, চেয়ারের উপর, জাতীয় সমরে প্রাণ দিবার সময় জ্ঞাত হইবার জন্য একই অবস্থায় বসিয়া ছিলেন। তুলনা করি না, আজ দুর্ব্বল প্রবলের সমরে এ কথাটা আমাদের প্রাণে জাগিতেছে। বিধাতা এই করুন, মহাত্মা লামিনের মত ক্ষনজন্মা দেশহিতৈষী এ দেশে জন্ম গ্রহণ করুক।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

দারুণ ঝটিকার পর একটু চাঁদের আলো।

আজ তৃতীয় দিন, আজ বড়ই বিষম দিন। মাদারিপুরের ইনেস্পেক্টর তারানাথকে লইয়া বিধিকৃষ্ণপুর পৌছিয়াছেন; এ দিকে ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সাহেবের ছোট জাহাজ আঁড়িয়াল-খাঁ বহিয়া ক্রমে চরনগরের নিকট-বর্ত্তী হইতেছে। ইচ্ছা করিলে পূর্ব্ব দিনই জাহাজ চরনগরে পৌছিতে পারিত, কিন্তু রাত্রে জমীদার বাড়ী অবতরণ করা সুবিধাজনক নহে বলিয়া জাহাজ নদীর মধ্যে রাত্রি কাটাইয়াছে। সঙ্গে সেই নীলকান্তের নৌকা। এদিকে হরিগোপাল আজ কিছুর মধ্যে থাকিবেন না, ঠিক করিয়াছেন।

বলামেঞ্জার সহস্র সহস্র লোক চরনগরে উপস্থিত হইয়াছে। পরামর্শ হইয়াছে, যদি পুলিস বাড়ীতে ঢুকিতে চায়, তবে বলপূর্ব্বক পুলিস বেদখল করা হইবে। একদল লোক এই জন্য চরনগরে রহিল; অন্য দল হরি গোপালকে বলপূর্ব্বক দলে আনিবার চেষ্টার জন্য প্রেরিত হইল। যদি আজ প্রাতেও তিনি দলে থাকিতে গোল করেন, তবে তাঁহার বাড়ী লুণ্ঠন করা হইবে। মানুষের আস্পর্দ্ধা কত, পাঠক একবার দেখ!

মাদরিপুরের পুলিসের নৌকা যখন বিধিকৃষ্ণপুর উপস্থিত হইল, তখন কালীকান্তের তরফ হইতে এক প্রকাণ্ড ডালি পুলিস-পান্সীর নিকট উপস্থিত হইল। দুই মণ চাউল, আধ মণ ঘি, দশটা খাসি, ৫০ টা মুরগী, দুই শত ডিম, সন্দেশ, দধি, ক্ষীর, মসলা, মৎস্য, তরকারি সকলই উপযুক্ত রূপ। ইন্‌স্পেক্টর মহা খুসি। ভোজন দক্ষিণা তাহার উপর সহস্র টাকা। চাকরীর মমতায় এরূপ উপঢৌকন কে ছাড়িতে পারে? শত কি দেড় শত টাকার চাকরী থাকিল কি গেল, কে তাহার তোয়াক্কা রাখে? পুলিস ইন্‌স্পেক্টর আজ মহা খুসী। তিনি তারানাথের প্রতি কথা উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন এবং ধমকাইতেছেন যে, বেণীমাধব মিথ্যা এজাহার দিয়াছে। এদিক ত এইরূপ চলিতেছে; ও দিকে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ও পুলিস সাহেবের নৌকা যখন চরনগরের বাজারে পৌঁছিল, তখনও প্রকাণ্ড ডালি জাহাজের নিকট উপস্থিত হইল। এত বড় ডালির কথা সচরাচর শুনা যায় নাই। এক শত বাহকে সমস্ত দ্রব্য বহিয়া আনিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সাহেব এ সকল দেখিয়া চটিয়া লাল হইয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অল্প কয়েক বৎসর হইল বিলাত হইতে আসিয়াছেন, এখনও এ সকলে অভ্যস্ত হন নাই, তিনি লোকদিগকে তিরস্কার করিলেন এবং সমস্ত জিনিস ফেরত দিলেন। পুলিস-সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আর কি করেন, জিনিস যখন ফেরত চলিল, তখন তাহার দলের সকলের মুখ বিষণ্ণ। কালীকান্তের লোকেরা বড়ই বিপদ গণিতে লাগিল। সকল দ্রব্যাদি ফেরত দিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সাহেব, ১৫।২০ জন উপযুক্ত পুলিসের লোক সঙ্গে লইয়া, দুটী বন্দুক হাতে করিয়া, বাহির-বাড়ীর পথ দিয়া চরনগরের জমীদার বাড়ী যাত্রা করিলেন। সেই বাঙ্গালী বাবু সঙ্গে, নীলকান্তও সঙ্গে। তাঁহারা একেবারে সকলকে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সাহেবী রক্ত, কাপুরুষ বাঙ্গালীর কথা বীরত্ব প্রকাশের সময় শুনিবে কেন? সাহেবেরা বীরদর্পে জমীদার বাড়ীতে চলিলেন।

যখন তাঁহারা কালীকান্তের বাহির-বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন একজন প্রসিদ্ধ লাঠিয়াল বাড়ী প্রবেশ করিতে নি[illegible] [illegible]রিয়া বলিল, "হুজুর, আপনারা এইখানে অপেক্ষা করুন, আমি রাজা-বাবুর আদেশ লইয়া আসি, তারপর বাড়ীতে উঠিবেন।" সাহেবেরা সে কথা গ্রাহ্য না করিয়া বাড়ী প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তখন নিমেষ মধ্যে শত শত লাঠিয়াল আসিয়া সাহেবদিগকে ও পুলিসের লোকদিগকে বেষ্টন করিল। এইরূপ সময়ে সাহেবেরা ভয় পাইবার লোক নহে। দুই সাহেব তখনই গুলি চালাইতে আরম্ভ করিলেন। লাঠিয়ালগণও মার মার করিয়া পড়িল। কিন্তু অনাহার-ক্লীষ্ট জীর্ণ দেহ লইয়া তাহারা আজ আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। দুর্ভিক্ষের তীব্র দংশনে অনেকেই মৃতপ্রায়। ফরিদপুরের লাঠিয়াল শ্রেণী দেশবিখ্যাত, কিন্তু হইলে কি হয়, আজ অস্থিচর্ম্ম-সার নর-কঙ্কালরাশি ইংরাজের গুলির নিকট টিকিতে পারিল না। কার্ট্রিজ বন্দুক মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আওয়াজ হইতে লাগিল, কতক্ষণ বন্দুকের সম্মুখে ঢাল সুল্‌পি তরবারি লইয়া অর্দ্ধমৃতবৎ লোকরাশি দাঁড়াইতে পারে? দেখিতে ২ প্রবল ঝড়ের কলাগাছের ন্যায় অনেক লোক হত এবং আহত হইয়া পড়িল। সাহেবদিগের পক্ষের লোকও কয়েক জন হত ও আহত হইল। তুমুল সংগ্রাম; কিন্তু অবশেষে [illegible]হেবদিগেরই জয় হইল। ইতি মধ্যে ষ্টিমার-সংলগ্ন বজরা হইতে আরো রিজার্ভ পুলিসের লোক আসিয়া জুটিল, লাঠিয়াল শ্রেণী শেষে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। যখন চতুর্দ্দিকে সকলে পলায়ন করিতে লাগিল, তখন পুলিসের লোক যাহাকে পাইতে লাগিল, তাহাকেই গ্রেপ্তার করি[illegible] [illegible]াগিল। কালীকান্তের বাড়ীর বড় ছোট অনেক লোকই গ্রেপ্তার হইতে লাগিল। আজ কালীকান্তের বাড়ী যেন পাবনার আজিম চৌধুরীর বাড়ী হইয়াছে—চতুর্দ্দিকে লুটপাট হইতে লাগিল। নীলকান্ত একে একে প্রধান প্রধান লোকদিগকে সেনাক্ত করিতে লাগিলেন, আর পুলিস সকলকে হাতে কড়া দিয়া বাঁধিতে লাগিল। যখন সকলকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তখন বাঙ্গালী বাবু অন্তঃপুরে যাইয়া পুণ্যপ্রভাকে উদ্ধার করিলেন। পুণ্যপ্রভার আকৃতি দেখিলে আজ পাষাণও ফাটিয়া যায়; মুখ বিকৃত, চুল বিকৃত, সে পূর্ব্বের শোভা সৌন্দর্য্য নাই—সে কিছুই নাই। দুশ্চিন্তা এবং ভাবনায় আকৃতি কতক মলিন হইয়াছে—আর আকৃতি বিনষ্ট হইয়াছে চন্দ্রকলার চক্রান্তে। কে এমন সোণার প্রতিমার এইরূপ দশা করিল? সহৃদয় বাঙ্গালী বাবু

জিজ্ঞাসা করিলেন। পুণ্যপ্রভা নীরবে রহিলেন, কিন্তু পার্শ্বের আর দুইজন লোক বলিল যে, কালীকান্তের স্ত্রী চন্দ্রকলা।

আজ এমনই দুর্দিন যে, কেহ আর যেন কালীকান্তের পক্ষে নাই, সকলেই সত্য কথা বলিতেছে। বহু লোকের এজাহার লওয়া হইল। পুণ্যপ্রভার এজাহারও লওয়া হইল। পুণ্যপ্রভা আসিবার সময় পথে যাহা যাহা করিয়াছিলেন, সমস্ত বিবৃত করিলেন। কালীকান্তের বাড়ীতে যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, পুণ্যপ্রভা সে সকলও বলিলেন। অপূর্ব্ব এজাহারের কাহিনী শুনিয়া বাঙ্গালী বাবু অবাক্, সাহেবগণও অবাক্। সাক্ষীগণের কথানুসারে চন্দ্রকলাকেও গ্রেপ্তার করা হইল। হতভাগিনীকে যখন ধরা হইল, তখন সে চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। ৩।৪ ঘণ্টার মধ্যে কালীকান্তের বাড়ী পূর্ব্বের শোভা সৌন্দর্য্য হারাইল। দ্রব্যাদি লুট পাট হইল,—কে কোথায় কি নিল, কে ঠিক করিবে? বাড়ী কাহার চার্জ্জে থাকিবে, কালীকান্তকে জিজ্ঞাসা করা হইল। তিনি মুকুন্দরামের নাম করিলেন। সুতরাং মুকুন্দরামের হাতে বাড়ীর সমস্ত জিনিসের ফর্দ্দ করিয়া দেওয়া হইল ও রসিদ লওয়া হইল এবং বাড়ীতে পুলিস প্রহরী রাখা হইল। যখন সমস্ত বন্দোবস্ত হইল, তখন ষ্টিমারের সহিত আরো ২ খানি বড় নৌকা বাঁধিয়া দেওয়া হইল এবং তাহাতে সমস্ত আসামী বোঝাই করা হইল। পুণ্যপ্রভাকে পৃথক পাল্কীতে লইয়া বাঙ্গালী বাবু ও পুলিস সাহেব তীরপথে বিধিকৃষ্ণপুর চলিলেন। পুণ্যপ্রভার এজাহারের সমস্ত কথা সত্য কি না, তাহা জানা-ই উদ্দেশ্য। সমস্ত যখন নৌকায় উঠান হইল, তখন ষ্টিমার বিধিকৃষ্ণপুর অভিমুখে চলিল। যখন ম্যাজিষ্ট্রেটের জাহাজ চরনগর ছাড়িল, তখন সকলে বলাবলি করিতে লাগিল—"এত অত্যাচারও কি সয়? যেমন কর্ম্ম, তেম্‌নি ফল হাতে হাতে, বেশ হয়েছে।" স্ত্রীপুরুষ, বালক বৃদ্ধ, ভদ্র অভদ্র—সকলের মুখে এই এক কথা। আর কালীকান্তের পরামর্শদাতাগণ? তাঁহারা টাকা ব্যয়ে আসামীদিগকে খালাস করিয়া আনিবেন, তাহার বন্দোবস্ত করিতেছেন। ব্যারিষ্টার,উকীল ও মোক্তারের বাড়ী লোক ছুটিতে লাগিল। যেখানে ছিল,"জোর যার মুল্লুক তার",এখন সেখানে শুনা যাইতেছে "কেবল হাহাকার।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের জাহাজ যথা সময়ে বিধিকৃষ্ণপুর পৌছিল। আসামী বোঝাই নৌকা ২ খানি দেখিয়া গ্রামবাসীদিগের। আজ অপার আনন্দ। পরের

বিপদে আনন্দ করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ, সে কথা লোকেরা আজ ভুলিয়াছে, অত্যাচারের প্রতিশোধের জন্য মানুষ লালায়িত। আজ অসংখ্য আসামী দেখিয়া বিধিকৃষ্ণপুরের লোক সকলের আনন্দ আর ধরে না। সকলে দেবী প্রসন্নময়ী, তারানাথ ও জগদম্বার জয় জয়কার করিতেছে। বিধিকৃষ্ণপুর বিষাদ রজনীর পর আজ যেন চাঁদের জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত। সহানুভূতির অপূর্ব্ব আনন্দ-বাজার ঘরে ঘরে বসিয়া গিয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের জাহাজ দেখিয়া মাদারিপুরের পুলিস ইন্‌স্পেক্টরের মুখ চূণ হইয়া গিয়াছে। যথা সময় পুলিস সাহেবও পৌঁছিলেন। কি করিবে, ভাবিয়া ঠিক পাইতেছে না। অন্যরূপে রিপোর্ট দিবার সমস্ত আয়োজন হইয়াছে, এখন উপায় কি? দ্রব্যাদিই বা কোথায় লুকান যায়, টাকারই বা কি করা যায়? ভাবিয়া ইন্‌স্পেক্টরের মুখ চূণ। আজ আর কোন বুদ্ধিতেই কুলাইল না, সমস্ত চাতুরীধরা পড়িল। দ্রব্যাদি ধরা পড়িল,নোটবুকের লেখা ধরা পড়িল। এক মোকদ্দমায় দুই মোকদ্দমার আয়োজন হইল। বিধিকৃষ্ণপুরের সমস্ত সাক্ষীর তন্ন তন্ন করিয়া জবানবন্দি লওয়া হইল। সে এক প্রকাণ্ড ইতিহাস, সে সকলের উল্লেখের প্রয়োজন নাই। হরিগোপালের বাড়ী আক্রমণের জন্য মেঞা সাহেবের যে সকল লোক অগ্রসর হইয়াছিল, পথিমধ্যেই চরনগরের দুর্দ্দশার কথা তাহারা শুনিয়াছিল, তাহারা অন্যদিকে যাইয়া দুর্ব্বল পীড়ন করিতে লাগিল; কেহবা ভয়ে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইল। হরিগোপাল বাবু আমূল সমস্ত কথা স্বীকার করিলেন। তাঁহাকে আসামী শ্রেণীতে কি মহা-রাণীর সাক্ষীতে রাখা হইবে, সে সম্বন্ধে এখন কোন মীমাংসা হইল না। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব দীপ্তিকে ফরিদপুর চিকিৎসার জন্য প্রেরণের জন্য খুব পীড়া-পীড়ি করিতে লাগিলেন, কিন্তু গ্রামবাসী সকলে মিলিত হইয়া প্রার্থনা জানাইল যে, তাহা হইলে একেবারে জাতি মান যায়। ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস-সাহেব পরামর্শ করিয়া, মাদারিপুরের ডাক্তারকে বিধিকৃষ্ণপুরে ষ্টিমার-যোগে আনয়ন করিলেন এবং তাঁহার চিকিৎসার অধীন করিয়া রাখিলেন। পুণ্য-প্রভার চিকিৎসার ভারও,সকলের অনুরোধে,ঐ ডাক্তারের হস্তে ন্যস্ত করিয়া, ইন্‌স্পেক্টরকে সস্পেণ্ড করিয়া, আসামীদিগকে চালান দিয়া পুলিস-সাহেব ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ফরিদপুর যাত্রা করিলেন। বিধিকৃষ্ণপুরে পুলিসের লোক রহিল। বাঙ্গালী বাবুকে মাদারিপুর থানার চার্জ্জ দেওয়া হইল। গবর্ণমেণ্টের তরফ এবং কালীকান্তের তরফ, উভয় তরফ হইতেই রীতিমত মোকদ্দমা

চালাইবার সমস্ত আয়োজন হইতে লাগিল। ফরিদপুরের গবর্ণমেণ্টের উকীল এই মোকদ্দমা চালাইতে মাদারিপুর আসিবেন, শুনা যাইতে লাগিল। যাহা কখনও ঘটে নাই, এই মোকদ্দমার এমন আয়োজন!! দারুণ ঝটিকার পর যেন একটু চাঁদের ক্ষীণ রশ্মি চতুর্দ্দিকে আলো বিকীরণ করিতে লাগিল। মানুষের আনন্দের সীমা নাই, কিন্তু এখনই কি ঝটিকার সম্ভাবনা একেবারে গিয়াছে? তাহা কেহই বলিতে পারে না। ভবিষ্যতের সকল ঘটনাই অ-দৃষ্ট।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

অত্যাচার-পেষণে হিতৈষীর ভাবনা।

লাঠিয়াল যখন গ্রামে নামে,তখন গ্রামের লোক হতবুদ্ধি হয়। একে দুর্ভিক্ষের বৎসর, দিনে রাত্রে সর্ব্বত্র চুরি ডাকাতি হইতেছে। ভাঙ্গার কালেক্টারি দস্যুরা লুটিয়া লইয়াছে,পূজার সরঞ্জাম সহ বড় বড় মহাজনদিগের বহু নৌকা আসিতেছিল,কুমারের মধ্যে তাহার দশ বারো খান মারা গিয়াছে। মাদারিপুরের নদীর ওপারে দিনে দুপ্রহরে ডাকাতি হইতেছে। কথায় বলে,"চোরের রাত্রিবাসই লাভ," অনেক স্থলে তাহাই হইতেছে। শুনা যাইতেছে,কোন গৃহস্থের বাড়ীর একশের চাউল, কাহার বা এক হাঁড়ি পান্তাভাত, কাহারও দুই চারি খানি ছিন্ন কন্থা পর্য্যন্ত চুরি যাইতেছে। মোকদ্দমায় মোকদ্দমায় জেল ভরিয়া গিয়াছে—জেলে গেলে আহার পাওয়া যাইবে, এই জন্যই যেন সকলে চুরি ডাকাতি করিতেছে! পেটের দায় বড় বিষম দায়, হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। এই ত দেশের অবস্থা। এ হেন অনাহার-ক্লীষ্ট লোকদিগের হস্তে আজ ঢাল-সুন্নি-তরবারি, এহেন লোকেরা আজ সহস্র সহস্র একত্রিত। ম্যাজিষ্ট্রেট বা কি করিবেন, পুলিস সাহেব বা কি করিবেন? ধলামেঞার পঙ্গপাল তুল্য লাঠিয়ালগণ আজ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, তাহারা পরাজিত হওয়ায় তেজ যেন আরো বাড়িয়াছে। ইন্দুরের নিকট যেমন বিড়ালের তেজ,আজ তাহাদের তেমনি তেজের স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। বিড়াল যেমন শীকারি কুকুরের নিকট ভয়ে প্রস্রাব বাহে করিয়া ফেলে, এই লাঠিয়ালশ্রেণীও সাহেবদিগের নিকট আজ তেমনি করিয়াছে বটে,কিন্তু নিরীহ ইন্দুরের প্রতি বিড়ালের লম্ফ ঝম্পের ন্যায়

আজ অসহায় ব্যক্তিদিগের উপর ইহারা অত্যাচারের ভীষণ বাণ নিক্ষেপ করিতেছে। ইংরাজের ফৌজ যে দেশ দিয়া যায়,সেই দেশ বিনষ্ট হয়; আর আজ ধলামেঞার ক্ষুধিত লাঠিয়াল-শ্রেণী যে গ্রাম দিয়া যাইতে ল, সেই গ্রাম সকলও উচ্ছিন্ন যাইতে লাগিল। পেটে দারুণ ক্ষুধা, হাতে অস্ত্র,জাতিতে মুসলমান, তার উপর আশ্বিন মাসের তীব্র রৌদ্রের পরাক্রম। উন্মত্ত লাঠিয়ালশ্রেণী মার মার করিয়া বহু গ্রাম লুণ্ঠন করিতে করিতে চলিতে লাগিল। "মজালি কনক লঙ্কা মজিলি আপনি" ধলামেঞার লাঠিয়াল নামাইয়া কালীকান্ত যেন এই কথার জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইতে লাগিলেন। আ র বাড়ী লুণ্ঠিত হয়েছে, এখন আরো কত শত শত নিরপরাধীর বাড়ী লুণ্ঠিত হই লাগিল।

হবিগঞ্জের মেঞারা বড় সম্ভ্রান্ত লোক,জমীদারী বেশ ছিল,তাঁহাদের উপাধি চৌধুরী। তাঁহাদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখে না, এমন লোক মাদারিপুর মহকুমায় বিরল। টাকা ধার দিয়া কালীকান্ত সুদে আসলে পঞ্চাশ হাজার টাকা ডিগ্রি করিয়া মেঞাদিগের এক হিস্যার বিষয় সম্পত্তি নীলামে খরিদ করিয়া নিজস্ব করিয়াছেন। এই সম্পত্তির শোকে এক মেঞা কিছুদিন হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। কালীকান্তের লোক যখন জমী দখল করিতে আইসে,তখন এক বিবি তাঁহার নামে কতক বিষয় আছে বলিয়া আপত্তি করিয়াছিলেন। ১০। ১২ দিন হইল সে বিষয়ও চক্রান্ত করিয়া কালীকান্ত নিয়াছেন। সেই হইতে কিন্তু বিবির উপর তাঁহার দারুণ কোপ ছিল। আজ তিনি গিয়াছেন, কিন্তু তাহার প্রধান কর্ম্মচারী,চন্দ্রকলার সহোদর,মুকুন্দরাম বিদ্যাবাগীশ, বি-এ, বি-এল,আছেন। যেমন ভগ্নী,তারই উপযুক্ত ভ্রাতা বটে। তিনি একজন দিগ্বিজয়ী ধুরন্ধর লোক, আজ ধলামেঞার লাঠিয়াল চালাইয়া তিনি বিবির গোলাবাড়ী লুণ্ঠন করাইলেন। ঘর হইতে লাঠিয়ালের খোরাকী দিতে হইলে আজ দুই তিন সহস্র টাকা গণিতে হয়, তাহা তিনি পারেন না, বাঁস হইতে কঞ্চি অধিক শক্ত, তিনি এইরূপে লুট-পাট করাইয়া লাঠিয়ালের খোরাকী জুটাইতে লাগিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সাহেবের জাহাজ যখন বিধিকৃষ্ণপুর ছাড়িয়া ফরিদপুর রওয়ানা হইল, তখন মুকুন্দরাম আপন বেশ ধারণ করিলেন। বিধিকৃষ্ণপুরের হরিগোপালের বাড়ী লুণ্ঠন করিতে বলিলেন। সে স্থান কিছু শক্ত জায়গা, সেখানে একটু ধাক্কা সামলাইতে হইল, হরিগোপালের পক্ষে লাঠিয়াল কম ছিল না, উভয় পক্ষে কুমারের তীরে খুব এক লড়াই হইল।

গিয়াছি ত গিয়াছি, মুকুন্দরামের এই জেদ। একবার "দেখি, কার কত শক্তি!" এই কথায় বুক বাঁধিয়া তিনি আজ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

এইরূপ যখন অত্যাচার চলিতে লাগিল, তখন পুলিসের লোক সংবাদ লইয়া মাদারিপুর যাত্রা করিল, আমাদের সেই বাঙ্গালীবাবু আবার নূতন লোকজন লইয়া তদারকে আসিলেন; কিন্তু তখন লাঠিয়ালশ্রেণী ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিয়াছে। তিনি কাহাকেও পাইলেন না।

চক্রবর্ত্তী বাবু বিধিকৃষ্ণপুর আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে তাঁহাকে ধরিয়া, সঙ্গে যাহা ছিল, পরিধানের বস্ত্র সহ সে সমস্ত কাড়িয়া, নৌকা ডুবাইয়া, লাঠিয়ালগণ পলায়ন করিয়াছে।

হাট বাজার আজ বন্ধ। ঘর দরজা বন্ধ। যে পথ দিয়া লাঠিয়ালশ্রেণী গিয়াছে, সে পথে আর কিছুই নাই।

এইরূপ দৃশ্য প্রেমাঙ্কুর আর কখনও দেখেন নাই। তিনি অল্প সময় বিধিকৃষ্ণপুর আছেন, ইহাতে তাঁহার বহুদর্শিতার চূড়ান্ত হইয়াছে। দেশের শোচনীয় অবস্থা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার দুচক্ষে জলধারা বহিতেছে, আর ঈশ্বরের নিকট বলিতেছেন, "এই দরিদ্র দেশের কি নিস্তার হইবে না?" তিনি দুঃখে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, নানা প্রকার দুশ্চিন্তা তাঁহাকে আক্রমণ করিতেছে, তিনি ভাবিতেছেন—"এই সকল পাপেই বুঝি বা এই দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়েছে। যে দেশে এত পাপ, সে দেশের মঙ্গল কোথায়? দেশের শিক্ষা-বিস্তার, রাজনীতির আন্দোলন, সকলই বৃথা, যদি দেশ পাপের নিদারুণ আক্রমণ হইতে সুরক্ষিত না হয়। এত দিনের শিক্ষা-বিস্তারে বুঝিবা এদেশের কিছুই উপকার হয় নাই, এতদিনের রাজনৈতিক আন্দোলনে এদেশের এক চুলও গতি ফিরে নাই—ভারত যে তিমিরে, সেই তিমিরে।" তিনি একজন দেশহিতৈষী ব্যক্তি, তিনি ভাবিতেছেন,— "চরিত্রের উন্নতি না হইলে এদেশের কিছু হইবে না। কি করিলে দেশের লোক মানুষ হইতে পারে, সর্ব্বতোভাবে সেই চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু চেষ্টা করিবে কে? সম্মান-প্রত্যাশী, যশোলোলুপ ব্যক্তিরা সহরে ঢাক ঢোল বাজাইয়া দেশোদ্ধার করিতে চাহে, দেশের ভিতরের অবস্থা জানে বা কে, তাহার প্রতিকার করে বা কে? কুলীর অত্যাচারের আন্দোলন হয়, নীলকরের অত্যাচারের আন্দোলন একদিন হইয়াছিল, কিন্তু জমীদার শ্রেণীর অত্যাচার-প্রতিরোধের আজ পর্য্যন্ত তেমন আন্দোলন হয় নাই—অধিকাংশ

স্থলেই পূর্ব্বের অপেক্ষা অত্যাচারের মাত্রা আরো বাড়িয়াছে। শিক্ষিত ব্যক্তিরা আরো অধিক অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছেন। দেশের শোচনীয় অবস্থা ভাবিলে দুঃখে হৃদয় মন অভিভূত হয়। ঐ মুকুন্দরাম এক জন বি-এ বি-এল উপাধিধারী ব্যক্তি, তিনি এইরূপ কাজে লিপ্ত!" প্রেমাঙ্কুর জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া একেবারে নির্ব্বাক হইয়াছেন, আবার ভাবিতেছেন, "এ দেশের কি উদ্ধার হইবে? ভাবিতেছেন, দেশোদ্ধারের কথাটা ক্রমে ক্রমে বড়ই দূরে যাইয়া পড়িতেছে! কলেজে থাকার সময় ছাত্রদের এক অবস্থা, কলেজ পরিত্যাগ করিলে ভিন্ন অবস্থা হয়, এ এক যুগ ছিল; তখনও দেশের অনেক মঙ্গলের আশা ছিল। আর এখন কলেজের ছাত্রেরাই দেশ-দ্বেষী, স্বার্থপর, পরনিন্দুক, পর-শ্রীকাতর হইয়া উঠিতেছেন। দিন দিন কপটতা এমন আধিপত্য বিস্তার করিতেছে, যে ব্যক্তি মুসলমানের হাতের রন্ধন করা মুরগীর মাংস খাইবে, সেই ব্যক্তিই অন্যের জাতিচ্যুতির জন্য বদ্ধপরিকর। যে ছাত্র সম্মুখে স্তুতিগানে স্বর্গে তুলিতেছে, সেই ছাত্রই অসাক্ষাতে চৌদ্দ পুরুষের কুল উদ্ধার করে। সহরের ছাত্রগণ, সকলে না হউক, অনেকেই আজ কাল দুর্বিনীত, চরিত্রহীন, নীতিহীন। তাঁহারা কলেজে থাকিতে থাকিতেই, ছুটীর সময় দেশে যাইয়া যে সকল কদর্য্য কার্য্যে লিপ্ত হন, একবার দেখিলে আর শিক্ষার প্রতি ভক্তি থাকে না। বুঝিবা শিক্ষায় দিন দিন চরিত্রহীন ব্যক্তির সৃষ্ট হইতেছে! এই যুগের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আশা হয় না যে, এ দেশের মঙ্গল হইবে। কালীকান্তের অধিকাংশ কর্ম্মচারী ও পরামর্শদাতাই ত শিক্ষিত লোক, কিন্তু শিক্ষিত লোকের কাজ এমন জঘন্য? আজ কালীকান্তকে একঘরে করিতে পারে, শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, হিন্দু সমাজের কোন লোকের এমন সাহস নাই। সাহস নাই, বীর্য্য নাই, নীতির মর্য্যাদা নাই, পুণ্যের জোর নাই। আছে কি, কেবল পরনিন্দা, পরবিদ্বেষ, দুর্নীতি, দুর্ব্বলতা, দুর্ব্বাক্য, দুঃশাসন। কার কথা কে বলিবে? সকলেই এক দশাগ্রস্ত। চরিত্রহীন যে দেশের অধিকাংশ লোক, সেই দেশের আবার আশা? ডুবিয়াছে ত এদেশ বুঝি বা একেবারে ডুবিয়াছে।" প্রেমাঙ্কুর আজ অত্যাচারের জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া এইরূপ ভাবিতেছেন। আমরাও তাঁহার সহিত একবাক্য হইয়া বলিতেছি, যে দেশ চরিত্রহীন, সে দেশের মঙ্গলের আশা করা বাতুলতা মাত্র। চরিত্রবল ভারতে না জাগিলে ভারতের আর রক্ষা নাই, দাসত্ব ও পরাধীনতাই এই দেশের পরিণাম। কিন্তু

আমরা আশাহীন নহি। অভাব আছে বলিয়াই তাহা সংস্কারের প্রয়োজন, অভাব আছে বলিয়াই হিতৈষী, সংস্কারক এবং নৈতিক বীরের প্রয়োজন। ভারতের পুণ্যময় শ্রীধামে আবার এমন প্রকৃত মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে, যাঁহার দ্বারা সমাজ ও দেশ আমূল পরিবর্ত্তিত হইবে। কিন্তু সে মহাপুরুষ কবে আসিবেন, কেহই জানে না।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

কয়েকটী অবান্তরিক কথা।

অত্যাচারের ইতিহাস লিখিতেছি সত্য, কিন্তু পুলিসের ইতিহাস লিখিতে বসি নাই। অত্যাচারের ইতিহাস লিখিতে গেলেই অনেক অবান্তরিক ঘটনার উল্লেখ করিতে হয়। এজন্য, এই দুঃখকাহিনী বড়ই বাড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু উপায় নাই।

পূর্ব্ববঙ্গে দুই জন বিখ্যাত লোক আছেন, একজন কোন জমীদারের প্রধান কর্ম্মচারী, আর একজন স্কুলের কর্ত্তা। কলিকাতার কোন বিখ্যাত পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, ইঁহাদিগকে পূর্ব্ব বঙ্গের গৌরব বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইঁহারা যে দেশের গৌরব, সে দেশের অবস্থা সকলের পক্ষে কল্পনা করা সম্ভবপর নহে। প্রশংসার তুড়ী ভেরী নিনাদিত হইয়া সর্ব্বদা যাঁহাদের প্রশংসা সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতেছে, তাঁহাদের কথা এবং তৎসমূহ দেশের কথা ভাবিতে পারে কে? বুদ্ধিতে, কৌশলে, বক্তৃতায় উভয়ই বড় লোক, কিন্তু সততায়, চরিত্রে, জীবনে, উভয়ে যেন "এ বলে আমাকে দ্যাখ্, ও বলে আমাকে দ্যাখ্"—কে ভাল কে মন্দ, সে বিচার চলে না। তবে রাষ্ট্র এই, একজন নরহত্যা, ব্যভিচার ঢাকা দিতেছেন, মানব-প্রকৃতির অন্তরালে চৌর্য্যবৃত্তি ও ভক্তি-বিশ্বাসের জয় ঘোষণা করিয়া, আর একজন পক্ষপাতিতা-সংরক্ষণ, আত্মীয়-পরিপোষণ এবং স্বার্থ-সাধন ঢাকা দিতেছেন, কমিটী-রূপ সপ্তরথির দ্বারা গ্রন্থকার-অভিমন্যুদিগকে বধ করিয়া। দুই জনই বুদ্ধিমান, দুই জনই সুচতুর, কাহাকেও ধরিবার যো নাই। উভয়ই পূর্ব্ব বঙ্গের গৌরব। আর যিনি পূর্ব্ব বঙ্গের গৌরব, তাঁহার কথাও এ পুস্তকের পৃষ্ঠাকে উজ্জ্বল করিবে।

ধান ভানিতে এ শিবের গীত কেনঃ দরিদ্রের ইতিহাসের সহিত বড় বড়

বিদ্বান ও কৃতবিদ্যের কথা কেন? অবশ্য কারণ আছে। জমীদারের কর্ম্মচারীর একজন বড় উকীল বন্ধু আছেন, তিনি বিদ্যা এবং বুদ্ধিতে দিগ্বিজয়ী। উক্ত কর্ম্মচারী সেই উকীল মহাশয়কে কালীকান্তের মোকদ্দমার জন্য ধার্য্য করিয়া দিলেন। কালীকান্তের সহিত তাঁহার ব্যবহারগত সাদৃশ্যে আত্মীয়তা এবং ঘনিষ্ঠতা যথেষ্ট ছিল। কিন্তু দূর সম্পর্কে কিছু কুটুম্বিতাও ছিল। কারবার ও মহাজনিতে কালীকান্তের নগদ সম্পত্তি খাটিত। লুট পাটের পর যে টাকা ছিল, অল্প সময়ের মধ্যেই তাহা নিঃশেষ হইল। উক্ত কর্ম্মচারী প্রয়োজন মতে কালীকান্তের বিষয় বন্ধক রাখিয়া টাকার কাজ চালাইতে লাগিলেন। বড় লোকের অনুরোধে, বড় লোকের পক্ষ সমর্থন করিতে পূর্ব্ববঙ্গের একজন বড় উকীল মাদারিপুর আসিলেন। ইহা মাদারিপুরের পরম সৌভাগ্য। রোজ সহস্র টাকা ধার্য্যে একজন বড় ব্যারিষ্টারও সেসনের সময়ের জন্য নিযুক্ত হইল। এ গেল পূর্ব্ব বঙ্গের এক বড় লোকের গৌরবের কাজ। আর এক জনের গৌরবের কথা পাঠক শুন। তারানাথের যে একটী পণ্ডিতি কাজ ছিল, তাহা হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য মাদারিপুরের ডেপুটী সাহেব কিছুদিন প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন। ফরিদপুরের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্‌টর বাহাদুর ডেপুটী সাহেবের একজন চেলা। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট তারানাথ মাদারিপুরের বালিকা বিদ্যালয় সম্বন্ধে কি এক পত্র লিখিয়াছিলেন, শুনা যায়। ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর বাবুর একজন আত্মীয় ঐ বালিকা-স্কুলের পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নাকি ৬ মাস স্কুলে পড়াইতেন, আর ৬ মাস কেবল ছুটীতে কাটাইতেন। এই দোষের কথা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে তারানাথ লেখেন, কেননা, তিনি বালিকা-স্কুলের কর্ত্তা। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কফিয়তের জন্য ঐ পত্র ডেপুটী ইং বাবুর নিকট প্রেরণ করেন। ডেপুটী বাবু, আত্মীয়ের অন্ন যায়, বুঝিবা এই কারণে, এই পত্রের রাশি ২ দোষ বাহির করিয়া মন্তব্য, সহ কর্ত্তার নিকট প্রেরণ করেন। ডেপুটী সাহেবের লেখা-লেখিতে পূর্ব্বেই কর্ত্তা বাহাদুরের "রায়"প্রস্তুত ছিল, ডেপুটী ইন্‌স্পেক্‌টরের তীব্র মন্তব্যের পর তিনি মাদারিপুর-স্কুল-কমিটীতে পত্র লিখিলেন, "তারানাথের চাকরী থাকিলে, মাদারিপুরের স্কুল গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইবে কি না, সে সম্বন্ধে চিন্তা করিব।" বালিকা বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় পত্রের তীব্র ভাষার দরুণ ইংরাজি স্কুলের পণ্ডিতি যাইবে কেন, স্কুল-কমিটীর অনেক সভ্যই তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। তারানাথ একজন সৎ

লোক, সুশিক্ষিত, উপযুক্ত শিক্ষক, তাহা দ্বারা স্কুলের অনেক উপকার হইয়াছে, কেন তাঁহার কর্ম্ম যাইবে, অনেকে এ সম্বন্ধে আপত্তি করিতে লাগিলেন। কিন্তু ডেপুটী সাহেব, স্কুল কমিটীর সভাপতি। তিনি হেতু দেখাইতে লাগিলেন, শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তার সহিত দলাদলি করিয়া চলিলে স্কুলের মঙ্গল হইবে না। এইরূপ হেতু দেখাইয়া এবং সভ্যগণের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া সকলের মত পরিবর্ত্তন করিলেন। লাট সাহেবের অনুরোধে বড় বড় হিতৈষীর মত পরিবর্ত্তিত হয়, ডেপুটী সাহেবের অনুরোধে ছোট সহরের ছোট ছোট হিতৈষীর মত বিগড়াইবে, কিছুই বিচিত্র নয়। কমিটীতে সর্ব্ব সম্মতিতে ধার্য্য হইল, বিদায়ের পর তারানাথকে আর স্কুলের কাজে যোগ দিতে হইবে না। ডেপুটীর চক্রান্তের একটা প্রকাণ্ড সুফল ফলিল। দরিদ্র তারানাথের চাকরিটী গেল। পুণ্যপ্রভা-হরণের পর কয়েক দিনের মধ্যেই শুনিলেন যে, তাঁহার কার্য্য গিয়াছে। তিনি সে জন্য একটুও কুণ্ঠিত বা চিন্তিত হইলেন না, মা জগদম্বা এত বিপদে যদি উদ্ধার করেন, তবে কায়ক্লেশে দিনপাতের চিন্তাও দূর করিবেন, এইরূপ ভাবিতেছেন। সামান্য চাকরির জন্য, দাসত্বের জন্য তারানাথ একটুও বিচলিত হইলেন না, কিন্তু দেশের লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল, "দেশ-সেবা-ব্রত গ্রহণই তারানাথের সর্ব্বনাশের মূল; ভদ্রলোক সর্ব্বস্বান্ত হইতে চলিল।"

ঘটনার স্রোত বন্ধ করে, কাহারও সাধ্য নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সমস্ত অবস্থা দেখিয়া যাওয়ার পর কমিসনারের সহিত তাঁহার খুব লেখালেখি চলিতে লাগিল। ম্যাজিষ্ট্রেট আপন মত সংরক্ষণে সমর্থ হইলেন। মাদারিপুরের ডেপুটী সাহেব অল্প দিনের মধ্যেই পরিবর্ত্তিত হইলেন। এই ভয়ানক লোকের হস্ত হইতে দেশ রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু যিনি তৎস্থানে আসিলেন, তাঁহার হাতেও দেশের মঙ্গল হইল না, অত্যাচারের স্রোত পূর্ব্বের ন্যায়ই চলিল। তিনি হিন্দু কুলের একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি বুদ্ধিতে এবং বিদ্যাতে পূর্ব্ববঙ্গের একজন গৌরব; বাঙ্গালা ভাষার একজন প্রধান সেবক। মাদারিপুরের দুই দিকে নদী, ছোট সহর, কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কুমারের তীরে অনেকগুলি ঘাট বাঁধা; ডেপুটী বাবুর বাড়ীর নিকটে, নদীর তীরের রাস্তার ধারে বড় বড় ঝাউ গাছ। পূর্ব্বদিকে ধানের ক্ষেত্র। স্থানটী কবিত্বময়। এই কবিত্বময় স্থানের সুবাতাসে লেখক-ডেপুটী-বাবুর লেখার উচ্ছ্বাস খুব খেলিতে লাগিল, আর খেলিতে লাগিল, রিপুর উচ্ছ্বাস।

পূর্ব্ব-ডেপুটী সাহেবের ইয়ারগণ ক্রমে ক্রমে নব ডেপুটী বাবুর পরিষদ-আসন পূর্ণ করিলেন, প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে সন্ধ্যা-সমীরণ সেবনের জন্য ইহারা নদীতে বেড়াইত। মধুমাখা শরৎ কাল,নদীর উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ-ভঙ্গে ইহাদের রস-কেলীর ভাব তরঙ্গও নিত্য ক্রীড়া করিত। সুসজ্জিত নৌকায় টপ্পা চলিত, স্যাম্পেন সেরী চলিত, সুসজ্জিত-খোপায় ফুলশোভিত বেশ্যার দলের নৃত্য চলিত—রসের জোয়ার নিত্যই নূতন ভাবে বহিত। বেহায়ার দল লজ্জার মাথা খেয়ে রোজই এইরূপ করিত। কুমার হইয়াছে যমুনা, স-সখা শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছেন স-সখা ডেপুটী বাবু, সখীবৃন্দের মোটেই অভাব নাই, অভাব কেবল শ্রীরাধিকার। রঙ্গমতী-নৌকা রসে ভাসিতেছে। কুমারে কয়েকটী ছোট খাল মাদারিপুরকে বিদীর্ণ করিয়া পূর্ব্বদিকে গিয়াছে,এই খালের ধারে অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের বাসা। অশুভক্ষণে এখানকার মুন্সেফ বাবুর সহিত নব ডেপুটী বাবুর কিছু মনান্তর হয়। মুন্সেফ বাবু ব্যাস-তনয় শুকদেব-তুল্য নহেন। তিনিও একটী জলপাত্রী লইয়া ঘরকন্না করিতেন। এই সূত্রেই ঝগড়ার সূত্রপাত হয় কি না, ঠিক তাহা প্রকাশ নাই, তবে কেহ কেহ ইহা অনুমান করেন। মুন্সেফ বাবুর বাসার কোণে রসের নৌকা নিত্যই নানা লীলা-রসের অভিনয় করিত। অবশেষে সে সকল ব্যবহার এতই তিক্ত হইয়া উঠিল, রস-পিপাসু মুন্সেফ বাবু শেষে মাদারিপুর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ডেপুটী বাবুর মাদারিপুর আগমনের প্রথম লীলা এইরূপে আরম্ভ হইল। তার পরের কথা পাঠক ঘটনার অন্তরালে আরো অবগত হইবেন।

মাদারিপুরের ডাক্তার বাবুর কথা কিছু বলা হইলেই আমাদের আন্তরিক কথা শেষ হয়। ডাক্তার বাবু একজন সুশিক্ষিত এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন। সৎবংশে ইহার জন্ম। তিনি কায়স্থকুল পবিত্র করিয়াছেন। শিক্ষা এবং কুল মানে তিনি সকলের সম্মানের পাত্র। তিনি সুচিকিৎসকও বটেন, কিন্তু চিকিৎসা তাঁহার ব্যবসা নয়, তাঁহার একটা বড় বিষম দোষ আছে, তিনি উপরি জলপানি আদায়ের বড়ই পক্ষপাতী ব্যক্তি। তিনি যেন একখানি ঘুষের জাহাজ। মাদারিপুর মহকুমাটা খুব বিস্তৃত। খুন জখম এ মহকুমায় লাগিয়াই আছে। পুলিসের বাহাদুরীতে অনেক সময়েই মোকদ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া যায়, কিন্তু যে গুলি নিষ্পত্তি হয় না, তাহার সংখ্যাও বড় কম নয়। সেই মোকদ্দমাগুলির সাক্ষ্য দিয়া ডাক্তার বাবু বেশ পেট ভারি করিয়াছেন। খুনি মোকদ্দমায় কখন কখন দুই পক্ষেই তিনি স্বার্থসাধন করেন, বাহাদুর

এমনি। সেই সকল মোকদ্দমা প্রায়ই ডিস্‌মিস্‌ হইয়া যায়। খুনি মোকদ্দমায় গবর্ণমেণ্ট এক পক্ষ, সে পক্ষে তাঁহার খাতির রাখার কোনই প্রয়োজন নাই। মোকদ্দমা না টিকিলে পুলিসের উপর কড়া মন্তব্য হয় বটে, কিন্তু ডাক্তারদিগের সম্বন্ধে কোন মন্তব্যও নাই, কড়াকড়িও নাই, বিজ্ঞানের চেলা, যাহা করেন, তাহাই শোভা পায়! দুর্ভিক্ষের সময় অনাহার-পীড়িত যে সকল লাস পরীক্ষার জন্য তাঁহার নিকট আসিয়াছিল, তাহাতে জলখাবার কিছু প্রাপ্য ছিল না, সুতরাং উদরে "অন্নের চিহ্ন দেখিয়াছেন" বলিয়া ডেপুটী সাহেবের সম্মান রক্ষা করিয়া রিপোর্ট দিয়াছেন। ৩৪ টী স্থলে কেবল তাহা পারেন নাই। কেন পারেন নাই, সে ইতিহাস অনেক বড়, সে সকল কথার সহিত এ পুস্তকের কোন সম্বন্ধ নাই, সুতরাং তাহা থাকুক। চরনগর ও বিধিকৃষ্ণপুরের উপস্থিত মোকদ্দমাটা তাঁহার হাতছাড়া হওয়ার যো হইয়াছিল, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুকম্পায় তাহা হইল না। তিনি আদেশ পাওয়া মাত্র বিধিকৃষ্ণপুর চিকিৎসার জন্য রওয়ানা হইলেন। একজন নেটিভ ডাক্তারের উপর মাদারিপুরের ভার রহিল। বিধিকৃষ্ণপুর মাদারিপুর হইতে বহুদূর ব্যবধানও নয়; প্রয়োজন হইলেই তিনি মাদারিপুর আসিতেন।

মোকদ্দমার সকল আয়োজন, কিন্তু তবুও মোকদ্দমা রীতিমত আরম্ভ হইতে একটু বিলম্ব হইতে লাগিল। এই মোকদ্দমার প্রধান সাক্ষী দীপ্তি আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত মোকদ্দমা স্থগিত থাকে, গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে। এদিকের একটু বিলম্ব আছে, সুতরাং বিধিকৃষ্ণপুরের আর আর কথাগুলি, এই অবসরে, লিপিবদ্ধ করি।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

দীপ্তির শেষ অনুরোধ।

বিষাদ-প্রতিমা দীপ্তির কথা, এতক্ষণ পর, শুনিতে পাঠকের অবশ্যই ইচ্ছা হইতেছে। দীপ্তির কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিতে আমাদেরও একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু শক্তিতে কুলায় না। ভাষায় এমন দখল নাই যে, সেই অপরূপ লাবণ্যময়ী সোণার প্রতিমার রূপ বা গুণ, ইতিহাস বা কথা লিখিতে পারি। ঘটনাচক্রে এখন ত আরো পারি না। দীপ্তির প্রভা মলিন হইয়া আসিতেছে,

রূপ বিলীন হইতেছে,সব যেন নিবু নিবু হইয়া আসিতেছে। বিধাতার ইচ্ছা! বেণীমাধব বাড়ী আসিয়াছেন, তারানাথ বাড়ী আসিয়া সকল শুনিয়াছেন, এবং স্বচক্ষে দীপ্তির অবস্থা দেখিয়াছেন। দীপ্তির কাকা ও মেসো ফরিদপুর হইতে আসিয়াছেন। হরিগোপাল ও শান্তিময়ী সপুত্রে আজ পরিবর্ত্তিত হইয়া দীপ্তির সেবায় নিযুক্ত। তারপর তাহার ...ক জীবন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, পুণ্যপ্রভাও বিধিকৃষ্ণপুরে আসিয়াছেন। তিন সখী ও জননী কাছে। আর কাছে, জীবনের সুখ-স্বপ্ন, হৃদয় মনের আদর্শ, দয়া-প্রেম-পবিত্রতার মূর্ত্তি, প্রেমাঙ্কুর বাবু। কিন্তু হইলে কি হয়, দীপ্তির অবস্থা ভাল হইতেছে না। মানুষের শক্তিতে যতদূর সম্ভব, তাহার আর ত্রুটী হইতেছে না, কিন্তু দীপ্তির অবস্থা ভাল হইতেছে না। একটা অবস্থা একটু ভাল হয়, আর একটা উপসর্গ উপস্থিত হয়। মাথার অবস্থা একটু ভাল, কিন্তু দ্বিতীয় রাত্রি হইতে যে দারুণ জ্বর হইয়াছে, সে জ্বর আর কমিতেছে না। ভিতরের অবস্থা কোন্ চিকিৎসক নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা করিতে পারেন? বাহিরের উপসর্গ কমিয়া ভিতরের উপসর্গ যে... ড়িতেছে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের আগমন হইতে বিধিকৃষ্ণপুরের অনেকের মুখের ...কৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ঘোরতর অত্যাচার প্রতিকারের একটী উপায় হইবে, সকলেরই আশা হইয়াছে, কিন্তু দীপ্তির জন্য সকলের মনেই দারুণ চিন্তা। দীপ্তি যদি আরোগ্য না হয়, তবে সকলই বৃথা। সহানুভূতি আজ সম...বে দীপ্তির দিকে বহিতেছে। দীপ্তির জন্য সকলেই ব্যথিত, চিন্তিত, স...েই আশা-হত, মলিন, বিষণ্ণ। দীপ্তি যেন আজ বিধিকৃষ্ণপুরের ...র্ষণ-রজ্জু—সকলের মুখে ঐ এক কথা, সকলের ঘরে ঐ এক কাহিনী,—আহারে বিহারে মন নাই, সকল স্থান ও সময় গ্রাস করিয়াছে যেন দীপ্তি। তারানাথের অন্নছত্র সমভাবেই চলিতেছে, মহাদেবের কাজ যেন পঞ্চভূতে সম্পন্ন করিয়া যাইতেছে। গোপনে শান্তিশীলাই সমস্ত দিতেছেন, বাহিরে তাহা কেহ জানে না, বাহিরে প্রকাশ দেবী প্রসন্নময়ী বর পাইয়াছেন, মা জগদম্বা সমস্ত দিতেছেন। শুভ এবং অশুভ—সকল কার্য্যই সমান ভাবে চলিতেছে, কিন্তু দীপ্তি যেন বিধিকৃষ্ণপুরের সকল আনন্দ,সকল সুখ অপহরণ করিয়াছেন, এমন জীবন্ত সহানুভূতি আর কখনও দেখা যায় নাই।

বিধিকৃষ্ণপুরের এই অবস্থা, আর আত্মীয় বন্ধুদিগের কি অবস্থা? দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে তারানাথ একজন প্রকৃত বীর; কিন্তু হৃদয়ের অধিক প্রিয়,

দীপ্তির শেষ অনুরোধ

জীবনের অধিক স্নেহের পাত্রীদিগের এ হেন দুর্দশা তিনিও আজ সহ্য করিতে পারিতেছেন না। দুনয়নে ধারা বহিতেছে, মুখের বাক্য নীরব হইয়া গিয়াছে, সেবা শুশ্রূষায় প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়াছেন। পুণ্যপ্রভা ও দীপ্তিকে এক ঘরে রাখা হইয়াছে,—উভয়ে উভয়ের আরামের জিনিস। পুণ্যপ্রভার অবস্থা তত খারাপ নহে,মধ্যে মধ্যে তিনিও দীপ্তির শুশ্রূষা করিতেছেন। চিকিৎসা রীতিমত হইতেছে, প্রেমাঙ্কুর বাবু পুস্তকেও যেরূপ কথা পড়েন নাই, প্রেমের এমন আদর্শ দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন। তিনিও প্রাণপণে শুশ্রূষা করিতেছেন। বিপদের দিনে, শত্রু মিত্র, আপন পর—এ জ্ঞান থাকে না; যে সাহায্য দিতে চায়, তাহার সাহায্যই সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। প্রেমাঙ্কুর বাবু একটু দূরের লোক, কিন্তু এই বিপদে আপনা হইতেও আপনার হইয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে কেহ একটী কথা বলিতেও অবসর পাইতেছে না, তিনি যেমন সংযত, তেমনই সতর্ক; তাঁহার ব্যবহার যেমন মধুর, ভাষা তেমনই মিষ্ট। তিনি আপনা ভুলিয়া উভয়ের শুশ্রূষা করিতেছেন।

বেণীমাধব এবং তাঁহার স্ত্রী যেন উন্মত্তের ন্যায় হইয়াছেন। দারুণ চিন্তা উভয়ের হৃদয় মনের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে, আহার নাই, নিদ্রা নাই— দুইজন যেন পাগলের ন্যায় হইয়াছেন।

মাদারিপুরের ডাক্তার আসিয়া চিকিৎসার ভার লইয়াছেন। সেও আজ কদিন, কিন্তু তাহাতেও দীপ্তির কোন উন্নতির লক্ষণ নাই। দীপ্তি আর কাহারও সহিত বড় একটা কিছু বলেন না, যখন ভাল থাকেন, দুই একটা কথা কেবল পুণ্যপ্রভার সহিত বলেন। সে কথাও কেবল আক্ষেপ-পূর্ণ; কেবল মুখে এক বাণী, "হায়রে পবিত্রতা!" যখন জ্বরের তীব্র দাহনে মাথা উষ্ণ হয়, তখন প্রলাপেও ঐ কথা; যখন তন্দ্রায় অভিভূত থাকেন, তখন স্বপ্ন দেখিয়া কেবল ঐ কথাই বলেন। পবিত্রতার অভাব-বোধটা দীপ্তির সর্ব্বাঙ্গ গ্রাস করিয়াছে, সুখ শান্তি হরণ করিয়াছে। মানুষ হইয়া পবিত্রতা হারাইলাম, এ দুঃখ কিছুতেই ঘুচিতেছে না। পুণ্যপ্রভা কত বুঝাইতে চেষ্টা করেন, লীলা, সরলা ও তিলোত্তমা কত বুঝাইতেছেন, কিন্তু মন প্রবোধ মানিতেছে না। কালভুজঙ্গ সর্ব্বদা দংশন করিতেছে। একে সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত, মস্তিষ্ক অপ্রকৃতিস্থ, দারুণ জ্বর, তাহাতে দারুণ চিন্তা। জীবন ধারণ করিতে আর আশা নাই। অপবিত্র জীবনের প্রতি বিন্দু মাত্রও আসক্তি নাই। চিকিৎসক ও শুশ্রূষা কি করিবে?

যখন একটু ভাল সময় পান, তখনই পুণ্যপ্রভা নানা প্রকার মিষ্ট কথায় উপদেশ দেন। দীপ্তির একদিনও তাহা ভাল লাগে না। এক দিন সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর সমস্ত লোক প্রাতঃকৃত্য করিতে গিয়াছে, দীপ্তি যেন একটু ভাল আছে, পুণ্যপ্রভা বলিতেছেন—"দীপ্তি, তুই কেন প্রবোধ মানিস্‌নে? তুই গেলে বিধিকৃষ্ণপুর যে আঁধার হবে, জানিস্‌নে কি? তোর মা বাপ্‌ত যাবেনই, আমার বাবা মাও যাঁবেন, লীলা, সরলা, তিলোত্তমা যাবে, আমি যাব, আর যাবেন কে জানিস্? প্রেমাঙ্কুর বাবু। তুই আমাদের সকলের মায়া কাটাবি? তোর মন থেকে ঐ চিন্তাটা ফেলে দে। আমাদের হৃদয় মন পূর্ণ করে থাক্।"

দীপ্তি।—পুণি, তুই ত সকলই জানিস্, আবার বলিস্ কেন? আমার আদর্শ, দয়া, প্রেম ও পবিত্রতা। তা হারাইয়া আমার জীবনে কাজ নাই। দীপ্তি বলে আমাকে আর ডাকিস্‌নে, দীপ্তি মরে গিয়াছে, জানিস্‌নে কি? তোর আশীর্ব্বাদ তার বর হয়েছে, সতী হয়েই সে গিয়াছে। এখানে যাকে দেখ্‌ছিস্, প্রেতভূমির সে একটা বিকট মূর্ত্তি মাত্র, তোদের মায়ায় এখানে পড়ে আছে। এ মায়া বিষম মায়া, চিরদিনই তোদের নিকট এ চিত্র পড়ে থাক্‌বে; বুঝ্‌ছিস্ ত?

পুণ্যপ্রভা।—তোর এই সব কথায় আমার প্রাণ পাগল করে। দ্যাখ্, লীলা, সরলা, তিলোত্তমা আহার নিদ্রা ভুলেছে, প্রেমাঙ্কুর বাবু সব ভুলে তোরই জন্য পড়ে আছেন। দয়া কর, আমার প্রাণ অস্থির করিস্‌নে।

দীপ্তি।—সত্যই বল্‌ছি পুণি, আমি তোদের সহবাসের অযোগ্যা হয়েছি। তোরা পুণ্যলোকের দেবী, আমি নরকের কীট; তোরা ভালবাসিস্ বলে, আজও আমাকে দয়া কর্‌ছিস্, কিন্তু আমি সকলেরই ঘৃণার পাত্রী। তোকে বল্‌তে কি, প্রেমাঙ্কুর বাবু যখন আমাকে স্পর্শ করেন, আমার সর্ব্বশরীর জ্বলে যায়, পবিত্র জিনিস অপবিত্র হচ্চে, মনে হয়। তিনি দেবতা, তিনি কিছুই জানেন না। সকলের প্রতিই তাঁহার সমভাব। কি অপরাজিত দয়া লো! আমি দেব-সহবাস লাভ করে ধন্য হয়েছি, কিন্তু আর তাঁহার ছায়া-স্পর্শ কর্‌তেও সাধ নাই। শালগ্রাম শিলা আমাকে স্পর্শ করে অপবিত্র হবে, ভাবৃতেও কষ্ট পাই। বিধাতা এই করুন, আমি যেন শীঘ্র তাঁর চরণে স্থান পাই। তোদের চরণের ধূলি মাথায় লয়ে, ঐ দেবতার সম্মুখে যেতে পার্‌লেই বাঁচি; কিন্তু বিধাতা তাও কি কর্‌বেন?

পুণ্যপ্রভা।—একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে চাই ?

দীপ্তি।—বল্‌ না, কি কথা, এই ত সুসময়, পরে আর যদি কথা বল্‌তে না পারি।

পুণ্যপ্রভা।—প্রেমাঙ্কুর বাবুর সহিত তোর কি কথা হয়েছে, জান্‌তে চাই।

দীপ্তি।—জান্‌বি ? তবে শোন্‌, তাঁর সহিত আমার একটী কথাও হয় নাই। তিনিও বলেন নাই, আমিও বলি নাই। তিনি কেন বলেন নাই, তা জানি না। আমি দেবতাকে কলঙ্কিত করিতে অনিচ্ছুক বলে কোন কথা বলি নাই। কথা বলাতে সুখই বা কি আছে ? কেবল পবিত্র মূর্ত্তি দর্শনেই সুখ। আমি কোন আসক্তি লইয়াই তাঁহাকে ভালবাসি নাই, তুই জানিস্‌। আসক্তিতে কি সুখ আছে ? কেবল পবিত্রতার সহবাসেই সুখ। আমি আদর্শ ধরেই জীবন রেখেছিলাম। আমি এতদিন যাইতাম, এতদিন আছি কেবল ঐ পবিত্রমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করে। আর তোকে, বাবাকেও একবার দেখ্‌বার ইচ্ছা ছিল, তাই ছিলাম। এখন সকল সাধ পূর্ণ হয়েছে, এখন তোরা বিদায় দে, আমি নিত্য-ধামে চলে যাই।

পুণ্যপ্রভা।—তোর পায়ে ধরি, অমন কথা বলিস্‌ নে ? তুই আমার জন্য প্রাণ দিবি, আর আমি থাক্‌ব ? তুই যদি যাস্‌, নিশ্চয় জানিস্‌, আমরাও তোর সহগমন কর্‌ব। তোর যা ইচ্ছা, তাই কর।

দীপ্তি।—আমার ইচ্ছা আর নাই, ইচ্ছা এখন জগদম্বার। আমার সকল সাধ, সকল বাসনা, সকল ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে, আমি এখন আসক্তিহীনা হয়েছি, ক্ষমা করিস্‌ পুণি!

পুণ্যপ্রভা।—প্রেমাঙ্কুর বাবুকেও ভুলিবি ?

দীপ্তি।—ভুলিব কেন, তাঁকে মনে রাখিব। তোদিকেও কি ভুল্‌তে পারি? কাকেও ভুলব্‌ না, তোরা আমার জপমালা, জানিস্‌ নে ?

পুণ্যপ্রভা।—প্রেমাঙ্কুর বাবু তোর মন এখনও জানেন নাই, যখন জানি-বেন, তখন পাগল হবেন। আমি তাঁর নিকট সকল ভেঙ্গে বল্‌ব কি ? পায়ে ধরি, একদিন তাঁহার সহিত দুটা কথা বল্‌।

দীপ্তি।—না, দেবতার মন চঞ্চল করিস্‌ নে, অধর্ম্ম হবে। আমার সাধ পূরেছে, আর কি ? তাঁহার পবিত্র মূর্ত্তি দেখে দেখে আমি অনন্ত পবিত্রতার আস্বাদন পেয়েছি। অনন্ত পবিত্রতার আস্বাদন পেয়ে পেয়ে এখন বুঝেছি, আমি তাঁহার নিতান্ত অযোগ্যা। তাই সংসারের বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া নির্ব্বি-

কার-চিন্তা হওয়ার জন্য চেষ্টা করিতেছি। অপরাধ অনেক করেছি, তন্মধ্যে গুরুতর অপরাধ, দেবতার সংস্পর্শ-লাভের ইচ্ছা। দ্যাখ্ পুণি, আজ আর সে ইচ্ছা নাই। এখন অনন্ত পবিত্রতার সিন্ধুতে এই অপবিত্র বিন্দু মিলাইতে চাই। এ ধরা পাপের নিকেতন, এই পঙ্কিল পৃথিবীতে কিছুই পবিত্র থাকে না—কত চেষ্টা করেও ত এই শরীর ও মনকে পবিত্র রাখ্‌তে পারি নাই। তুই ত সকলই জানিস্। এখন ছেড়ে দে, আমি অনন্ত-সাগরে ঝাঁপ দেই। তুই না বলিলে যাব কেমন করে?

পুণ্যপ্রভা।—আমার জীবন থাক্‌তে তোকে যেতে বলব্ না, তুই আমার চখের অঞ্জন, বদনের শোভা, হস্তের ভূষণ—তুই ছাড়া আমি নাই, থাক্‌তে পারি না, জানিস নে কি?

দীপ্তি।—জানি, তবে তোর নিকট আমার একটা কথা এই, আমার কাজ শেষ হয়েছে, তোর কাজ এখনও বাকী আছে। আমি গেলেই এবং তুই থাক্‌লেই জগদম্বার ইচ্ছার জয় হবে। তুই আমি-ময় হয়ে থাক্, আমি তুই-ময় হয়ে নিত্যধামে চলে যাই। পরকাল তুই-ময় হউক, এই সংসারটাও তোর গুণে পূর্ণ হউক। তুই দুই লোককে গ্রাস্ করে ফেল্। তোর আদর্শে ধরা ধন্য হয়ে যাক্।

পুণ্যপ্রভা।—কি ছাই কথা বলিস্! তোর চেয়ে আর আদর্শ জীবন কাহার?

দীপ্তি।—জানিস্‌নে কি যে, আমি পরাজিতা এবং তুই অপরাজিতা? পাপ-সংগ্রামে আমার পুণ্য জীবন বলিদান হইয়াছে, জানিস্‌নে কি? কেন মিথ্যা কথা বলিস্?

দীপ্তির তীব্র কথায় পুণ্যপ্রভা একটু অপ্রতিভ হইলেন; বলিলেন, দীপ্তি, তবে তুই আমার জীবন লয়ে থাক্, আমি যাই।

দীপ্তি।—তোর জীবনের আদর্শ লয়ে আমি নিত্যানন্দে স্বর্গে চলে যাব। তোর আদর্শ আমার ভাগবতী তরণী। ঐ নৌকায় আরোহণ করেছি বলেই আশা হচ্চে, মায়ের চরণে স্থান পেলেও পেতে পারি। আমাকে বৃথা ভুলাতে চেষ্টা করিস্‌নে পুণি।

দীপ্তির প্রতি কথা বিশ্বাসের উজ্জ্বল কণিকাবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। পুণ্যপ্রভা কোন কথাতেই যো পাইতেছেন না। তিনি ক্ষণকাল নীরব রহিলেন।

দীপ্তি গম্ভীরভাবে আবার বলিতে লাগিলেন, দেখ্ পুণি, আমার মাকে তুই মা বলিস্, বাবাকে বাবা বলিস্। যদি ইহাদিগকে রাখ্‌তে পারিস্, তবে তোর পুণ্যের জয় হইবে। আর একটা কথা রাখিস্ পুণি। আমার আদর্শ প্রেমাঙ্কুর

বাবুকেও তুই রাখিস্। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, তিনি তোরই উপযুক্ত। আমার এই অনুরোধটী রাখিস্ পুণি, তাঁহাকে ভাসাইয়া দিস্ না, তাঁহার হৃদয়-ডিঙ্গিখানা তোর হৃদয়-তীরে প্রেম-রজ্জুতে বেঁধে রাখিস্। আমি নিত্যই তোদের যুগল রূপ দেখ্‌তে আস্‌ব, নিত্যই তোদের উপর শুভ কামনা বর্ষণ কর্‌ব, নিত্যই তোদের রূপে নিমগ্ন হয়ে থাক্‌ব। যুগলরূপে যদি আমাকে মাতাতে পারিস্, তবেই তোর পুণ্যের জয়। কথাটা রাখ্‌বি ত পুণি? আমি তোর সৎগুণ রাশি হৃদয়-ভাণ্ডারে পূরেছি, আর আমার আদর্শকে তুই হৃদয়ে ধারণ কর্‌বি ত পুণি?

পুণ্যপ্রভা সকল শুনিয়া অবাক্, কোন কথাই বলিতে পারিতেছেন না, দুই চক্ষে কেবল তাঁহার ধারা বহিতেছে।

দীপ্তি আবার বলিলেন, আমি শাঁক ঘণ্টা বাজাইয়া, উলুধ্বনি করে, এই চর্ম্মচক্ষে যুগলমূর্ত্তি দেখিয়া যাইতে পারিলে অধিক সুখী হইতাম; কিন্তু ভাবিতেছি, তাহা যেন মা জগদম্বা না করেন। এই অপবিত্র শরীরের অপবিত্র চক্ষে যুগলমূর্ত্তি দেখ্‌ব না। এই শরীর বিসর্জ্জন দিয়া, বিশ্বাস, পবিত্রতা, দয়া ও প্রেম অঞ্জনে আমার জ্ঞানচক্ষুকে পবিত্র করে তোদের যুগলরূপ দেখ্‌ব। কথা রাখ্‌বি ত পুণি?

পুণ্যপ্রভা দেখিলেন, দীপ্তি ক্রমে বড়ই উত্তেজিতা হইতেছে, পীড়া বৃদ্ধির আশঙ্কায় হৃদয় অস্থির হইল, মনে ভাবিলেন, এ সকল কথা তুলিয়া ভাল করি নাই; দীপ্তির পা ধরিয়া বলিলেন,—দীপ্তি, এখন থাম্, পরে আবার কথা হবে।

দীপ্তি।—যদি আর কথা না বল্‌তে পারি, তাই জিজ্ঞাসা করি, পুণি, আমার কথা রাখ্‌বি ত?

পুণ্যপ্রভা বলিলেন, তোকে আর কি বলিব, তোর কোন্ কথা কবে অগ্রাহ্য করেছি বল্ ত? তোর কথা ত আমার বেদবেদান্ত, গীতা-ভাগবত, শাস্ত্র, তন্ত্র, মন্ত্র। তুই যে আমাকে গ্রাস করেছিস্, তা কি জানিস্‌নে? তুই গেলে যদি আমি থাকি, এবং যদি অসাধ্য না হয়, তোর কথা অবশ্যই রাখ্‌ব, কিন্তু আজ ক্ষান্ত হ, পরে আবার কথা হবে।

দীপ্তি বলিলেন, তোর কথা শুনে, পুণি, আমার প্রাণ শীতল হলো। তবে এখন আর ২ কথা থাক্। একটু জল দে। পুণ্যপ্রভা মুখে জল দিয়া দীপ্তিকে বাতাস করিতে লাগিলেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

চিন্তা-সরসীতে পুণ্যপ্রভা।

দুইখানি যৌবন-কুসুম বোঝাই রূপের জাহাজ, এ বলে তুই সুন্দর, ও বলে তুই সুন্দর। দুইখানি রত্ন বোঝাই তরণী, একখানি আর এক খানিকে দেখিয়া বিমোহিত। একখানির নাম দীপ্তি, আর একখানির নাম পুণ্যপ্রভা। পাঠক বল ত, কোন্‌খানি সুন্দর এবং বড়। আমাদের বোধ হয়, পুণ্য ছিল স্বতন্ত্র, দীপ্তিও ছিল স্বতন্ত্র। দুই মিলিয়া হইয়াছে, পুণ্যপ্রভা। অথবা পুণ্য দীপ্তির কল্যাণে আজ প্রভাবতী। দুই মিলিয়া যখন এক হইয়াছে, তখন দীপ্তির আর থাকার প্রয়োজন আছে কি ?

জগতে এক শক্তি আদর্শ, আর এক শক্তি কার্য্য। আদর্শ যখন কার্য্যে প্রতিফলিত, তখন জগতের অপরূপ শোভা। আমাদের দীপ্তি কেবল আদর্শে গড়া,আমাদের পুণ্যপ্রভা কেবল কার্য্যে পোরা। এক জন আদর্শ লইয়াই ছিল, আর এক জন কার্য্য লইয়া ছিল। আদর্শ সাধনে যে সিদ্ধা,কার্য্যকালে সে পরাজিতা, কার্য্য সাধনে যে সিদ্ধা, আদর্শ-সাধনে সে পরাজিতা। পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, আদর্শ সাধনে পুণ্যপ্রভা পরাজিতা কোথায় ? পর-পুরুষের সহিত গমন, পর-পুরুষের সহিত কথোপকথন—এ সকলই রমণীজাতির উচ্চ আদর্শের বাহিরে। উচ্চ আদর্শ যদি পুণ্যপ্রভার থাকিত, পুণ্যপ্রভা জীবন দিতেন, তবুও পাল্কীতে উঠিতেন না। তিনি কার্য্যে তৎপরা, কার্য্যকালে তাঁহার সাহস অসীম, তিনি কোন কাজকেই ডরাইয়া চলেন না। তিনি কাজে জিতা,আদর্শে খর্ব্বা। এখন আদর্শ কার্য্যের সহিত সম্মিলিত। পুণ্যপ্রভা বলেন, দীপ্তিতে তিনি অনুপ্রাণিতা হইয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তবে দীপ্তির আর থাকিয়া প্রয়োজন কি ?

প্রয়োজন আছে কি নাই, সে বিচার আমরা করিতে পারি না। আমরা আমাদের মনকে কেবল প্রবোধ দিবার জন্য এ সকল কথা লিখিতেছি; বিধাতার ইচ্ছারই নিত্য জয় হইতেছে। আমাদের প্রাণটা বড়ই আকুল হইয়াছে, এই জন্য তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি ; কিন্তু দুরবগাহ বিধাতার বিধান ভেদ করিতে পারে, সাধ্য কাহার ?

আজ পুণ্যপ্রভার মন বড় বিষণ্ন। পুণ্যপ্রভা অনুমতি না দিলে দীপ্তির যাইতে কষ্ট ছিল, সে অনুমতি যেন প্রকারান্তরে সে পাইয়াছে। দীপ্তির কথা, অসাধ্য না হইলে, পুণ্যপ্রভা রাখিতে প্রতিশ্রুতা হইয়াছেন। তখনকার উত্তেজনা নিবারণের আর উপায় ছিল না, সেই জন্যই বুঝি বা পুণ্যপ্রভা এত শীঘ্র এতদূর নামিয়াছেন। কিন্তু এখন ভাবিতেছেন, "কথাটী কি, তা ত শুনেছি, তাহা রক্ষা করা উচিত কি? দীপ্তি বলে, সে কেবল আদর্শকেই জীবনে ধারণ করিয়াছে, কার্য্যকালে সে পরাজিতা। আমি ত আদর্শহীনা, কিন্তু কাজের বেলা ত ফিরি নাই। যাহা মনে করিব, তাহা জীবনে করি-বই করিব। প্রতিজ্ঞা আমার ধ্রুব সত্য। কার্য্যকালে আমি কি এবার পরাজিতা হইব? অর্থাৎ আমি কি অকৃতকার্য্য হইব? দীপ্তির কথার উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে আমার জানা উচিত ছিল, প্রেমাঙ্কুর বাবু বিবাহিত কি অবিবাহিত, জানা উচিত ছিল, তিনি কোন্ বংশে জন্ম গ্রহণ করেছেন। এ সকল না জেনে, কেমনে প্রতিজ্ঞা করিলাম? বহুবিবাহের আদর্শ দীপ্তি ভেঙ্গে চূর্ণ করে দিয়াছে, কখনও বহু-পত্নীককে বিবাহ কর্‌ব না। প্রেমাঙ্কুর বাবু যদি বিবাহিত হন, তাঁহার সহিত আমার বিবাহ হওয়া অসম্ভব। তবে প্রতিজ্ঞা কেমনে রক্ষা করিব? "অসাধ্য না হইলে কথা রাখ্‌ব।"—এই অসাধ্য কথাটার অর্থ কিছুই নয়। আমার নিকট অসাধ্য কি? কাজকে কি আমি ডরাই? কিন্তু দীপ্তির আদর্শ থর্ব্ব করিতে পারি না। দীপ্তি কি জানে না, প্রেমাঙ্কুর বাবু বিবাহিত কি অবিবাহিত? সে কথা জিজ্ঞাসা করিলেই বুঝিব। জাতি সম্বন্ধেও মীমাংসা হইবে। কিন্তু যদি দু-ই প্রতিকূল হয়, তবে কি উপায় হবে?" পুণ্যপ্রভা ভাবিয়া ঠিক পাইতেছেন না।

আবার ভাবিতেছেন, "এ সকল কথা ভাবিবার এখন কি আমার সময়? দীপ্তি চিরকালের জন্য যাত্রা করিয়াছে—এখন কি সুখের কথা চিন্তার সময়? আমি তাহাকে বলেছি "পরে আবার কথা হবে।" আমি ত জীবনে কখনও তাহাকে কোন মিথ্যা কথা বলি নাই। শুধু তাহাকে কেন? শয়নে স্বপনেও কখনও মিথ্যা আচরণ করি নাই। ঠাট্টা করেও মিথ্যা বলাকে দীপ্তি অপ-রাধ মনে করে। সুতরাং আমি না ভেবে পারি কই? আবার দীপ্তি যদি কথা জিজ্ঞাসা করে, তবে কি উত্তর দিব? দীপ্তি আমাকে কি সমস্যার মধ্যেই ফেলেছে? এখন উপায় করি কি? দীপ্তির আদর্শ, দয়া, প্রেম ও পবিত্রতা। দীপ্তি বলে, প্রেমাঙ্কুর বাবুর জীবন দয়া, প্রেম ও পবিত্রতায়

গঠিত। বুঝেছি, সে কথা ঠিক। কিন্তু কথা এই, আমার মন কি প্রেমাঙ্কুরকে চায়? এ জীবন, এ যৌবন, এ রূপ সকল আমি অম্লান চিত্তে কি ঐ শ্রীচরণে উৎসর্গ করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি? আমার পিতা মাতার নাম ও সম্মান রক্ষা করা আমার জীবনের প্রধান কাজ, সম্মিলিত জীবনে কি তাহা করতে পারব? দরিদ্রের সেবা, বাবার একমাত্র ধর্ম্ম; তাহা কি আমি ইহার সহিত মিলিতা হইয়া বজায় রাখতে পারব? আমি কি দরিদ্রের সেবাকে জীবনের ধর্ম্মরূপে পালন করতে পারব? যদি ইনি বাধা দেন, তবে উপায় কি হবে? দীপ্তি বলে, ইহারও দরিদ্র-সেবাই জীবনের ব্রত, কিন্তু কি জানি, বিবাহের পর যদি আর একরূপ হন্? দীপ্তি বলে, বিবাহের পর অনেকের জীবনই ঠিক থাকে না, বিবাহের পর মানুষ বড় স্বার্থপর হয়। এই জন্যই সে বিবাহের উপর ছেলেবেলা হইতে চটা। সে বলে যে, ব্রত-পালনে, প্রতিজ্ঞা-সংরক্ষণে আমার শক্তি অসাধারণ, আমি ঠিক থাকিতে পারিব। আমার শক্তির কথা আমি বুঝিও না, জানিও না, কিন্তু যখন দীপ্তি কথাটা বলেছে, তখন অবশ্যই ইহা সত্য হইবে। আমার জীবন বিবাহের পর ঠিক থাকবে বলেই বরাবর সে আমাকে বিবাহ করতে বলে। সে বলে, বিবাহ না করলে পূর্ণ শক্তি জন্মে না। সে বলে, সে আদর্শ ধরে অপূর্ণ থেকেই যাইবে। আমার সম্বন্ধে তাহার ধারণা অন্যরূপ। বিবাহ না করিলে আমার জীবন পূর্ণ শক্তি পাইবে না। আদর্শ নাকি আমার কিছু ম্লান। আদর্শ ধরাইবার জন্য সে আমাকে বিবাহ করতে বলে। তাহার বিশ্বাস, প্রেমাঙ্কুর বাবু একজন আদর্শ ব্যক্তি। ঐ আদর্শ ধরিলে আমার ভিতরে পূর্ণ শক্তি অবতীর্ণ হইবে। দীপ্তির কথা মিথ্যা হয় না, কিন্তু তবুও ভয় ভয় করে। দুটী মন একদিকে যাইবে, দুটী হৃদয় এক গতিতে চলিবে, এ বড় শক্ত কথা। ইচ্ছায় ইচ্ছা মিলিয়া এক হইবে কি? যদি প্রেমাঙ্কুর বাবুর সহিত মনের অনৈক্য হয়, ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত না হয়, তবে আমার জীবন বৃথা যাইবে, পিতৃকুলের মুখে কলঙ্ক পড়িবে! এ কঠিন সমস্যায় আমাকে পথ দেখাইবে কে?"

আবার ভাবিতেছেন,"বাহ্য বেশ ভূষায় আমি মজিতে পারি না; আমার কোন্‌দিন একটু চাঞ্চল্য দেখেছিল,আজও সে জন্য দীপ্তি কত কথা বলে। দীপ্তি টাকা ভুলতে বলে,রূপ ভুলতে বলে, রূপজ মোহ ভুলতে বলে, কামনা ও বাসনা ভুলতে বলে। সে বলে, কোনরূপ সংসারের কামনা চরিতার্থ করিবার জন্য বিবাহ করাই পাপ। কেবল আদর্শ জীবন প্রাপ্তির জন্য মানুষ বিবাহ করিবে,

কেবল ধর্ম্মার্থ সংসার করিবে। দীপ্তি যেন আমার গীতার শ্রীকৃষ্ণ, উপদেশের একখানি জাহাজ। তার উপদেশগুলি সমস্ত আমাকে দিয়া সে পালন করাতে চায়, সে বলে আমার শক্তি অসাধারণ। আমি কি সব ভুলে,প্রেমাঙ্কুর বাবুকে আপনার করতে পারি? প্রেমাঙ্কুর বাবু সুপুরুষ, আচ্ছা যদি তিনি সুপুরুষ না হতেন, তবুও কি তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিতাম? আমার ত তা মনে হয় না; সংসারের সুখের কামনা এ মনটা যেন গ্রাস করে ফেলেছে! সে যেরূপ বলে,আমি সেরূপ পারি কই? দীপ্তির এস্থলে বড় ভুল। সে যে আমার কি গুণ দেখে ভুলেছে, আমি তা বুঝি না। আমি ত কামনা বিসর্জ্জন দিয়া তার মত নিষ্কাম হইতে পারি নাই। তবে কি আমার বিবাহ করা অনুচিত? দীপ্তির কোন্‌টা ভুল? আমাকে বুঝ্‌তে সে ভুল করেছে, না প্রেমাঙ্কুর বাবুর সহিত আমার বিবাহ প্রস্তাবে ভুল করেছে? ভুল করা তার পক্ষে সম্ভব কি? যতদূর জানি, ভুল করা তার পক্ষে অসম্ভব। তবে আমি কি করি? মন বল্‌, বল্‌, বল্‌, কি করা উচিত বল্‌। সেই দেবধামের দেবশিশু, আদর্শের অনন্ত প্রস্রবণ, সেই দয়া, প্রেম ও পবিত্রতার মূর্ত্তি আমার এ হৃদয়ে মিলে কলঙ্কিত হইবে কি না, মন বল্‌।" মনও কিছু বলে না, বুদ্ধিও পথ দেখায় না। পুণ্যপ্রভা ভাবিয়া ভাবিয়া কিছুই ঠিক পান না। শেষে হঠাৎ মনে হইল, "আমার এত ভেবেই বা কাজ কি? আমার চেয়ে আমার সম্বন্ধে দীপ্তির ভাবনা সহস্র গুণ অধিক। আমার ধর্ম্মশাস্ত্র, আমার বিবেক, আমার আদেশ, সবই ত দীপ্তি। আমাকে চালাইবার জন্যই তাহার জন্ম। দীপ্তি যতদিন আছে, ততদিন আর ভেবে কাজ কি, দীপ্তির কথা অম্লান বদনে অবনত মস্তকে পালন করে যাই, তবেই ভাল হবে। ইহাতেই পুরুষত্ব, ইহাতেই মনুষ্যত্ব, ইহাতেই দেবত্ব পাইব। সে যাহা বলিবে, তাহাই করিব, ইহাই আমার মূল-মন্ত্র হউক। সে-ই ত আমার পূর্ণাদর্শ, তার আদেশ পালন করিয়া চলি, যাহা হয় হবে। যখন সে চলে যাবে, তখনও অম্লান চিত্তে, অবনত মস্তকে তাহার পদানুসরণ করিব। ইহাতে যাহা হয়, হউক। আমার পক্ষে অন্য কিছু কর্ত্তব্য নাই।" এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া পুণ্যপ্রভা দীপ্তির আদেশ পুনঃ শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

হরিগোপালের কথা।

নদীর জল কখনও উত্তরে, কখনও দক্ষিণে বহে। জোয়ারে বহে উত্তরে, ভাঁটায় বহে দক্ষিণে। মানুষের মনও তাই, কখনও চলে পাপের পথে, কখনও চলে পুণ্যের পথে। ভারতের নদীর জল দক্ষিণে বহিবে, ইহাই নিয়ম, কেননা, প্রধান নদী সকল উত্তর হিমগিরি হইতে উৎপন্ন। তবে সমুদ্রের জোয়ারটা এই একটানা স্রোতকে সময়ে সময়ে বাধা দেয় বলিয়া বিপদ উপস্থিত হয়। মানুষের মনের গতিও পুণ্যের দিকে একটানা স্রোতে বহিবে, ইহাই নিয়ম, কিন্তু সংসার-সমুদ্রের জোয়ার সেই স্রোতকে বাধা দেয়, তাই মানুষের মন পাপের পথে ধায়। এই স্রোতকে কোন ক্ষণজন্মা পুরুষ যদি ফিরাইয়া দিতে পারেন, তবে আবার পুণ্যের দিকে গতি হয়। কিন্তু আবারও স্রোত ফিরিতে পারে, আবারও ফিরিয়া থাকে। মৃত্যু পর্য্যন্ত জোয়ার ভাঁটার টান, উত্থান পতন। ইহাকেই বলে, শিক্ষা-সোপান।

হরিগোপালের মনের গতি একটু পুণ্যের দিকে ফিরিয়াছে, এ কথা বলিয়াছি। এজাহারে তিনি সমস্ত সত্য কথা বলিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও পুলিস সাহেব সে এজাহার শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন। তাঁহাদের উভয়েরই ইচ্ছা ছিল, সপুত্র হরিগোপালকে রক্ষা করেন, কিন্তু সাক্ষীগুলি এতই প্রতিকূল যে, রক্ষার আর উপায় নাই। অবশেষে গ্রেপ্তারের আদেশ বাহির হইয়াছে। উভয় সাহেবই মনে করিতেছেন, এখন আসামী শ্রেণীতেই ইহাদিগকে দেওয়া হউক, সেসনে যাহা হয় হইবে। হরিগোপাল ও তাঁহার তিন পুত্র হাজির হইতে প্রস্তুত হইলেন। চরনগরের মোকদ্দমার ভার লইয়াছেন, মুকুন্দরাম। হরিগোপাল বাবুর তরফেও অনেক লোক আছেন বটে, কিন্তু আজ চরিত্র-হীন ব্যক্তিগণের প্রতি তাঁহার আস্থা কিছু কমিয়াছে, তিনি তারানাথ, নীলকান্ত ও বেণীমাধবের উপর মোকদ্দমার ভারার্পণ করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তারানাথ বলিয়াছেন যে, মামলা মোকদ্দমায় দেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে, উহাতে অগ্রণী হইতে তাঁহার প্রবৃত্তি নাই। বেণী মাধব দীপ্তির কথা বলিয়া আপত্তি করিয়াছেন। নীলকান্ত বলিয়াছেন, "আমি কোথায়

থাকি, কোথায় যাই, কিছুই ঠিক নাই, কি করিব ?" বিশেষত গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে তিনি প্রধান সাক্ষী মনোনীত হইয়াছেন, তিনি ত কোন প্রকারেই মোকদ্দমার তদ্বির করিতে পারেন না। নীলকান্তের খরচ পত্র তারানাথই চালাইতেছেন, সপরিবারে তিনি তারানাথের বাড়ীতেই আছেন। শান্তিশীলা সাহায্য করিতে চাহিয়াছিলেন, মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হইলে কোন পক্ষ হইতে তিনি টাকা গ্রহণ করিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। বিধিকৃষ্ণপুরে আর তেমন সৎলোক নাই। অবশেষে পাঁচ্চরের সেই চক্রবর্ত্তীর উপর হরিগোপাল মোকদ্দমার সমস্ত ভার অর্পণ করিবেন, মনস্থ করিলেন। চক্রবর্ত্তী বাড়ী হইতে আসিয়াছেন পর আর বিধিকৃষ্ণপুর পরিত্যাগ করেন নাই। সকল পরামর্শের মধ্যেই তিনি আছেন। তিনি একজন বুদ্ধিমান, সৎসাহসী; সৎকর্ম্মান্বিত ব্যক্তি বলিয়া নিম্ন-শ্রেণীর মধ্যে পরিচিত। জমীদার শ্রেণীর মধ্যে তিনি ডাকাতের সর্দ্দার বলিয়া পরিজ্ঞাত।

একালের বিজ্ঞাপন যেমন মানুষদিগকে ঠকায়, কলিকাতার গিল্টীর দোকান যেমন ধনীদিগকে ভুলায়, এই যুগের একশ্রেণীর লোক আছে, তাহারাও তেমন করিয়া লোকদিগকে ঠকায় এবং ভুলায়। তাহারা সর্ব্বদাই একশ্রেণীর লোকের প্রশংসা ও আর একশ্রেণীর লোকের নিন্দা লইয়া থাকে। যাহাদিগের দ্বারা স্বার্থ সিদ্ধ হয়, তাহাদের প্রশংসা করে, এবং যাহাদের দ্বারা স্বার্থে কণ্টক পড়ে, তাহাদের নিন্দা করে। জমীদার-ঘরের মোকদ্দমা, না যেন পৌষ-পার্ব্বণ, টাকা উড়াইবার, টাকা চুরি করিবার আনন্দের উৎসব। মোকদ্দমা অল্পে মিটে, কোন জমীদারের কর্ম্মচারীরই এরূপ ইচ্ছা নয়। ইহাতে বাহাদুরীর গরিমা বৃদ্ধি এবং অর্থলুটের বিশেষ সুবিধা হয়। হরিগোপালের বিষয় সম্পত্তি কম নহে। কর্ম্মচারীর সংখ্যাও কম নহে। সকল প্রকার কর্ম্মচারীই আছেন, চোর, বদমায়েস, প্রতারক, ঠক, সকল শ্রেণীর লোকই তাঁহার কর্ম্মচারী। তিনি যেমন, কর্ম্মচারীও বাছিয়া বাছিয়া লইয়াছেন তেমনি। যে যেমন প্রকৃতির লোক, সে সেইরূপ প্রকৃতির লোকই চিনে এবং সেই রূপ প্রকৃতির লোকেরই আদর করে। হরিগোপাল ভাল লোক চিনিতেনও না, রাখিতেনও না। ভাল লোক আসিলে স্বার্থে কণ্টক পড়ার আশঙ্কায় কর্ম্মচারীগণ তাহাদিগকে রাখিতে দিত না। সাত প্রকার নিন্দার কথা কর্ত্তার পাত্‌লা কাণে তুলিয়া সকলে ভাল লোকের শ্রাদ্ধ করিত। এ পর্য্যন্ত একটী সৎলোকও তিনি রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার ভাণ্ডার যেন লুটের

ভাণ্ডার। বক্কেশ্বরের মাথায় হাত বুলাইয়া সকল কর্ম্মচারীই আজ কাল কিছু কিছু বড় লোক। আজ চক্রবর্ত্তী তাঁহার কাজে আসিতেছেন,ইহাতে সকলের স্বার্থেই কণ্টক পড়িতেছে দেখিয়া কর্ম্মচারী মহলে একটা হই-চই পড়িয়াছে। সকলে মিলিয়া ধার্য্য করিল, এক এক জনে চক্রবর্ত্তীর এক এক প্রকারের নিন্দা করিয়া কর্ত্তার মন চটাইয়া দিতে হইবে। কাজ আরম্ভ হইল। একজন কর্ম্মচারী যাইয়া হরিগোপাল বাবুকে বলিল,—"চক্রবর্ত্তী একজন গবর্ণমেণ্টের ফেল-জামিনের আসামী, ইহাকে মোকদ্দমার ভার দিলে ফল ভাল হইবে না।" আর একজন যাইয়া সময়ান্তরে বলিল,—"শুনিলাম, কর্ত্তার ইচ্ছা হয়েছে যে চক্রবর্ত্তীকে প্রধান কর্ম্মচারী করেন, কথাটা শুনে অবাক্ হইয়াছি ? আমাদের মধ্যে কি কেহ উপযুক্ত বিশ্বাসী লোক নাই যে, একজন ডাকাতের সর্দ্দারকে আনিয়া সংসারে প্রবেশ করাইবেন ?" আর একজন সময়ান্তরে যাইয়া বলিল, "চক্রবর্ত্তী ঋণে ডুবে আছেন, একবার এই সরকারে ঢুক্‌তে পার্‌লে লুট করে রাজ-ভাণ্ডার শূন্য কর্‌বে ?"

আর একজন সময়ান্তরে বলিল, "চক্রবর্ত্তীর নামে দশ বারোটা ডিগ্রি আছে।"

আর একজন সময়ান্তরে বলিল, "চক্রবর্ত্তী বড়ই রাগী ব্যক্তি, ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়ে না কর্‌তে পারে এমন কাজ নাই।"

আর একজন সময়ান্তরে বলিল, "চক্রবর্ত্তী একজন জুয়াচোর ব্যক্তি, এই জন্যই দেশের বড় বড় লোক তাহার বিরোধী।"

চক্রবর্ত্তী আজ যেরূপ কলঙ্কিত ভাবে চিত্রিত হইতেছেন, ইহার অন্য রূপ চিত্র আজ কে করিয়া দেখাইবে ? তেমন লোক হরি[illegible]পালের পক্ষে নাই কি ? হরিগোপাল এই কয়দিন দেবী প্রসন্নময়ীকে আদর্শ করিয়াছেন, গুরুর ন্যায় মান্য করিয়া চলিতেছেন। যখনই তাঁহার মনে কোন সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন। আজ কর্ম্মচারীগণের কথায় তাঁহার মনটা কিছু বিচলিত হইতেছে, বুদ্ধি ঠিক করিতে পারিতেছেন না। কোন কর্ম্মচারীর কোন কথারই তিনি উত্তর দেন নাই, কেবল সকল কথা শুনিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু সকলের কথাতেই মনে একটু কাল দাগ লাগিয়াছে। তিনি আজ দেবী প্রসন্নময়ীকে ডাকাইলেন। প্রসন্নময়ী পূর্ব্বেও আসিতেন, এখনও আসেন, কিন্তু পূর্ব্বের আসা এবং এখনকার আসার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। তখন আসিতেন, চোরের বেশে, আর এখন আসেন, যেন রাজরাণী। রাজরাণীর ন্যায় নহে, আশ্বিন মাসে যেন ভগবতী

ভক্তের গৃহে আসিয়াছেন, এখন এই রূপ ভাবে আসেন। অথবা ততোধিক ভক্তি ও সমাদরে তিনি এই বাড়ীতে গৃহীতা হইয়া থাকেন।

দেবীপ্রসন্নময়ী আসিলে হরিগোপাল সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া শেষে কৃতাঞ্জলি পুটে গলবস্ত্র হইয়া নিবেদন করিলেন—"মা,আজ বড় দায়ে ঠেকিয়াছি। সংবাদ পাইয়াছি,আমাদিগকেও আসামী হইয়া হাজতে যাইতে হইবে। জামিনে খালাস হইতে পারিব কিনা, নিশ্চয়তা নাই। মোকদ্দমা অনেক দিন চলিবে, মোকদ্দমা চালাইতে পারে, এমন লোক আমার সরকারে অনেক আছে বটে, কিন্তু বিশ্বাসী লোক নাই। আপনি জানেন, এসংসার যেন লুটের সংসার। মোকদ্দমার সময় লুট শত গুণে বাড়ে। এই জন্য আমি কাহারও উপর ভার দিতে পারিতেছি না। এ গ্রামের সৎলোক, তারানাথ, বেণীমাধব ও নীলকান্ত। নানা কারণে তাঁহারা ভার নিতে পারিতেছেন না। অবশেষে পাঁচ্চরের চক্রবর্ত্তীকে নিযুক্ত করিব, মনস্থ করেছি। কিন্তু আমার কর্ম্মচারীগণ সকলেই তাঁহার চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিতেছে। আমি হতবুদ্ধি হয়েছি, কি করিব, ঠিক পাইতেছি না।"

দেবী প্রসন্নময়ী বলিলেন, কর্ম্মচারীগণ কি বলে?

হরিগোপাল সকলের সকল কথা বলিলেন। প্রসন্নময়ী সকল কথা শ্রবণ করে বলিলেন—"দেখ, এ সংসারে কোন্ লোক এমন আছে, যাহার কোন দোষ নাই? কোন্ লোকই বা এমন আছে, যাহার কোনও গুণ নাই? সকল লোকই দোষ গুণে জড়িত। যাহাদের দোষেব ভাগ বেশী, তাহারাই নিন্দিত, যাহাদের গুণের ভাগ বেশী, তাহারাই আদৃত। আদর ও নিন্দার কোনও অর্থ নাই, যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার আদর করে, অন্যের নিন্দা করে। তুমি নিরপেক্ষ হইবে। নিন্দুকের কোন কথাই শুনিবে না। চক্রবর্ত্তী অসাধারণ ব্যক্তি, তিনি দরিদ্রের আশ্রয়, বিপন্নের সহায়, তিনি পাপীর ত্রাস, পুণ্যবানের বন্ধু। এই ঘোর বিপদে নিতান্ত আত্মীয় ভিন্ন এদেশের আর কোন্ লোক তোমাদের গ্রামে এসেছে বলত? চক্রবর্ত্তী কোন প্রত্যাশা না রাখিয়াও আসিয়াছেন। তিনি মহত্ত্বের খনি। আর একজন লোক মাদারিপুর মহকুমায় আছেন, খালিয়ার রায় বংশে তাঁহার জন্ম। তুমি সকল কার্য্যে ইঁহাদের সাহায্য নিশ্চিন্ত মনে লইও। একটা কথা মনে পড়িল। তোমাকে বলিতেছি। বিলাতের একজন বিখ্যাত চিত্রকর একসময়ে একখানি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস

ছিল যে, চিত্রখানি সুন্দর হয়েছে। একজন বন্ধু তাঁহাকে বলিলেন, এই ছবি রাস্তায় টাঙ্গাইয়া রেখে এস, নীচে লিখে দাও যে, যাহার মতে এই ছবির যে স্থানটি ভাল হয় নাই, তাহা যেন চিহ্নিত করে নাম লিখে রাখেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ঐ ছবিতে কোন খুঁত বাহির হইবে না। তিনি ঐরূপ লিখিয়া ছবি খানি রাস্তায় টাঙ্গাইয়া দিয়া আসিলেন, সময়ান্তরে যাইয়া দেখেন, ছবিখানির সর্ব্বস্থান চিহ্নিত হইয়াছে, কোন একটী স্থানও যে ভাল, তাহা বুঝা যাইতেছে না। সকলেই এক এক স্থানের দোষ ধরিয়াছে। মানুষ কেমন ভিন্ন রুচির লোক, ইহা তাহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন, সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে পারিলেন না। পর দিন সেই বন্ধুকে সমস্ত বলিলেন। বন্ধু বলিলেন, "অহঙ্কার করোনা, বিষণ্ণও হয়ো না। লোকের কথার কোনই মূল্য নাই, তুমি ঐ রূপ আর এক খানি চিত্র, কেবল ভাল স্থান চিহ্নিত করার জন্য রাস্তায় রেখে এস, দেখিবে, কি ফল হয়।" বন্ধুর পরামর্শে পরদিন ঐ রূপই করা হইল। সময়ান্তরে যাইয়া দেখেন, ছবির সর্ব্বত্রই প্রশংসার চিহ্ন। চিত্রকর মহা সুখী হইয়া বন্ধুকে সংবাদ দিলেন। বন্ধু বলিলেন, "কাজ করিয়া যাও, যশ নিন্দার প্রত্যাশী হয়োনা, উহার কোন মূল্য নাই, বুঝিলে ত?"

প্রসন্নময়ী গল্প শেষ করিয়া বলিলেন, তোমাকেও ঐ বন্ধুর উপদেশ দিতেছি। লোকের প্রশংসা বা নিন্দার কোনই মূল্য নাই, সর্ব্বদা মনে রাখিবে। প্রশংসা-নিন্দা-নিরপেক্ষ হইয়া সকল অবস্থায় কেবল মা জগদম্বাকে ডাকিও। ভয় কি বাপ? বিপদে তিনি অবশ্য রক্ষা করিবেন। হাজত বল, জেল বল, সর্ব্বত্রই মা আমার বিরাজিতা। ভক্তিভরে ডাকিলেই চিন্ময়ী, সদা-প্রফুল্লময়ী, নিত্য-হাস্যময়ী মা অভয়াকে পাইবে। তাঁহার কোলে যে সন্তান থাকে, তাহার ভয় কি? তুমি দিবা রাত্রি তাঁহার উপর নির্ভর করে থাক।

এই সকল কথা বলিয়া দেবী প্রসন্নময়ী বিদায় লইলেন। হরি গোপাল চক্রবর্ত্তীর উপর সমস্ত ভারার্পণ করিলেন।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

দীপ্তির শেষ অবস্থা।

তার পর দিন, তারপর দিন—তার পর দিনও দীপ্তির একটু ভাল ভাবে গেল। দীপ্তির একটু ভাল অবস্থা দেখিয়া প্রেমাঙ্কুর বাবু যাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। দীপ্তির কর্ণে সে কথা পৌছিলে দীপ্তি বলিয়া পাঠাইলেন, "তিনি যদি এতই করিলেন, আর কয়টা দিন থাকিয়া গেলেই ভাল হয়।" দীপ্তির এই কথার পর প্রেমাঙ্কুর বাবুর যাওয়া হইল না। কর্ত্তব্যের অনুরোধে যাইতেছিলেন, কিন্তু এটাও একটা কর্ত্তব্য, ইহা ভাবিয়া রহিলেন।

পুণ্যপ্রভা কিছু চঞ্চল স্বভাবের মেয়ে। কোন কথা তাহার পেটে থাকে না। বহুবার প্রেমাঙ্কুর বাবুকে দীপ্তির কথা বলে দিতে তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে, দীপ্তির নিষেধে পারেন নাই। প্রেমাঙ্কুর বাবু যথাসাধ্য সেবা-শুশ্রূষা করিতেছেন। পুণ্যপ্রভা এ কয়দিন তাঁহার সহিত একটু বেশী মেশামিশি করিতেছেন, একটী দুটী কথাও তাঁহার সহিত বলিতেছেন। তাঁহার মনের মধ্যে একটু একটু অনুরাগের অঙ্কুর গজাইতেছে। দীপ্তি বুদ্ধিমতী, বুঝিতে পারিয়া একটু আনন্দিতা হইয়াছেন। আর সকল লোক যখন চলিয়া গিয়াছে, তখন দুই রোগী পরস্পরের দিকে চাহিয়া একটু একটু হাসিতেছেন। সে হাসি অতি মিষ্ট, অতি মধুর।

পুণ্যপ্রভা বলিলেন, দীপ্তি, তুই আজ বেশ আছিস্, না?

দীপ্তি।—ভাল মন্দ বুঝিনা, এখন তোদের সম্মুখে যেতে পার্‌লেই হয়!

পুণ্যপ্রভা।—আবার সেই কথা দীপ্তি? অমন কর্‌বি ত আমি ঘরে চলে যাব, তোর ধারেও আর আস্‌ব না।

দীপ্তি।—পারিস্ ত যা না? আমি কি তোকে আমার ধারে আস্‌তে বলেছি? আপনি থাকৃতে পারেন না, তাই আসেন, আবার আমাকে ভয় দেখান হচ্চে! যাবি চলে যা!

পুণ্যপ্রভা।—সত্যিই যাব?

দীপ্তি।—সত্যিই যা।

পুণ্যপ্রভা।—সত্যিই যাব?

দীপ্তি।—সত্যিই যা।

পুণ্যপ্রভা।—সত্যিই যাব?

পুণ্যপ্রভা বলিলেন, বুঝেছি, তুই আজ বল পেয়েছিস্, প্রেমাঙ্কুর বাবু আছেন, আমাকে দিয়ে কি হবে, তাই যেতে বল্‌ছিস্, বুঝেছি। না, আমি কিছুতেই যাব না।

দীপ্তি।—তুই আর যাবি কোথা লো ? তোর প্রাণ যে বেঁধে দিয়েছি, যাবি কোথা লো পুণি ?

পুণ্যপ্রভা।—কার সঙ্গে বেঁধেছিস্ ?

দীপ্তি।—আমি কিছুই বুঝিনা,কেমন ? প্রেমাঙ্কুর বাবুকে ফেলে তুই আজ কোথা যাবি লো ? যেতে পারিস্ কি ?

পুণ্যপ্রভা।—ভাল কথা মনে করেছিস্, প্রেমাঙ্কুর বাবু কি বিবাহিত ?

দীপ্তি।—সে কথা কেন লো পুণি ?

পুণ্যপ্রভা।—তুই বলেছিস্ যে বহুপত্নীককে কখনও বিয়ে করা উচিত নয়।

দীপ্তি।—বুঝেছি, তবে তুই প্রস্তুত হয়েছিস্ ?

পুণ্যপ্রভা।—তোর কথা কবে অগ্রাহ্য করেছি ?

দীপ্তি।—আমি শুনেছি,প্রেমাঙ্কুর বাবু বিবাহ করেন নাই, কর্‌বেনও না।

পুণ্যপ্রভা।—তবে তুই আমার মনকে চঞ্চল করিস্ কেন ?

দীপ্তি।—তোর মন যে চঞ্চল হতে পারে, আমার সে বিশ্বাস নাই। তুই চঞ্চল হবি কেন ?—তুই যে পুণ্যপ্রভা।

পুণ্যপ্রভা।—আমার দীক্ষাগুরু চঞ্চল করিলে চঞ্চল হব না ? আমি যে তোরই হাতের পুতুল, তুই যেমন নাচাবি, তেমনি নাচ্‌ব, জানিস্‌নে কি ?

দীপ্তি।—সব সময়ে, না কেবল এই বেলা ?

পুণ্যপ্রভা।—তুই বলিস্ কি ? আমি কোন্ দিন তোর কোন্ কথা অবহেলা করেছি লো দীপ্তি ?

দীপ্তি।—করিস্ নাই, জানি। আমি জানি, তোর পুণ্যের জোরে, তোর স্বভাবের জোরে, তোর ইচ্ছার জোরে প্রেমাঙ্কুর বাবু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে তোরই হবেন। ভবিষ্যৎবাণী শুনে রাখ্। ইহা বুঝেছি বলেই তোর নিকট প্রস্তাব করেছি। পুরুষের প্রতিজ্ঞার কোন অর্থ নাই। তুই যদি ইচ্ছা করিস্-যে প্রেমাঙ্কুর বাবু তোর হউন, তবে তোর ইচ্ছার বলে তাঁহার ইচ্ছা পরাস্ত হ'বে। অবলা রমণী জাতি চিরদিন ইচ্ছাময়ী। তুই ত ইচ্ছার সাগর; তুই যা ইচ্ছা করিস্, তাই কর্‌তে পারিস্। ইচ্ছা-সংগ্রামে তুই নিশ্চয় জয়ী হবি। কিছু ধৈর্য্য ধরে থাকিস্। বিপদ অনেক আছে। প্রলোভনও অনেক

আস্‌বে। তুই ঠিক থাক্‌তে পার্‌বি, আমি জানি, তবুও বলিলাম, সাবধানে থাকিস্‌। তোর ইচ্ছার তেজে অনেকের ইচ্ছা দমন হবে; তোর ইচ্ছাতে অনেকের ইচ্ছা সংযত হবে। তুই ইচ্ছাময়ী মা প্রসন্নময়ীর কন্যা, মনে রাখিস্‌। ভয় কি, প্রেমাঙ্কুর তোরই হবেন।

পুণ্যপ্রভা।—আমি ভয় করি কি? আমার প্রাণে কোন ভয় নাই। তোর আদর্শ যদি প্রাণে রাখ্‌তে পারি, তোর পা দুখানি ধরে যদি অগ্রসর হতে পারি, কিছু ডরাই নাই। দ্যাখ্‌ দীপ্তি, প্রেমাঙ্কুর বাবু কি ব্রাহ্মণকুমার?

দীপ্তি।—সে জন্যও চিন্তা নাই। প্রেমাঙ্কুর বাবু ব্রাহ্মণ-কুমার। যদি নাও হতেন, কোন চিন্তা ছিল না, তিনি ব্রাহ্মণ হতে অনেক শ্রেষ্ঠ।

পুণ্যপ্রভা।—শ্রেষ্ঠ যে,সে সম্বন্ধে কথা নাই,কিন্তু পিতা মাতা অন্য জাতিতে বিবাহ দিবেন কি?

দীপ্তি।—সে অনেক কথা। কে তোর পিতা, কে তোর মাতা, বল্‌ত? কতদিন তুই তাঁহাদিগকে লয়ে থাক্‌বি বল্‌ত? সংসারের আত্মীয়তা, বালীর বাঁধ, এই আছে এই নাই; তুই ভাবিস্‌ কি চিরকাল পিতা মাতার কোলে থাক্‌বি?

দীপ্তির কথা সকল যেন দৈববাণীর ন্যায় মনে হইতেছে,পুণ্যপ্রভা বলিলেন, দীপ্তি, তুই বলিস্‌ কি?

দীপ্তি।—ঠিক কথাই বল্‌ছি?

পুণ্যপ্রভা।—তুই কি মানবী না দেবী?

দীপ্তি।—আমি মানবীও নহি, দেবীও নহি, আমি যা, তাহাই। মানবী একজন দীপ্তি ছিল, আজ চারি দিন তাহার মৃত্যু হইয়াছে, দেবী একজন দীপ্তি ছিল, আজ আট দিন তাহার দেবীত্ব ঘুচেছে। আমি কিছুই নহি। আমি যা, আমি তাই। আমি তোর একজন সখী ছিলাম, আজ আর তাহা নই। আজ আমি কি হয়েছি চেয়ে দ্যাখ্‌।

পুণ্যপ্রভা দেখিলেন, আশ্চর্য্য দর্শন। দেখিলেন, দীপ্তির রূপ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হয়েছে, রোগ নাই, শোক নাই, চিন্তার রেখাও ললাটে নাই, উজ্জ্বল চক্ষু দুটী জ্বলিতেছে, পৃষ্ঠ ছাইয়া চুল পড়িয়াছে, পট্ট বস্ত্র পরিধানে, মুখে হাসি, হাতে ফুল, অপূর্ব্ব দর্শন। পুণ্যপ্রভা দীপ্তির সেরূপ আর কখন দেখেন নাই। মনে করিতেছেন, আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? কথা বলিতে সাহস হইতেছে না, ভাবিতেছেন, এ কি দৃশ্য?

দীপ্তি বুঝিলেন যে, পুণ্যপ্রভার চক্ষে ধাঁধা লাগিয়াছে, বলিলেন, দেখে অবাক্ হচ্চিস্ কেন ? এই যে, আমি শুয়ে আছি, কোন্ দিকে তাকাস্ ?

পুণ্যপ্রভার চক্ষু আরো উপরে উঠিল, পুণ্যপ্রভা চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, বলিলেন, দীপ্তি তুই কোথায় চলিলি ?

পুণ্যপ্রভার ক্রন্দন শুনিয়া এঘর ওঘর হইতে লোক ছুটিয়া আসিল। পুণ্যপ্রভা তখন মাটীতে পড়িয়া অজ্ঞান হইয়াছেন। দীপ্তিও সংজ্ঞাহারা হইয়া আছেন। কি হইয়াছে, কেহই কিছু বুঝিতে পারিল না। পুণ্যপ্রভার মস্তকে জল দিতে দিতে পুণ্যপ্রভার চৈতন্য হইল। দীপ্তির মাথায় জল ও বাতাস দিতে দিতে তাহারও চৈতন্য হইল। ডাক্তার ডাকা হইল, তিনি আসিয়া বলিলেন, দুর্ব্বলতার দরুণ উভয়ের চৈতন্য লোপ পাইয়াছিল। দীপ্তি যাহা দেখিয়াছেন, পুণ্যপ্রভা তাহা বুঝেন নাই। পুণ্যপ্রভা যাহা দেখিয়াছেন, দীপ্তিও তাহা বুঝেন নাই। এ কিরূপ ঘটনা, সকল মানুষ ব্যাখ্যা করিতে পারে না।

তারপরও দুই দিন এইরূপ ঘটনা ঘটিল। ডাক্তার একদিন দেখিলেন, দীপ্তির চক্ষু মাথার উপর উঠিয়াছে, পুণ্যপ্রভারও তাহাই। দীপ্তির ইহা বিকারের অবস্থা বলিয়া ডাক্তার ব্যাখ্যা করিলেন ; পুণ্যপ্রভার ইহা উন্মাদের পূর্ব্ব লক্ষণ বলিলেন। পৃথিবীর লোকেরা বুঝিল না, এ কি লক্ষণ !

মৃত্যুর অব্যবহিত পরে এবং পূর্ব্বে এরূপ ঘটনা পৃথিবীতে বিরল নহে ; অনেকেই প্রত্যক্ষ করেছেন, আমরাও করেছি। অনেক কুসংস্কারাপন্ন লোকেরা ইহাকে ভূতে পাওয়া বলেন ; আমরা বলি, পুণ্যপ্রভার পক্ষে ইহা ভালবাসার একটা লীলা। ইহকাল ও পরকালের সন্ধিস্থলে একাত্ম দুই পক্ষী দাঁড়াইয়া, দুই জনই তন্ময়, দুই জনই দুয়ের ভাবে বিভোর। কল্পনা, ভাব, আদর্শ, সব মিলিয়া নয়নের কাছে প্রতিভাত হয়—এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি। শয়নে, স্বপনে এবং জাগ্রত অবস্থায়,সব সময়েইএরূপ হয়। ইহা এক অলৌকিক ব্যাপার। বিশ্বাসী প্রেমিক ভিন্ন কেহ এ তত্ত্ব ভেদ করিতে পারে নাই, পারিবে না।

তারপর ক্রমে ক্রমে দীপ্তির বিকারের অবস্থাই স্পষ্ট প্রতিভাত হইতে লাগিল। জ্বরও বাড়িয়া উঠিল। প্রথমত ডাক্তার বলিলেন যে, একাদশীর দরুণ এরূপ হইয়াছে, কিন্তু সে বিশ্বাস দুই দিন পরেই চলিয়া গেল। চতুর্দ্দিকে হাহাকার পড়িয়া গেল, দীপ্তির পিতা মাতা উন্মত্তের ন্যায় হইলেন, সখীরা পাগলের ন্যায় হইয়া উঠিল, পুণ্যপ্রভা অশ্রুজলে ভাসিয়া সকলকে বুঝাইতে

লাগিলেন, পিতা মাতাকে বলিলেন, "দীপ্তির অভাব আমিই পূর্ণ করিব, আমিই মা বাবা বলিয়া ডাকিব।" কিন্তু কার কথা কে শুনে! সকলেই অস্থির।

দীপ্তি, মহাপ্রলাপের অবস্থায়, সকলের সহিতই নানা কথা বলিতে লাগিলেন। সে সকল প্রলাপের মধ্যেও মহা অর্থ আছে। কিছু কিছু প্রলাপ আমরা তুলিয়া দিলাম। দীপ্তি মাতাকে একবার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন; মা কাছে আসিলে বলিলেন "মা, তুই আর আমার কাছে আসিস্ না কেন? মায়া ছাড়িস্ বুঝি?"

দীপ্তির মাতার চক্ষের জল পড়িতে লাগিল। তিনি ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারেন না বলিয়া, ডাক্তার দীপ্তির নিকট আসিতে তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি বড় একটা কাছে আসতেন না। চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে, মুখে ও চক্ষে হাত বুলাইয়া মা বলিলেন—"মা, আমি ত তোমার কাছে কাছেই থাকি, ডাক্তার নিষেধ করেন, তাই ধারে বসি না, ভয় কি মা, তুমি আরোগ্য হও, আমরা ত তোমারই আছি।"

দীপ্তি।—"মা, কাঁদিস্ নে, তোর ভাবনা কি? তোর যে এক মেয়ে ছিল, আজ কদিন তার মৃত্যু হয়েছে, কুমারের বাঁধা ঘাটের ধারে তাহাকে দাহ করা হইয়াছে, আমি তোকে সান্ত্বনা দিতে এসেছি, মা তুই কাঁদিস্ নে, আবার তার সঙ্গে তোর দেখা হবে।" এই কথার পর মায়ের প্রাণ কেমন হয়, সকলেই বুঝিতে পারেন। আর আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া চিৎকার করিয়া জননী কাঁদিয়া উঠিলেন। দীপ্তি উঠিয়া মায়ের গলা ধরিয়া মুখ চুম্বন করিয়া চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "মা তুই কাঁদিস্ নে, যে গিয়াছে, তার জন্য আর মায়া কি? পুণ্যপ্রভার দিকে চেয়ে থাক্, পূর্ব্ব জন্মে সে তোর মেয়ে ছিল, জানিস্ নে কি? তোর মেয়ের অভাব সে দূর কর্‌বে। পুণ্যপ্রভাই তোর মেয়ে, দীপ্তি কেহ নয়। দ্যাখ্ মা, তোর পুণ্যপ্রভার সঙ্গে প্রেমাঙ্কুর বাবুর বিয়ে দিস্ কিন্তু। সত্যি সত্যি বিয়ে দিস্ কিন্তু।"

দীপ্তি উঠিয়া বসিয়াছে দেখিয়া সখীরা ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে শোয়াইয়া দিল। ডাক্তারের নিষেধ, তাহারা কি করিবে? দীপ্তি সরলাকে বলিলেন,—"দ্যাখ্ সলি, তুই ত এ পৃথিবীর কাঙ্গালিনী, তুই থেকে কি কর্‌বি, তুই চল আমার সঙ্গে, আমরা দুজনে মহাসুখে থাক্‌ব, কেমন সলি, যাবি? আমি গেলে, তোকে আর কে যত্ন কর্‌বে? তোকে বুঝ্‌তে বা চিন্‌তে পারে, এ পৃথিবীতে এমন লোক নাই, তুই আমার সঙ্গে চল্। কেমন সলি, যাবি?"

সকলের চক্ষেই জল-ধারা, সরলা কিছুই বলিল না; সে মেয়ে নীরবে থাকিতেই ভালবাসে। সে আড়ম্বরহীনা নিবিয়া থাকিতেই চায়। একটী কথাও বলিল না।

দীপ্তি, লীলা, ও তিলোত্তমার গলা ধরিয়া টানিয়া মুখ-চুম্বন করিলেন। তারপর বলিলেন—"আহা, তোদের মুখ মলিন হয়ে গেছে, তোদের এত শোক! তোরা দীপ্তিকে এতই ভালবাসিস্ যে, তার জন্য তোদের এত কষ্ট! সে ত গিয়াছে, তার জন্য আর কাঁদিস্ না। এখন পুণ্যপ্রভাকে যত্ন কর্। সে বড় ভাল মেয়ে। তোরা চেষ্টা করে, প্রেমাঙ্কুর বাবুর সহিত তার বিয়ে দিস্, দেখিস্ যেন ভুলিস্ নে।"

এই সময়ে ঘরে অধিক লোক থাকিতে ডাক্তার বাবু নিষেধ করিয়াছিলেন, পুণ্যপ্রভাকেও পৃথক ঘরে নেওয়া হইয়াছে। এক এক বার ২।৩ জনের অধিক লোক ঘরে যাইতে দেওয়া হয় না। প্রেমাঙ্কুর বাবু ঘরে ছিলেন না। দীপ্তি তাঁহাকে একবার দেখিতে চাহিলেন। প্রেমাঙ্কুর বাবু আসিলে সরলা বলিল, "ঐ দ্যাখ্, প্রেমাঙ্কুর বাবু এসেছেন।" দীপ্তি নির্নিমেষ নয়নে প্রেমাঙ্কুর বাবুকে দেখিলেন, তারপর তাঁহার পদধূলি মাথায় লইতে চাহিলে সরলা ধূলি তুলিয়া দীপ্তির মাথায় দিল। দীপ্তি বলিলেন—"আপনার সহিত আমার কি যোগ, আমার মৃত্যুর পর তাহা জানিবেন। আপনি আপনার শেষ কর্ত্তব্য পালন করেছেন, আমি শ্রীচরণে অপরাধিনী রহিলাম। অপরাধ মার্জ্জনা করিতেও আপনাকে বলিতে পারি না। আমি আপনার আদর্শহীনা বালিকা। কি আর বলিব, একটী অনুরোধ, আমার প্রিয় সখী পুণ্যপ্রভাকে আপনি দেখিবেন, পুণ্যপ্রভাকে শ্রীচরণে স্থান দিবেন, সে আপনার অনুপযুক্তা নহে।" প্রেমাঙ্কুর বাবু এ সকল কথা শুনিয়া কিছুই বলিলেন না। তাঁহার দুনয়ন হইতে জল পড়িতে লাগিল, তিনি আর এ দৃশ্য সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। দীপ্তি দেবী প্রসন্নময়ী ও দেব তারানাথকে দেখিতে চাহিলেন। তাঁহারা আসিলে উভয়ের চরণ ধূলি মাথায় লইলেন, তারপর বলিলেন, "আপনি আমার বাবা, আপনি আমার মা; আমার জনক জননী রহিলেন, আপনারা দেখিবেন। আমি চলিলাম, পুণ্যপ্রভা যেন আমাদের ঘর, আপনাদের ঘর, দুই ঘর আলো ক'রে থাকে। আপনাদের চরণে আমার শেষ অনুরোধ এই—প্রেমাঙ্কুর বাবু অতি সৎ পাত্র, পুণ্যপ্রভাকে আপনারা ইঁহার সহিত বিবাহ

দিবেন।” প্রসন্নময়ী বলিলেন “মা দীপ্তি, তুমি অধীরা হয়ো না, মা জগদম্বাকে ডাক, তাঁহাকে দেখ। তিনি তোমাকে কোলে করে আছেন।”

দীপ্তি বলিলেন,“তিনি আমার ঔষধ পথ্য, আমি কলঙ্কিনী হইয়াও তাঁহার পূজার অধিকারিনী হইয়াছি। এই সান্ত্বনায় মহা আনন্দে আছি। দীপ্তির শোক আমি তাঁহার কথাতেই ভুলেছি। দীপ্তি আমার এক সখী ছিল, আজ কদিন হলো, তার মৃত্যু হয়েছে, কুমারের বাঁধা ঘাটে তাহার শ্মশান দেখেন নাই কি? মা জগদম্বা মহা উল্লাসে হাস্‌ছেন, আমি এই মাত্র দেখে এলাম। আমার প্রফুল্লনয়না রঙ্গময়ী মায়ের কি উজ্জ্বল রূপ গো? দেখ্‌লে প্রাণ জুড়ায়। আমার ইচ্ছা হয় দিন রাত ওখানে পড়ে থাকি।”

প্রসন্নময়ী ও তারানাথ অবস্থা বুঝিলেন, আর কথা বলা সঙ্গত বোধ হইল না, মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া উভয়ে নীরবে নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। নয়ন হইতে অবিরল ধারায় জল পড়িতেছিল। পাষাণও আজ গলিয়াছে। পশু পক্ষী যেন আজ কেমন হইয়া গিয়াছে—বিড়াল কুকুর গুলিও সকলের অবস্থা দেখে আজ কেমন কেমন হয়ে গেছে। আজ বিধিকৃষ্ণপুরে আনন্দ নাই, উল্লাস নাই, সাড়া নাই, শব্দ নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই। এক অতি পবিত্র দৃশ্য। দীপ্তি আজ বুঝি ধরা ধাম পরিত্যাগ করে, সকলের মুখে কেবল এই নিদারুণ কথা।

ইহার পর দীপ্তির অবসাদের অবস্থা। দীপ-নির্ব্বাণের পূর্ব্ব-ঔজ্জ্বল্য ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে—এখন স্থির, প্রশান্ত ভাব। দীপ্তি এখন যেন ক্রমে ক্রমে প্রস্তুত হইতেছেন। উত্তেজনা যাহা ছিল, তাহাও কমিয়া আসিতেছে। তার পরের অবস্থা লিখিতে পারে, এমন শক্তি কাহার আছে?

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মহাশ্মশানে দীপ্তি।

রাত্রি দুই প্রহরের সময় দীপ্তি, সকল মায়া, সকল যন্ত্রণার হাত এড়াইয়া অমর ধামে প্রস্থান করিলেন। বিধিকৃষ্ণপুরের শোভা সৌন্দর্য্য, প্রেম পুণ্য, সবই যেন আজ নির্ব্বাণ হইল। ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল উঠিল,—স্ত্রী-পুরুষ সকলে হাহাকার করিতে লাগিল। সরলার চক্ষে এক বিন্দুও জল নাই, সে

নির্ব্বাক হইয়া যেন কিসের আয়োজন করিতেছে। লীলা, তিলোত্তমা, পুণ্যপ্রভা কাঁদিয়া ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছেন। তারানাথ আর প্রসন্নময়ী, দীপ্তির মাতা আর বেণীমাধব—চারিজন আজ মণিহারা ফণী হইয়া কি করিতেছেন, ভাষার সাধ্য নাই ব্যক্ত করিতে পারে। নীলকান্ত, চক্রবর্ত্তী, হরিগোপাল মহা শ্মশানের আয়োজন করিতেছেন। শান্তিশীলা দীপ্তির মাতাকে কোলে করিয়া আছেন। নৈশ গগনে নক্ষত্রগণ আজ বিধিকৃ...র গভীর শোকের ইতিহাসের সাক্ষী; বায়ু বহিতেছে, জগৎ নিস্তব্ধ হইতেও নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। বিধিকৃষ্ণপুরে আজ কি সর্ব্বনাশ!! সোণার দীপ্তি আজ প্রাঙ্গণে ধূলি-শয্যায় মহা নিদ্রায় অচেতন!!

পুণ্যপ্রভা কিছুক্ষণ পরে শুনিলেন যে, দীপ্তিকে প্রাঙ্গণের মাটীতে শোয়াইয়া রাখা হইয়াছে। পুণ্যপ্রভা তখন পাগলিনীর ন্যায় ছুটিয়া যাইয়া মাটীতে বসিলেন এবং দীপ্তিকে কোলে তুলিয়া মুখ চুম্বন করিয়া বলিতে ...লেন—"কোন্ নিষ্ঠুর দীপ্তির এই দশা করিল? বুঝিবা মাটীতে শোয়াইয়াই দীপ্তিকে কেহ মারিয়াছে! কে এমন নিষ্ঠুর? না, দীপ্তি ত মরে নাই, দীপ্তি অভিমান করে শুয়ে আছে, সে বড় অভিমানিনী। দীপ্তি, আমার বুকের ধন, বুকে আয়। আমার সোণার চাঁদ, আমার উষার আলো, আমার সাঁজের তারা, আমার পদ্মের মৃণাল, আমার গোলাপের পাপ্‌ড়ি, আমার বুকের ধন, তোর কি ধরাশয্যা সাজে? ছি ছি ছি, উঠে চল, তোকে লোকেরা দেখ্‌ছে যে, চল, আমরা দুজন বাগানে যেয়ে প্রাণের কথা বলি। আমরা অনেকক্ষণ তোর কাছে আসি নাই বলে অভিমান হয়েছে বুঝি; আজ ক্ষমা কর্, আর কখনও অপরাধ কর্‌ব না। হায়, আমার সোণার চাঁদপানা মুখখানা আজ এমন মলিন হলো কেন? চক্ষু দুটী বুজে রইল কেন? আজ হাত পা এমন নিস্পন্দ কেন? কোন্ দস্যু আজ এমন করিল? আমি বেঁচে থাক্‌তেই দীপ্তির এই দশা কর্‌লে? আমার সাহসকে ধিক্, আমার শক্তিকে ধিক্! সকলেরই চক্ষে জল, কেহ কিছু বলে না, তবে কি দীপ্তি নাই? দীপ্তি, দীপ্তি,—কথা বল্; তুই ত বলেছিস্, আমি ডাক্‌লেই তুই কাছে আস্‌বি। আমাকে দেখা দে।"

পাগলিনী চেয়ে দেখিলেন, শূন্যপথে দাঁড়াইয়া দীপ্তি বলিতেছে—"পুণি, এই দ্যাখ্ আমি এসেছি. মাটীর দেহ-ছায়া ছেড়ে দে, এই দ্যাখ্ আমি কোথায়। ঐ ছায়াটা অপবিত্র হয়েছে, ওটা ফেলে দে, এই দ্যাখ্ আমি কোথায়। আমি

তোরই আছি, তোরই থাক্‌ব। চিরদিনই থাক্‌ব। তুই ওঠ, যদি তুই সকলকে ঠিক রাখ্‌তে না পারিস্ তবে তোর নামে কলঙ্ক পড়্‌বে। শীঘ্র যা, সকলকে বুঝা গিয়া, আমার জন্য কাঁদিস্‌নে; আমি নিত্যই তোকে দেখা দিব।"

দীপ্তির কথাও যেমন, রূপও তেমনি, পুণ্যপ্রভা শুনে ও দেখে তন্ময় ভাবে দীপ্তিকে কোলে করে বসে আছেন। রাত্রি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। কে পুণ্যপ্রভার কোল থেকে দীপ্তিকে নিবে? সাধ্য কাহার? পুণ্যপ্রভা যেন দীপ্তির পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, সকলই। পুণ্যপ্রভা দীপ্তিময়ী হইয়া আছেন।

ইত্যবসরে লীলা ও তিলোত্তমা বাগান হইতে রাশি রাশি ফুল তুলিয়া আনিয়াছেন। তাঁদের চক্ষে ধারা বহিতেছে, কিন্তু তবুও শেষ কাজটুক না করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা রাশি রাশি ফুল দিয়া দীপ্তিকে অপরূপ করিয়া সাজাইলেন। পুণ্যপ্রভাকেও সেই ফুলে সজ্জিত করিলেন। ছায়া এবং কায়া মিলিয়া যেন এক হইয়া গিয়াছে।

বিধিকৃষ্ণপুরের সকলেরই আজ দুর্দ্দিন, কিন্তু ডাক্তার বাবুর আজ হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না। তিনি মৃতদেহ পরীক্ষা করিবেন, রাত্রে কোন মতেই দাহ করিতে দিবেন না, এইরূপ আপত্তি করিতেছেন। তিনি হরিগোপালের পক্ষ হইতেও টাকা লইলেন এবং কালীকান্তের পক্ষ হইতেও টাকা লইলেন। হরিগোপাল আজ কেন টাকা দিলেন? বাসি মড়া করিলে অযথা বেণী-মাধবের বংশে কলঙ্ক পড়ে, এইজন্য টাকা দিয়া তিনি ডাক্তার বাবুকে কিনি-লেন। টাকা লইয়া ডাক্তার বাবু দাহ করিতে অনুমতি দিলেন এবং মিথ্যা রিপোর্ট নোট বুকে লিখিয়া মহা সুখে মাদারিপুর যাত্রা করিলেন। এদিকে মহা আয়োজন হইতে লাগিল!

প্রেমাঙ্কুর বাবু কোথায়? দীপ্তির প্রাণ বাহির হওয়ার পরই তিনি যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। প্রেমিকের পক্ষে দারুণ শোক সহ্য করা বড়ই কঠিন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বিষাদের ছায়া। তিনি বিধিকৃষ্ণপুর পরিত্যাগ করিয়াছেন।

যথা রীত্যনুসারে সকল আয়োজন হইলে পুণ্যপ্রভাকে বুঝাইতে ও ধরিয়া তুলিতে নীলকান্ত গেলেন। যাইয়া বলিলেন, "তুমি ত সকলই বুঝিতেছ, এখন সকলকে রক্ষা করা তোমার কাজ। দীপ্তি তোমার উপরই ত সকল ভার দিয়া গিয়াছে, এখন ঘরে চল, দেখ এসে দীপ্তির মাতা একেবারে অস্থির হয়ে পড়েছেন।"

পুণ্যপ্রভা কতকটা বুঝিলেন, দীপ্তির আগুন ত চিরদিন অন্তরে থাকিবে, তবে এখন অধৈর্য্য হলে চল্‌বে কেন? তিনি দীপ্তিকে নীলকান্তের হাতে দিয়া বলিলেন—"দেখিবেন, দীপ্তির যেন অযত্ন না হয়, আমি আসিতেছি।"

যখন পুণ্যপ্রভা ঘরে গেলেন, তখন হরিবোলের রোলে আকাশ কাঁপাইয়া দীপ্তিকে শেষ-শয্যায় শয়ন করাইয়া,দীপ্তির কথানুসারে, কুমারের বাঁধা ঘাটের ধারে আনিয়া রাখা হইল। ঘাটই আজ শ্মশানে পরিণত। শ্মশানে আর লোক ধরে না। বিধিকৃষ্ণপুরের সকল লোক আজ শ্মশানে—স্ত্রী পুরুষ আজ শ্মশানে সম্মিলিত। যেন মহা পুণ্যতীর্থের মহামেলায় দেশের সকল যাত্রী মিলিয়াছে। কে কাহাকে বারণ করিবে, গৃহ কোণের কুল বধূ,ঘরের মেয়ে ছেলে, বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলে আজ কুমারের ঘাটে সমবেত।

ক্রমে ক্রমে দীপ্তি যেমন বলিয়াছিল, ঠিক সেইরূপ, বাঁধা-ঘাটের সম্মুখে, এক চত্তাল সমভূমির উপর চিতা সজ্জিত হইল। রীত্যনুসারে সকল কার্য্য সমাধা হইলে চিতার উপর দীপ্তিকে স্থাপন করা হইল। ধূণা, ঘৃত, চন্দন কাষ্ঠ সমস্ত দীপ্তির দেহের চতুর্দ্দিকে স্থাপন করা হইল। তৎপর দীপ্তির চিতায় অগ্নি দেওয়া হইল। প্রবল বায়ুর উল্লাসে চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। যখন চতুর্দ্দিকে অগ্নিশিখা বিস্তার করিয়া ধূ ধূ করিয়া চিতা জ্বলিয়া উঠিল, তখন সকলে করযোড়ে আকাশের দিকে চাহিয়া যেন বলিতে লাগিলেন, —"দীপ্তি যেন স্বর্গে স্থান পায়, এবং মর্ত্ত্যে এই শ্মশান যেন পুণ্যতীর্থে পরিণত হয়।"

নৈশ আকাশে হু হু ধূ ধূ করিয়া প্রজ্জলিত অগ্নিশিখা উঠিতে লাগিল, মর্ত্ত্যের হরিধ্বনি আকাশ কাঁপাইয়া উপরে উঠিতে লাগিল, তাহা শুনিয়া দেবতারাও যেন সকলে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একদিক হইতে রাশি রাশি পুষ্প চিতার উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। আর একদিক হইতে রাশি রাশি কর্ত্তিত কেশ পড়িতে লাগিল। আর একদিক হইতে রাশি রাশি ছিন্ন বস্ত্র পড়িতে লাগিল, আর একদিক হইতে চুয়া-চন্দন পড়িতে লাগিল, আর একদিক হইতে স্বর্ণরৌপ্য, ঘৃত-ধূপ পড়িতে লাগিল। কোথা হইতে কে কি ফেলিতে লাগিল, কেহই জানে না। প্রায় সহস্র লোকের সমাগম। মহা অগ্নি যখন খুব প্রজ্জলিত হইয়া দীপ্তির দেহকে আক্রমণ করিয়াছে, তখন, যে দিকে প্রবল প্রবাহিত বায়ু অগ্নিকে লইয়া খেলা করিতেছিল, অর্থাৎ যে দিকে উত্তাপের জন্য লোক দাঁড়াইতে পারিতেছিল না,

সেই দিক হইতে পাগলিনী বেশে এক মলিনা চকিত ভাবে উপস্থিত। আর কোন কথা শুনা গেল না, কেবল "দীপ্তি, তুই ত আমাকে ডেকেছিস্, এই এসেছি, আমাকে ধর্, আমাকে কোল দে" এই কয়টী কথা শুনা গেল। কে গেল, কে কথা বলিল, ধর্ ধর্, বলিতে বলিতে নিমেষের মধ্যে মলিনা প্রজ্জলিত অগ্নির মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছে। বোধ হইল যেন সর্ব্বাঙ্গে ঘৃতাদি লেপন করিয়া আসিয়াছিল, যেমন মহা অগ্নির মধ্যে পড়িল, অমনি সর্ব্বাঙ্গে ধূ ধূ করিয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। চিতায় পড়িয়া একবারও পাশ ফিরিল না, একবারও নড়িল না। কে কে, ধর্ ধর্ করিতে ২ নিমেষের মধ্যে এইরূপ কাণ্ড হইয়া গেল। অগ্নির প্রকোপ তখন এমন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে যে, ধারে যায়, সাধ্য কাহার। কে চিতায় পড়িল, কেহই বুঝিল না; ক্ষণকালের মধ্যেই সকলে বুঝিল, যে-ই পড়িয়া থাকুক, তাহারও প্রাণ গিয়াছে। মহা শ্মশানে আর হস্তক্ষেপ না করিয়া যে যে ভাবে ছিল, দাঁড়াইয়া রহিল, অগ্নি ক্রমাগতই জ্বলিতে লাগিল। কিছু সময়ের মধ্যেই চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইল যে,সরলা নাকি দীপ্তির সহ গমন করিয়াছে। কেমন নীরব ভালবাসা, কেমন আড়ম্বর-শূন্য আত্মত্যাগ!—ভাবিয়া সকলে অবাক্ হইল। ভাবসিন্ধু সকলের হৃদয়ে উথলিত হইল, কিন্তু কেহই কোন কথা বলিল না। ক্রমে ক্রমে উভয়ের দেহ ভীষণ অগ্নি-রাশিতে ভস্ম হইতে লাগিল। সৌন্দর্য্য ও রূপ গেল, লাবণ্য ও কান্তি গেল, চর্ম্ম ও মাংস গেল,মেদ ও অস্থি গেল— শেষে, এত সাধের শরীরের অতি অল্পই বাকী! সকলে স্পন্দরহিত ভাবে দাঁড়াইয়া আশ্চর্য্য লীলা দেখিতেছে। মায়া গেল, প্রেম গেল, দয়া গেল, পুণ্য গেল, বুঝিবা সকলই আজ চিতায় ভস্ম হইতে লাগিল। সকলে নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। আশ্চর্য্য দৃশ্য! ক্রমে ক্রমে রজনী শেষ হইয়া আসিল, ঊষার অযুত কিরণ পূর্ব্বদিক্‌কে উদ্ভাসিত করিয়া উঠিল যখন, দুই সোণার প্রতিমা তখন ভস্ম হইয়া গিয়াছে। বায়ু বহিতে লাগিল,সকলে কুমা-রের জল কলসী ভরিয়া তুলিয়া তুলিয়া মহা অগ্নি নির্ব্বাণ করিলেন; মহা অগ্নি নহে,—মহা প্রেম, মহা দয়া, মহা পবিত্রতা। যে অমূল্য জিনিস আজ শ্মশানে ভস্ম হইল, মর্ত্ত্যধামে ইহা মিলে কদাপি। যখন চিতা নির্ব্বাণ হইল, তখন গ্রামের মেয়েরা চিতার ছাই আঁচলে বেঁধে ঘরে লইয়া চলিল। আজ তাহাদের কুসংস্কার গিয়াছে, ভয় গিয়াছে, লজ্জা গিয়াছে, সকলে যেন কেমন একরূপ হইয়াছে। কেহ ২ বা শ্মশানের ছাই তুলে মস্তকে রাখিতে লাগিল, কেহ বা

সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে লাগিল। যখন চিতা নির্ব্বাণ হইল, কুমারের জলে পুরুষেরা স্নান করিয়া শ্মশানের ছাই তুলিয়া কপালে ফোঁটা দিয়া ঘরে ফিরিল। মহাশ্মশানে অমূল্য জিনিস বিধিকৃষ্ণপুর আজ হারাইল! সকলের সকল সুখ কাড়িয়া লইয়া আজ চিতা নির্ব্বাণ হইল। অথবা পুণ্যপ্রভা প্রতিষ্ঠিত হইল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গবর্ণমেণ্টের আদর্শ ডেপুটী।

তারপর দিন, বিধিকৃষ্ণপুরের যেন বিজয়া দশমীর পর দিন। সোণার প্রতিমা ডুবিয়াছে, আর আছে কি? আজও সূর্য্য উঠিয়াছে,আজও বাগানে ফুল ফুটিয়াছে,পাখী গান করিতেছে,বায়ু বহিতেছে,কুমারের স্রোত তেমনি পূর্ব্বের ন্যায় বহিতেছে,কিন্তু পঞ্চসখীর হাটে আছে আজ কেবল তিন সখী! বেণীমাধবের ঘর যেন শূন্য হইয়াছে,শোভা নাই,সৌন্দর্য্য নাই,প্রতিমা বিসর্জ্জনের পর দিন বঙ্গদেশের মণ্ডপের যে দশা হয়,আজ এ বাড়ীর সেই দশা! বাড়ীতে আজ কে পদার্পণ করিতে পারে? এই কয়দিনের চিকিৎসায় পুণ্যপ্রভার শরীর অনেকটা সুস্থ হইয়াছে; পুণ্যপ্রভা আজ দেহ প্রাণের মমতা ছাড়িয়া খাটিতেছেন। পুণ্যপ্রভা,লীলা,তিলোত্তমা,তিন সখী দীপ্তির পিতা-মাতার সেবায় নিযুক্তা আছেন, কিন্তু তাঁহাদের জীবনের সুখ যেন আজ চিরদিনের মত চলিয়া গিয়াছে। শরীরের বোঝা বহিবার জন্য যে দুখানি করিয়া পা আছে,তাহা যেন আজ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে,নিস্তেজ,বলশূন্য। তাহাদের আর কি সুখের আশা আছে? লোকে বলে, যার ঘরে ছেলে মেয়ে নাই,তার ঘর শ্মশান। কি আশায় তাঁহাদের মন আজ ঘরে রহিবে? তাঁহাদের শরীরটা কেবল পড়িয়া আছে, আর সুখ বল, শান্তি বল, আনন্দ বল, সকলই যেন দীপ্তির সহিত চলিয়া গিয়াছে। আর সরলার পিতা,মাতা ও দাদার ক্রন্দনে আজ গ্রাম তোলপাড় হইতেছে!!

দেবী প্রসন্নময়ী এবং তারানাথ আজ গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন। প্রসন্নময়ী,লীলা, পুণ্যপ্রভা, তিলোত্তমা, কাল তাঁহাদের ভাল ভাল কাপড় যাহা ছিল, সকল দীপ্তির চিতায় দিয়াছেন; মাথার চুল মুণ্ডন করিয়া চিতায় দিয়াছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে বিলাস-বাসনাও তাঁহারা, বুঝিবা, বিসর্জ্জন দিয়াছেন। সরলাকে রাখিবার জন্য লীলা ও তিলোত্তমা যারপর নাই চেষ্টা করিয়া-

ছিলেন, কিন্তু সে কেবল বলিয়াছিল,—"তোরা বারণ করিস্ না, দীপ্তি আমাকে যেতে বলেছে!" দীপ্তি যেতে বলেছে, ইহার পর কে বাধা দিবে? সরলা মায়ের অঞ্চলের বন্ধন, পিতার অতুল ভালবাসা, ভ্রাতার স্নেহ, সকলের মমতা বিসর্জ্জন দিয়া দীপ্তির প্রেমের খাতিরে জীবন দিয়াছে। দুঃখিনী ও কাঙ্গালিনী বলে জগতের আর সকলে তাহাকে ঘৃণা করিতে পারে, কিন্তু যৌবন ত তাহাকে ঘৃণা করে নাই! যৌবন তাঁহাকেও ত অতুল রূপ দিয়াছিল, কিন্তু তার নিকট সবই তুচ্ছ। দীপ্তির এমনই ভালবাসা! কাঙ্গালিনী বলে সে পিতা মাতা ও ভ্রাতার ভালবাসায় বঞ্চিতা ছিল না, কিন্তু আজ দীপ্তির ভালবাসার নিকট ঐ ভালবাসা তুচ্ছ। সরলাকেও বিসর্জ্জন দিতে হইল, ইহাতে তিন সখী আজ হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইয়াছেন। তিন সখী আজ গৈরিক পরিধান করিয়াছেন। মুণ্ডিত-মস্তক, গৈরিকাবৃতা সন্ন্যাসিনীর দল আজ বিধিকৃষ্ণপুরে শোকের এক নূতন পরিচ্ছেদ রচনা করিয়াছেন। যখন দীপ্তির পিতা-মাতার চেতন হইল, তখন ইহাদের শোক-পরিচ্ছদ দেখিয়া যেন একটু শান্তি পাইলেন। তাঁহারাও ঐ রূপ বেশ ধারণ করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে মিলিলেন, শান্তিশীলা ও হরিগোপাল। দীপ্তির মৃত্যু হরিগোপালের নবজীবনের কারণ হইল। দেবী প্রসন্নময়ীর স্বর্গীয় ধর্ম্ম-প্রভায় তাঁহার হৃদয় মনের মলিনতা ঘুচিয়াছিল, দীপ্তির মৃত্যু সেই স্থল পবিত্রতার মহিমাময় ঔজ্জ্বল্য পরিপূর্ণ করিল। লোক মিথ্যা কথা না বলিলে, বা পাপকার্য্য না করিলেই ধার্ম্মিক হয় না, সত্য আচরণ ও পুণ্য কার্য্যানুষ্ঠান করিলে তবে প্রকৃত ধর্ম্মের উদয় হয়। দেবী প্রসন্নময়ীর সংস্পর্শে হরিগোপালের পাপের প্রতি ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল, দীপ্তির মৃত্যুতে পুণ্যে রুচি, পবিত্রতায় মতি, ধর্ম্মে অনুরাগ জন্মিল। এই পরিবর্ত্তনে মহা কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করিল। শান্তিশীলা এত দিন পরে বুঝিলেন যে, স্বামীর উদ্ধারের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে।" দীপ্তি কি অসামান্যা মেয়ে,পবিত্রতা রক্ষার জন্য,পুণ্যপ্রভাকে বজায় রাখার জন্য অম্লান চিত্তে প্রাণ দিলেন! ধর্ম্মের জন্য,পুণ্যের জন্য,পবিত্রতার জন্য,এরূপ প্রাণ দিতে কজন পারে?"হরিগোপাল আজ কেবল এই সকল কথাই ভাবিতেছেন। দীপ্তির শ্মশান তাঁহার হৃদয়ে স্বর্গের দুয়ার খুলিয়া দিয়াছে, তিনি সমস্ত দিন কেবল পবিত্রতা রক্ষার জন্য দীপ্তির প্রাণত্যাগের কথা ভাবিতেছেন। ভাবিতেছেন, "কবে এরূপ হইবে যে,আমিও পুণ্য এবং পবিত্রতার জন্য প্রাণ দিতে পারিব? আমি কি নরাধম! দীপ্তির জীবনত্যাগের কারণ আংশিক রূপে আমি। শুনেছি,

খ্রীষ্ট পাপী উদ্ধারের জন্য জীবন দিয়াছেন, দীপ্তিও আমার ন্যায় নরাধমের উদ্ধারের জন্য প্রাণ দিয়াছেন। কি আদর্শ জীবন !! হায়, আমি কবে দীপ্তির ন্যায়, ধর্ম্মের খাতিরে, পবিত্রতার জন্য প্রাণ দিতে পারিব ?" সমস্ত দিন হরিগোপাল কেবল এই কথা ভাবিতেছেন। দীপ্তি, তাঁহার হৃদয়ে নবরাজ্য খুলিয়া দিয়াছেন,—পুণ্যপ্রভা চির মুদ্রিত করিয়াছেন, নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছেন। হরিগোপাল দীপ্তির শোকে গৈরিক পরিধান করিলেন, শুধু তা নয়, হবিষ্যান্ন আরম্ভ করিলেন। জীবনের সমস্ত আসক্তি যেন শ্মশানে ঢালিয়া আসিয়াছেন, সমস্ত সুখ-ইচ্ছা যেন দীপ্তির চিতার অগ্নিতে বিসর্জ্জন করিয়াছেন। হরিগোপাল মহামহিমাময় পুণ্যধামের নবযাত্রী হইয়াছেন। শান্তিশীলা আজ গভীর শোকের দিনে স্বামীর হৃদয় মনের পরিবর্ত্তন দেখিয়া অনেক শান্তি পাইলেন ; ভাবিলেন, দীপ্তির একটা জীবনে যদি দশটী পাপীরও নবজীবন লাভ হয়, জীবন সার্থক, পুণ্যময়ী জননীর জন্ম সার্থক, পিতার জীবন সার্থক। এই পবিত্র দিনে হরিগোপাল শান্তিশীলার সহিত পরামর্শ করিয়া একখানি উইল করিলেন। জেলে যাইতে তাঁহার আর যেন একটুও ভয় নাই। তিনি বিষয় সংরক্ষণের সুন্দর বন্দোবস্ত করিলেন। মৃত্যুর জন্য যেন প্রস্তুত হইলেন। মহামায়ার মহালীলা।

এদিকে এইরূপ শোকের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া বিধিকৃষ্ণপুরের পাপ, অপবিত্রতা, অপ্রেম ভস্ম করিতেছে, অন্য দিকে দীপ্তির মৃত্যু এবং পুণ্যপ্রভার আরোগ্যের সংবাদ পাওয়ার পর, নৌকা সাজাইয়া, নব ডেপুটী বাবু, নব প্রেমিক, নব রসিক, নবীন নাগর সাজিয়া বিধিকৃষ্ণপুরে উপস্থিত হইলেন। লোকে বলে, "পাষাণে কর্দ্দম নাই",—আমরা বলি, "ফৌজদারী হাকিমে ও পুলিসে দয়া নাই।" বাড়ীতে খুনের মোকদ্দমা উঠিলে, একদিকে শোকের উচ্ছ্বাস, অন্যদিকে পুলিসের অত্যাচার। নব ডেপুটী বাবু মোকদ্দমার নূতন তদারক করিবেন, পূজার পূর্ব্বেই মোকদ্দমা শেষ করিয়া সেসনে অর্পণ করিবেন, এই কথা প্রচার করিলেন। তিনি আদেশ করিলেন যে, পুণ্যপ্রভাকে তাঁহার সঙ্গে দেওয়া হউক, তিনি চরনগর পর্য্যন্ত যাইয়া তদারক করিবেন, আরো বলিলেন যে, মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে গবর্ণমেণ্টের হাতে থাকিতে হইবে, কেন না, স্ত্রীলোকের মন পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। তারানাথ পৃথক নৌকা করিয়া পুণ্যপ্রভাকে লইয়া যাত্রা করিতে চাহিলেন। কিন্তু ডেপুটী বাবু বলিলেন, "আমিও বাঙ্গালী, আমিও পরিবার

লয়ে ঘর করি, আমি দস্যু নহি, রাক্ষস নহি, ভয় কি, আমি গবর্ণমেণ্টের তরফের লোক, যাহাতে মোকদ্দমার ভাল তদ্বির হয়, তাহা করিব, আমার নৌকায় পুণ্যপ্রভাকে তুলিয়া দিন, কোন ভয় নাই। যদি আবশ্যকতা মনে করেন, পুণ্যপ্রভার পিতাকে বলিলেন, আপনিও আমার বোটে আসুন।”

এই কথার পর তারানাথ আর আপত্তি করিলেন না। মানুষকে অবিশ্বাস করিতে তিনি সঙ্কুচিত, বিশেষতঃ পুণ্যপ্রভার প্রতি তাঁহার বিশ্বাস অসাধারণ। পুণ্যপ্রভাকে ডেপুটী বাবুর বজরায় তুলিয়া দিয়া আপনিও তাহাতে উঠিলেন। নীলকান্ত প্রধান সাক্ষী, তিনিও চলিলেন। এদিকে হরিগোপাল তিন পুত্রসহ গ্রেপ্তার হইয়া মাদারিপুর প্রেরিত হইলেন। ডেপুটীর বজরা কুমারে আনন্দ-তরঙ্গ তুলিয়া চলিল।

তদারকের ছলনায় অতুল রূপের বোঝা বজরায় তুলিয়া ডেপুটী বাবু বিমোহিত হইলেন। পুণ্যপ্রভার শরীর সুস্থ হইয়াছে, পূর্ব্বের রূপ আবার বদনকে প্রভাময় করিয়াছে। গৈরিক প্রস্তরে যেন গিরি-একের স্বর্ণখনি আবৃত রহিয়াছে, আকাশের চাঁদ যেন শ্বেতমেঘে ঢাকিয়াছে, পুণ্যপ্রভার রূপ এমনি। পৃথিবীর অলঙ্কার পোষাক পরিচ্ছদ কি সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারে? অথবা নীলাম্বরী বা গৈরিক বস্ত্রে কি রূপ ঢাকিতে পারে? দুই-ই অসম্ভব। সুন্দর যাহা, তাহা আপনি সুন্দর। প্রকৃত সৌন্দর্য্যের নিকট কৃত্রিম সৌন্দর্য্য তুচ্ছ। প্রকৃত সৌন্দর্য্য আবরণ করিতে পারে, এমন কোন জিনিস পৃথিবীতে নাই। এই অতুল সৌন্দর্য্যের ভরা নৌকায় তুলিয়া ডেপুটী বাবু কেবল বিমোহিত নয়, আত্মহারা হইলেন। চাঞ্চল্যে আরো চাঞ্চল্যের তুফান উঠিল। সরসীর বায়ু-তাড়িত মৃদু তরঙ্গে যেন একখণ্ড প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। যৌবনের তাড়না তাড়িত হৃদয়-তুফানে আজ সৌন্দর্য্য-শিলা প্রক্ষিপ্ত হইয়া বিষম তরঙ্গ তুলিয়াছে। পুণ্য পবিত্রতা ঐ হৃদয়ে কোন দিনও ছিল না, আজ লোকলজ্জা ও সামাজিক ধর্ম্মশাসনও ভাসিয়া যায়! ডেপুটী বাবু কেমন হইয়াছেন, পাঠক বুঝুন।

দুই জনের দাসত্ব করা বড় কঠিন। গবর্ণমেণ্টের দাসত্ব করিতে যাইয়া যদি মানুষ রিপুর দাসত্ব না ভুলিতে পারে, তবে বিষম বিপদের কথা। গবর্ণমেণ্ট দিয়াছেন ক্ষমতা, রিপু দিয়াছেন উন্মত্ততা। ক্ষমতা ও উন্মত্ততা যখন একত্রিত, তখন মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকিবে, আশা করা বিড়ম্বনা। অনেক স্থলেই তাহা থাকে না। ক্ষমতার মাদকতায় পাগল সংসারের বারো আনা লোক। তার পর যদি রিপুর উন্মাদিনী শক্তি জাগ্রত হয়, পাগল তখন

মহাপাগল। সংযম তখন মিথ্যা—উন্মত্ত মানুষ তখন সকল উড়াইয়া দিয়া নব নাগর, রসের সাগর, কামের পাগল। মানুষের এই অবস্থা পাঠক দেখিতে চাও যদি, তবে কুমারের বক্ষে ভাসমান ডেপুটীর বজরার পানে একবার তাকাও। সতীত্বনাশের অপূর্ব্ব কৌশল!

পুণ্যপ্রভাকে বজরায় তুলিয়া ডেপুটী বাবু যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না। ভাবিতেছেন, "গবর্ণমেণ্টের চাকুরীতে এত সুখ! আমার বিরুদ্ধে একটী কথা বলে, এমন লোক নাই। আমি যা করিতে চাই, তাহাই পারি। অসীম ক্ষমতা হাতে, আজ সোণার চাঁদ হাতে পাইয়াছি, বাসনা মিটাইবার অপূর্ব্ব কৌশল! বুঝি বা বিধি এতদিন পর আমাদের কষ্ট বুঝিয়া সখী-বৃন্দের শূন্য হৃদয়-সিংহাসনে শ্রীরাধিকাকে প্রেরণ করিলেন! কিন্তু ভদ্রঘরের মেয়ের মতি ফিরিবে কি? প্রলোভনে জগতে কি না হয়, সামান্য লোকের সামান্য মেয়ে, তার ত কথাই নাই, রাজকুমারীকেও পথে বাহির করা যায়। আমার ক্ষমতা অনেক, শক্তি প্রভূত, প্রতিভা অসাধারণ, আমি এই সামান্য কাজটা পারিব না? যদি না পারি, কুমারে ডুবিয়া মরাই ভাল।" এইরূপ ভাবিয়া পুণ্যপ্রভাকে খাস কামরায় এজাহার লইবার ছলনায় ডাকিলেন। পুণ্যপ্রভা নির্দ্দয় ডেপুটী বাবুর এজলাসের ধারে নীচে বসিলেন। ডেপুটী বাবু আর আর সকলকে নিকটে আসিতে নিষেধ করিলেন। জবানবন্দি লওয়ার সময় কাহারও নিকটে থাকার নাকি আইন নাই! ইহা হাকিমদের বিশেষ সুবিধা। আইন থাকিলেই বা সে আইন আজ মানে কে? এ যেন স্বেচ্ছা-মহলের স্বেচ্ছা-বিচার। পুণ্যপ্রভা নীচে বসিলেন দেখিয়া ডেপুটী বাবু বড় ব্যস্ত হইলেন, বলিলেন—"তুমি উঠে সম্মুখের চেয়ারে ব'স।"

পুণ্যপ্রভা।—আমার চেয়ারে বসার অভ্যাস নাই, আমি গরিবের মেয়ে, এই বেশ আছি। আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, করুন।

ডেপুটী বাবু।—আমার জিজ্ঞাস্য এই—এই বিবাহে তোমার মত নাই কেন? কালীকান্ত একজন ধনীলোক, আমি শুনেছি, তিনি তোমার জন্য পাগল। এই অতুল সম্পত্তি কার মায়ায় তুচ্ছ করিতেছ?

পুণ্যপ্রভা।—জগদম্বার মায়ায়, আর কাহারও মায়ায় নহে।

ডেপুটী বাবু।—ও সকল বুজরুকির কথা রেখে দেও, আমরা সকলই বুঝি, তুমি কার প্রণয়ে আসক্ত, বল, আমি তাহা মিলাইয়া দিব।

পুণ্যপ্রভা।—বিশ্বাস করুন, আমি কাহারও মায়ায় এ সকল তুচ্ছ করি নাই। ধর্ম্মের জন্যই ধর্ম্ম পালন করেতেছি।

ডেপুটী বাবু।—ভেবে দেখ, তোমার স্বামীর জেল হলে তোমার দুর্দ্দশার একশেষ হবে। হিন্দুসমাজে তোমাকে আর কেহ বিয়ে করবে না। শেষে বাজারে ঘর বাঁধ্‌তে হবে। সব ভেবে দেখ।

পুণ্যপ্রভা।—পরে কি হবে ভেবে কত লোক চল্‌তে পারে? এখন যাহা কর্ত্তব্য বুঝিব তাহাই কর্‌ব, পরের কথা পরে।

এই কথায় ডেপুটী বাবু এক বিন্দু আশার বাণী যেন শুনিলেন, বলিলেন, তবে তাহাই কর; কিন্তু এ বেশ কেন? তোমার এখন যৌবন, এখন এ বেশ পরিত্যাগ কর, আমি এ বিবাহ ভেঙ্গে দিব এবং যাহাতে তোমার সংগতি হয়, তাহা কর্‌ব।

পুণ্যপ্রভা।—দীপ্তির শোক যতদিন ভুল্‌তে পার্‌ব না, ততদিন এ বেশ কিছুতেই ছাড়্‌ব না।

ডেপুটী বাবু।—কি হলে দীপ্তির কথা ভুল্‌তে পার্‌বে? যে গিয়াছে, তার জন্য আর শোক কি? নিজের ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া চলাই ত মনুষ্যত্ব।

পুণ্যপ্রভা।—শোক কাহাকে বলে, জানি না। দীপ্তি আমার হৃদয় মন সব গ্রাস করে রয়েছে, তাকে যে দিন ভুল্‌তে পার্‌ব, সে দিন আমি পৃথিবীতে থাক্‌ব না। ভবিষ্যৎ আমার বড়ই আঁধার, আমি বুঝি, বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য লইয়াই মানুষ। আজকার কর্ত্তব্য আজ করি, কল্যকার চিন্তা আমার নাই। গরিবের মেয়ে, দৈনিক কাজ লইয়াই ব্যস্ত, ভবিষ্যৎ আর কি? সত্য কেবল, বর্ত্তমান।

ডেপুটী বাবু।—গরিবের মেয়েও রাজরাণী হয়, তা কি জান না?

পুণ্যপ্রভা।—রাজরাণী হওয়া যাহার কাজ, সে হতে পারে, গরিবের সেবা করাই আমার কাজ। প্রতি দিনের কর্ত্তব্য যদি করিতে পারি, তবেই বাঁচি। আপনি এ সকল কথা ছেড়ে, এখন মোকদ্দমার কথা জিজ্ঞাসা করুন।

ডেপুটী বাবু।—এ সকলও মোকদ্দমার কথা। তোমার ভবিষ্যৎ ঠিক না হলে কি করিব, কি করা উচিত, বুঝ্‌তে পারি না। তুমি রাজরাণী হবে, না ভিখারিণী থাক্‌বে?

পুণ্যপ্রভা।—মা জগদম্বা যা করেন, তাই হব।

ডেপুটী বাবু।—মা জগদম্বার ইচ্ছা, আমাদের সহিত মিলে কুমারে জলকেলি করিবে। তুমি আমার পাটরাণী হবে, ইহাই মায়ের ইচ্ছা।

পুণ্যপ্রভা বিরক্তি সহ বলিলেন, আপনার মুখে এই সব কথা? আপনি না এক জন হাকিম?

ডেপুটী বাবু।—হাকিম ত বটেই। হাকিমই ত তোমার উপযুক্ত।

পুণ্যপ্রভা।—আমার উপযুক্ত কি না, তাহা বলি না, হাকিমের কি এই কাজ?

ডেপুটী বাবু।—হাকিম ত আর দেবতা নয়—মানুষই ত; মানুষের যাহা কাজ, হাকিমেরও তাহাই কাজ।

পুণ্যপ্রভা।—আপনি একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি না?

ডেপুটী বাবু।—সুশিক্ষার আর কাজ কি? সুপ্রণালীতে, সুন্দরভাবে রিপুর পরিচর্য্যা করাই সুশিক্ষার কাজ। আমি সুশিক্ষিত বলেই ত তোমার উপযুক্ত।

পুণ্যপ্রভা।—আপনি না একজন সুকবি ও সুলেখক?

ডেপুটী বাবু।—সুকবির যেমন সৌন্দর্য্যানুভূতি, এমন আর কাহার? আমি তোমার সৌন্দর্য্যকে কবিতার হারে গাঁথিয়া এদেশে অক্ষয় করিব। আমি যেমন তোমার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিব, এমন লোক কি আর আছে?

পুণ্যপ্রভা।—সুকবির এইরূপ জঘন্য কাজ, তা আমি জানিতাম না। লেখকের নামে কলঙ্ক দিবেন না।

ডেপুটী বাবু।—তুমি পাড়া গেয়ে মেয়ে, তুমি জানিবে কি? অল্প দিনের মধ্যেই আমি তোমার গুণাবলী সম্বলিত একখানি পুস্তক প্রকাশ করিব।

পুণ্যপ্রভা।—আমিও আপনার গুণের কথা শীঘ্রই খবরের কাগজে লিখিব।

ডেপুটী বাবু।—আমার কথা লিখিলে কোন্ সংবাদ পত্র তাহা ছাপাইবে? টাকায় সব বশ হয়, জান না কি? এই মোকদ্দমায় তোমার পরিণাম ভাবিতেছ না?

পুণ্যপ্রভা।—ভাবিতেছি, আপনার ন্যায় বিচারকের হাতে আমার সর্ব্বনাশ নিশ্চিত। আপনার ন্যায় রিপু-দাসের হাতে অধিক আশা নাই।

ডেপুটী বাবু।—আমি তোমাকে বিবি সাজাইয়া নাচাইব, রিপুর স্রোতে ভাসাইব, তবে ছাড়িব। জানিও, আমি একজন অসাধারণ লোক।

পুণ্যপ্রভার আর চাঞ্চল্য নাই, মুখ গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছে, বলিলেন,

আপনার ন্যায় শত শত লোকেরও সে শক্তি সহায়, ততদিন কাহাকেও আমার ভয় নাই।

ডেপুটী বাবু।—আমাকেও ভয় নাই ?

পুণ্যপ্রভা।—আপনি ত রিপুর দাস, কাপুরুষ, নগণ্য ব্যক্তি, আপনাকে আবার ভয় কিসের ?

ডেপুটী বাবু।—তুমি অসহায় অবস্থায় আমার বজরায় আছ, জান না কি ?

পুণ্যপ্রভা।—আমি অসহায় অবস্থায় নাই, আমার ধর্ম্ম আমার সঙ্গে, আমার মা জগদম্বা আমার সঙ্গে। আপনি মানুষ, মানুষকে ভয় করিব ?

ডেপুটী বাবু।—তুমি কি করিতে পার ?

পুণ্যপ্রভা।—আর কিছু না করিতে পারি, কুমারে ডুবিয়া মরিতে ত পারি ! আপনার নৌকায় নরহত্যা হইলে কলঙ্কে আপনার নাম ডুবিবে।

ডেপুটী বাবু।—ডুবুক, ক্ষতি নাই। আমি তোমাকে পাইলে স্বর্গ ছাড়িতে পারি।

পুণ্যপ্রভা।—আপনি যদি সংযত হইয়া না চলেন, এখনই আমি বজরা পরিত্যাগ করিব।

ডেপুটী বাবু।—কোথায় যাইবে সুন্দরি ?

পুণ্যপ্রভা।—যেখানে ইচ্ছা যাইব। আমার বাবা এই বজরায় আছেন, জানেন না কি ? আমার পিতাকে ভয় না করে, এমন লোক এ দেশে নাই ; এখনই তাঁহাকে ডাকিব।

ডেপুটী বাবু এই কথার পর একটু ধৈর্য্য ধরা আবশ্যক মনে করিলেন। ধীরে ধীরে কার্য্যোদ্ধার করিবেন, এই আশায় বুক বাঁধিলেন। ইহার পর যথারীতি জবানবন্দি লইয়া অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কর্ম্মযোগী।

দীপ্তির শেষ দৃশ্য দেখিতে না পারিয়া প্রেমাঙ্কুর বাবু বিধিকৃষ্ণপুর পরিত্যাগ করিলেন। আজ হৃদয়ের মধ্যে অগণিত চিন্তার তুফান উঠিয়াছে। কি দেখিলাম, কি দেখিলাম, ভাবিতে ভাবিতে তিনি কুমারে ডিঙ্গি ভাসাইলেন।

তাঁহার মনে স্থির বিশ্বাস ছিল, তিনি বড় শান্তিতে আছেন। কিন্তু সে বিশ্বাস আজ টলিয়াছে,—আজ মনে ধুধু করিয়া কেবল আগুন জলিতেছে ;—কেবল আগুন, কেবল আগুন। দেশের অরাজকতা স্মরণে আগুন জ্বলিতেছে, মানুষের দুর্ব্যবহার স্মরণে আগুন জ্বলিতেছে, দীপ্তির অন্তিম দৃশ্যে আগুন জ্বলিতেছে, পুণ্যপ্রভার মোহকর ভালবাসায় আগুন জ্বলিতেছে। শান্তি-মাখা মনটা দীপ্তির শ্মশানের শেষ উপহার স্বরূপ রাখিয়া তিনি যেন একটা প্রজ্জ্বলিত শ্মশান বুকে করিয়া চলিয়াছেন। মনে ভাবিতেছেন "আমি যদি মানুষ না হইতাম, বুঝি বা ছিল ভাল। এত দুঃখ, এত কষ্ট, এত অত্যাচার, এত নির্য্যাতন যে পৃথিবীতে, সে পৃথিবীতে মানুষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করা বিড়ম্বনা। যদি বিধি মানুষ করিলেন, তবে মানুষের অত্যাচার নির্য্যাতন নিবারণের, কষ্ট দুঃখ অপনয়নের শক্তি দিলেন না কেন ?" প্রেমাঙ্কুর বাবুর চক্ষু হইতে অবিশ্রান্ত ধারায় জল পড়িতেছে। ভাবিতেছেন, "কি করিব, এই ভাঙ্গা মন লইয়া কোথায় যাই ? আমার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত, জীবন ক্ষণস্থায়ী, কেন আমার মনটা অসময়ে ভাঙ্গিল ? দাসত্ব করা পাপ, চিরদিন বিশ্বাস করিয়াছি। গবর্ণমেণ্টের চাকরী করিব না, কোন লোকের চাকরী করিব না, বাল্যকাল হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। কোন দিন রিপুর দাস হইব না, কোন দিন রমণীর দাস হইব না, এ প্রতিজ্ঞাও তার সঙ্গে সঙ্গে করেছি। আমার মন অসময়ে ভাঙ্গিল কেন ? আমি শোকের অধীন, দুঃখ কষ্টের অধীন হইলাম কেন ? কি দেখিলাম, কি দেখিলাম, যেন সব স্বপ্ন, যেন সব প্রহেলিকা, যেন সব কুজ্ঝটিকা, সব যেন অপূর্ব্ব রহস্য ! আমার নাম ইহারা শিখিল কোথায় ? আমার ভাব পাইল কোথায় ? আমার ন্যায় নগণ্য দরিদ্র ব্যক্তিকেও ভালবাসিতে এ জগতে লোক আছে ? কদিন যেন কেবল স্বপ্নই দেখিলাম ! আমার জীবনের মূলমন্ত্র—দয়া, প্রেম, পবিত্রতা। আমি মনে করি, দেশ উদ্ধারের ইহাই বীজ মন্ত্র। এ মন্ত্র ছড়াইতে কোন চেষ্টা করি নাই, কাহাকেও বীজ মন্ত্র বলি নাই, অথচ ইহারা কেমনে এই মন্ত্র জানিল ? সব যেন প্রহেলিকা। ভালবাসার জন্য মানুষ প্রাণ দিতে পারে, ইহা এত দিন কল্পনায় ছিল, এবার তাহার দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিলাম। দীপ্তি যেন প্রহেলিকাময়ী, কুজ্ঝটিকাময়ী এক অপূর্ব্ব দেববালা। পাপতাপপূর্ণ সংসারকে উর্দ্ধে তুলিতে যেন ইহার আগমন। কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি, কি অপূর্ব্ব ভাব, কি অপূর্ব্ব নির্ভর, কি অপূর্ব্ব প্রেম, কি অপূর্ব্ব পবিত্রতা ! দেখিলাম, দেখিলাম, মজিলাম, মজিলাম।

আমার প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গাইতে কি এই দেববালার মর্ত্ত্যে আগমন? আমি এ স্বপ্ন কেন দেখিলাম, আমি এ মোহময় প্রহেলিকায় কেন পড়িলাম! আমি এ রহস্যময় গ্রামে কেন পদার্পণ করিলাম! আমি এখন এই ভাঙ্গা মন লইয়া যাই কোথা? বিধিকৃষ্ণপুরে আমার মন মজিয়াছে, আমি শূন্য দেহে এখন যাই কোথা? ইঁহাদিগের সাহায্য করা কি আমার উচিত নয়? আমার কার্য্যক্ষেত্রে কত লোক হাহাকার করিতেছে, সেখানে যাওয়া কি উচিত নয়? একা আমি কোন্ দিক রক্ষা করি? আমি প্রেমও বুঝিলাম না, পবিত্রতারও আস্বাদন পাইলাম না, আমার ন্যায় হতভাগ্য বুঝি বা এই পৃথিবীতে আর নাই!! আমি এখন করি কি, আমি এখন যাই কোথা?"

আবার ভাবিতে লাগিলেন—"দীপ্তির অন্তিমকালের অনুরোধ স্মরণ করিলে আমার প্রাণ অধীর হয়। আমি কি প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়া সংসারের কূলে ঘর বাঁধিতে পারি? আমার লক্ষ্য অসীম, অনন্ত পারাবার—প্রেমসিন্ধু, দয়ার সাগর, পবিত্রতার জলধি। আমি ক্ষুদ্রত্বে মজিতে পারি না, আমি ছেলেখেলায় ভুলিতে পারি না। মহাজনেরা বলেন, সীমা হইতে প্রেমের আরম্ভ, আমি বলি, অসীমে আরম্ভ, অসীমেই পরিণতি। প্রেমের আদিও অনন্ত, অন্তও অনন্ত। সীমাতে আমি মজিতে বা ডুবিতে পারি না। আকাশে ঘর বাঁধাই আমার প্রকৃতি। অগ্রে ছাদ তুলিয়া পরে ভিত্তি গাঁথাই আমার কাজ। অনন্ত মানব-সমাজের মঙ্গলকামনা যাহার জীবনের রক্তমাংস, সে কেমনে ব্যক্তিবিশেষে প্রাণ বাঁধিবে? আমি বিবাহ মানি না, পরিবার মানি না। আমি মানি—কেবল মানব-সাগর,—অসীম, অনন্ত মানব-কুলের উন্নতি। আমার বীজ মন্ত্র—কেবল প্রেম, দয়া ও পবিত্রতা। কিন্তু আমি এমনই নরাধম, প্রেমও পাইলাম না, দয়াও বুঝিলাম না, পবিত্রতার আস্বাদনও করিলাম না! সাধনার রাজ্যে আমার কেবল শূন্য বিরাজিত,—প্রেম শূন্য, ভক্তি শূন্য, কেবল শূন্য। চরিত্রহীন হইলাম, কিন্তু আমার আশা ত খাটো হইল না! অপ্রেমিক রহিলাম, কিন্তু তবুও মনটা সীমাতে ধায় না কেন? পুণ্যপ্রভা বুঝি বা কেবল কাঁদিবার জন্যই জন্মেছে!! এই হতভাগিনীকে কেহ আদর করে সমাজ-বক্ষে স্থান দিবে কি? হতভাগিনীর চক্ষের জলই বুঝি বা জীবনের সম্বল! আমি আর কি করিব, আমার পক্ষে কিছু করা অসম্ভব। পুণ্যপ্রভার দিকে ফিরে চাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব, তার সেবা করা অসম্ভব, তার উদ্ধার করাও অসম্ভব। অকূলে ঝাঁপ দিয়া আর কূলে ঘর

বাঁধিতে পারি না। কর্ত্তব্য-সাগরে পড়ে হাবুডুবু খাইতেছি বটে, কিন্তু তাই বলে আদর্শ খর্ব্ব করে, আবার সীমায়, আবার কূলে পৌঁছিতে পারি না। সহায় আমার কেহই নাই, সম্বল আমার কিছুই নাই। একাকী নিঃসম্বল অবস্থায় যখন অসীম কর্ত্তব্য-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছি, তখন ভাবিবার ছিল, কিন্তু এখন আর ভাবিবার কি আছে? ডুবি, মরি, ভাসিয়া যাই,—পৃথিবীর ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। নগণ্য যে, তার আর মান অভিমান কি? না পারি, তাহাতেই বা আমার ক্ষতি বৃদ্ধি কি? খাটিব, মঙ্গল কামনা করিব,—ইহাই য[illegible] খাটিয়া খাটিয়া মরিব, আর কিছু না পারি জগতের হিত কামনা [illegible]য়া করিয়া মরিব, ইহাই যথেষ্ট। সুখ ইহাতেই, শান্তি ইহাতেই, আনন্দ ইহাতেই, জীবন ইহাতেই। আমি আর কিছু বুঝি না, আর কিছু জানি না। ধর্ম্ম কর্ম্ম, সাধন ভজন সব আমার কেবল "সেবাতে"। সেবাতেই প্রেম, সেবাতেই দয়া, সেবাতেই পবিত্রতা। সেবাতেই জ্ঞান, সেবাতেই পুণ্য, সেবাতেই ভক্তি। আমি শিখেছি কেবল একটী কথা, "সেবা"; আমি চিনেছি কেবল দুটী বর্ণমালা "সেবা"। খাটিব, খাটিব,—দিবানিশি কেবলই খাটিব। নিষ্কামভাবে খাটিব, ফল প্রত্যাশী না হইয়া খাটিব—না খাটিয়া পারি না বলিয়া খাটিব। খাটার পুরস্কার কেবল খাটুনি। খাটার পুরস্কার যশ নয়, মান নয়, সম্পদ নয়, ঐশ্বর্য্য নয়,—পুরস্কার কেবল খাটুনি। এইরূপ ভাবে খাটিতে পারিব না কি? পুণ্যপ্রভা, হতভাগিনী, কেবল কাঁদিবার জন্যই জন্ম গ্রহণ করেছে!! দীপ্তির অনুরোধ আমার দ্বারা রক্ষিত হইবার সম্ভাবনা নাই।" এইরূপ চিন্তার তরঙ্গ আন্দোলিত হইতে হইতে প্রেমাঙ্কুর আপন কার্য্যক্ষেত্রে গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া অসীম কর্ত্তব্য-সাগরে ঝাঁপ দিয়া দিবানিশি খাটিতে লাগিলেন। কোন আশা নাই, কোন কামনা নাই—দিবানিশি অবিশ্রাম খাটিতে লাগিলেন। সেই দারুণ দুর্ভিক্ষ-সংগ্রামের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে একটী প্রাণী জীবন বলি দিতে প্রস্তুত হইয়া যেন খাটিতে লাগিল। ফল যাহা হইল, তাহা লিখিয়া কাজ কি? অসংখ্য লোক রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু প্রেমাঙ্কুর উপার্জ্জন করিলেন, কেবল নিন্দা, কেবল অপযশ। ভাল কাজ করিয়া আর পুরস্কার কি পাওয়া যায়? এদেশে একমাত্র পুরস্কার অপযশ। অপযশের সোণার মুকুট মাথায় পরিলেন বটে, কিন্তু তবুও তিনি খাটিতে ভুলিলেন না। দিবারাত্রি খাটিতে লাগিলেন। দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসীর সহিত সে ভীষণ সংগ্রাম!

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অবস্থা-বিপর্য্যয়।

তার পরের সকল ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ করিতে আর প্রবৃত্তি নাই, বিশেষতঃ তাহাতে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়ারও সম্ভাবনা। মোটা-মুটি তার পর যাহা যাহা ঘটিল, সংক্ষেপে লিখিতেছি।

পূজার পূর্ব্বে ডেপুটী বাবু মোকদ্দমা আরম্ভ করিলেন,পূজার পরও তিন মাস আপন এজলাসে মোকদ্দমা রাখিলেন। আশা-মরীচিকায় যে মাতে, কিছুতেই তাহার ভ্রান্তি দূর হয় না। পুণ্যপ্রভাকে হাত করিতে ডেপুটী স্বর্গ মর্ত্ত্য কাঁপাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, অত্যাচার পরাস্ত, প্রলোভন পরাস্ত, সব পরাস্ত হইয়াছে, তবুও কিন্তু আশার নিবৃত্তি নাই। যে দিন শেষ হয়, সেই দিনই ডেপুটী বাবু ভাবেন, কল্য মনোরথ পূর্ণ হইবে! এইরূপ আশার ছলনায় দিন যাইতেছে! কিছুতেই তিনি আশা ছাড়িতে পারেন না। সুতরাং মোকদ্দমা হাত হইতে ছাড়েন কেমনে? পূজার পরও ৩ মাস সাক্ষীর জবানবন্দীর ছলনায় মোকদ্দমা চলিয়াছে। উপর হইতে শেষে যখন তিরস্কার আসিল, তখন কিছু তৎপর হইলেন। মোকদ্দমা তিন মাস পর সেসনে অর্পিত হইল। পুণ্যপ্রভা চন্দ্রকলাকে মা বলিয়াছেন, এজন্য তাঁহার অপরাধের কথা কিছুতেই প্রকাশ করিলেন না। তাহার অন্য কোন সাক্ষীও ছিল না, সুতরাং চন্দ্রকলা খালাস পাইলেন। খালাস পাইয়া ভাই মুকুন্দ-রামের সহিত মিলিতা হইলেন। পুণ্যপ্রভা তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথাই বলিলেন না, ইহাতে চন্দ্রকলার মনে এক আশ্চর্য্য ভাব হইল। পৃথিবীতে এরূপ-স্ত্রীলোকও থাকে,চন্দ্রকলার মনে এই চিন্তা। একটু পবিত্রতার আস্বাদন পাইয়া হিংসারাক্ষসী যেন চরনগরে ফিরিল। সেসনে যখন মোকদ্দমা গেল, তখন সোণার প্রতিমা পুণ্যপ্রভাকে পরিত্যাগ করিতে ডেপুটী বাধ্য হইলেন। তিন মাসের মধ্যে পুণ্যপ্রভা ডেপুটীর অন্তঃপুরে পবিত্রতার প্রভূত ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছেন,কিন্তু ডেপুটী আজও আশা-মুগ্ধ। রমণীকে প্রলোভনে মুগ্ধ করিতে পুরুষ-জাতি কত ছলনা, কত আকিঞ্চন, কত অম্ল-মধুর, কত মিঠা-কড়া ব্যবহার করিতে পারে, মানুষ কত নীচে নামিয়া আসিতে পারে, সে সকল জঘন্য চিত্র আঁকিয়া দেখাইতে সাধ নাই; তাহাতে লাভ নাই, তাহাতে পৌরুষও

নাই। পাপে ডুবাইতে পাপীর চেষ্টা ও উদ্যম বর্ণনায় পাপের প্রতি মানুষের ঘৃণা বাড়ে, কি পাপের পথে মতি চলে, এ সম্বন্ধে আমাদের বড়ই সন্দেহ আছে। সকল ঘটনা লিখিতে সে জন্য আমরা কিছু সঙ্কুচিত। ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিয়া, নীচাশয় ডেপুটী অনেকবার পুণ্যপ্রভাকে আক্রমণ করিতে গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পত্নীর বাধায় পরাস্ত হইয়াছেন। পত্নীর প্রতি একারণ তিনি চিরদিনের জন্য চটিয়া গিয়াছেন। দাম্পত্য-জীবনে তাঁহার পত্নী কখনও সুখী ছিলেন না,এবার হইতে বিষ-কুণ্ডে নিমজ্জিতা হইয়াছেন। তিনি [illegible] চক্ষের বিষ হইয়াও পুণ্যপ্রভাকে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহাই [illegible]ত্র সান্ত্বনা। এ জন্য তাঁহাকে,অনেকবার, প্রহার হইতে আরম্ভ করিয়া, [illegible]ত অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে! সে সকল পাপের কাহিনী লিখিতে [illegible] কিছু সঙ্কুচিত; কেবল নমুনা স্বরূপ কিছু কিছু লিখিতেছি। পাঠকগণ অ[illegible]গকে ক্ষমা করিবেন। এই হতভাগ্য বঙ্গদেশ যে আদর্শ সতীর পবিত্রতায় আ[illegible] ধর্ম্মের অক্ষয় ধামে সুরক্ষিত,সেই সতীর প্রতি অত্যাচারের সীমা নাই। যদি এদেশ কখনও ডুবে,রমণী-পীড়নেই ডুবিবে। এদেশের রমণী সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি, তাঁহাকে এই মর্ত্ত্যধামে, সংসারলীলায় যে প্রকার অত্যাচার ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়, তাহা লিখিতে পারে, এমন লোক এদেশে আজও জন্মায় নাই। সতীর রক্ত পান করিয়া দুশ্চরিত্র পুরুষেরা যেন এদেশে উল্লসিত! পুণ্যপ্রভাকে পত্নীসহ এক বিছানায় শোয়াইতে পর্য্যন্ত ডেপুটী চেষ্টা করিয়াছে! অবশ্য এই ঘৃণিত কাজে তিনি পত্নীর দুর্জ্জয় প্রভাবে পরাস্ত হইয়াছেন, [illegible]ন্তু সতীর প্রতি অত্যাচার সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়াছে। ডেপুটীর পত্নীর কে[illegible] কর্ত্তিত হইয়াছে, সর্ব্বাঙ্গে উষ্ণ-লৌহ-শলাকার দাগ দেওয়া হইয়াছে। কখনও বা বস্ত্র কাড়িয়া লইয়া মুখে চূণ কালী মাখিয়া তাঁহাকে রাস্তায় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কখনও অন্নে ছাই মাখাইয়া খাইতে দেওয়া হইয়াছে। ইহার উপরও অত্যাচার আছে কি? আছে। পত্নীকে বেশ্যা দ্বারা অপমানিতা করা হইয়াছে। পত্নীকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া বেশ্যা লইয়া তিনি কত রজনী কাটাইয়াছেন! এ সকল অপমান, অত্যাচারও গৌরবে ডেপুটী-পত্নী সহ্য করিয়াছেন,কেবল পুণ্যপ্রভার স্বর্গীয় প্রভায়! সেই পুণ্যপ্রভা যখন চলিলেন, তখন ডেপুটী-পত্নীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার ভাগ্যে অবশিষ্ট আর রহিল কি? কেবল নির্য্যাতন,কেবল বিষ-দৃষ্টি,কেবল অপমান! তাহাও সহ্য করিবেন, কেবল পতির সন্দর্শন-লালসায়। এই আশায় সতী বুক বাঁধিয়া, পুণ্যপ্রভাকে

বিদায় দিলেন। তিনি রহিলেন বটে, কিন্তু মনটা বুঝিবা পুণ্যপ্রভার সহিতই চলিল। ডেপুটী বাবুর মন যে পুণ্যপ্রভার সহিতই চলিল, সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ কি? মোকদ্দমাটা শেষ হইলেই তাহাকে পাইবেন, এই আশায় তিনি বুক বাঁধিয়াছেন। কালীকান্তের বিবাহ যে অসিদ্ধ, এ সম্বন্ধে তিনি প্রকাণ্ড মন্তব্য লিখিয়া দিয়াছেন। ধারণা এই, বিবাহ অসিদ্ধ হইলেই পুণ্যপ্রভাকে তিনি হাতে পাইবেন। হায় রে আশার কুহক!

ডেপুটী বাবুর পত্নীর জন্ত পুণ্যপ্রভার বড়ই কষ্ট। তাহাকে রক্ষা করিবার জন্ত ডেপুটী বাবুর স্ত্রী না করিয়াছেন, এমন কাজ নাই, না সহিয়াছেন, এমন অত্যাচার নাই। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পুণ্যপ্রভার দারুণ কষ্ট। না জানি ডেপুটীর হাতে তাঁহার আরো কত লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়, এ চিন্তায় মনটা বড়ই অস্থির। ভগ্ন মনে পুণ্যপ্রভা ডেপুটীর বাড়ী পরিত্যাগ করিলেন। মাথায় মাদারিপুরের কলঙ্কের বোঝা, হৃদয়ে গুরু চিন্তা লইয়া পুণ্যপ্রভা চলিলেন।

পৃথিবীতে যাহার আর কোথাও স্থান নাই, পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে যে ঘৃণিত, পিতা মাতার নিকট তাহারও স্থান আছে, পিতা মাতার নিকট সেও আদৃত। তারানাথ সানন্দে কলঙ্কের বোঝা কোলে করিয়া ঘরে চলিলেন। বিশেষত তিনি জানেন, তাঁহার মেয়ে কি? বিধিকৃষ্ণপুরের কেইবা তাহা না জানে! মাদারিপুরে পুণ্যপ্রভার কলঙ্কের বোঝা যেন মাদারিপুরেই রহিয়াছে। পবিত্র পুণ্যপ্রভাই বিধিকৃষ্ণপুরে আসিলেন।

তারপর ক্রমে সেসনের মোকদ্দমাও শেষ হইল। টাকার যে কত শ্রাদ্ধ হইল, কি আর লিখিব? উকীল, মোক্তার, ব্যারিষ্টারগণ যেন ষ্টেট লুটিয়া লইল। এই মোকদ্দমায় দুই ষ্টেট ডুবিল, কিন্তু ফল কি হইল? বিচারে কালীকান্তের ৭ বৎসর, হরিগোপালের ৩ বৎসর এবং ৩ পুত্রের এক এক বৎসর করিয়া জেল হইল; এবং কালীকান্তের বিবাহ আইনে অসিদ্ধ হইল। মড়া পাইলে শকুনেরা অল্প সময়ে যেরূপ তাহা নিঃশেষ করে, উকীল, মোক্তার ও ব্যারিষ্টারেরা দুই ষ্টেট সেইরূপ নিঃশেষ করিল। ধার কর্জ্জে দুই ঘর ডুবিল। যেমন উত্থান, কালীকান্তের তেমনই পতন!

এ মোকদ্দমার পর পুণ্যপ্রভাকে হাত করিবার জন্ত ডেপুটী আবার মাতিয়া উঠিলেন; জ্ঞান, শিক্ষা ডুবাইয়া পশুর সিংহাসন অধিকার করিলেন। এবার মুকুন্দরামের সহিত তিনি সন্ধি করিলেন। মুকুন্দরাম উপযুক্ত ডেপুটীর

সাহায্যে প্রতিশোধ তুলিবেন, মনে মনে স্থির করিলেন। পরস্পর ক্রমে গাঢ় প্রণয়ে আবদ্ধ হইলেন। উভয়ে যেন হরিহর-আত্মা।

সেসনের বিচারের পর হাইকোর্টে আপিল হইল। মোকদ্দমার পর চরনগর ও বিধিকৃষ্ণপুর—উভয় গ্রামেরই বাহ্য আকৃতি ফিরিয়াছে। প্রবল ঝড়ের পর কদলি-বাগানের যে অবস্থা হয়, সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে রাজত্ব করিতেছে কেবল উদাসীনতা ও বিশৃঙ্খলতা। মুকুন্দরাম কালীকান্তের কীর্ত্তি বজায় রাখিতে বাহিরে-চেষ্টা করিতেছেন,কিন্তু ভিতরে ভিতরে ষ্টেট লুটিয়া লওয়াই প্রধান কাজ। চক্রবর্ত্তী হরিগোপালের বিশৃঙ্খল সংসারে শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে বিধিপূর্ব্বক চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হইতেছেন। চতুর্দ্দিকে রাজত্ব করিতেছে—উদাস ভাব ও বিশৃঙ্খলতা। ধারে কর্জ্জে অল্প সময়ের মধ্যেই দুই ষ্টেট ডুবিল।

বিশৃঙ্খলার আরো কারণ আছে। চন্দ্রকলার মনের উপর মুকুন্দরাম আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিতেছেন না। তিনি কেবল লুটপাট করিতেছেন, ইহা তাহার এককারণ; দ্বিতীয় এবং প্রধান কারণ, চন্দ্রকলার চরিত্র দোষ। এদিকে শান্তিশীলার মনের উপরও চক্রবর্ত্তী কর্তৃত্ব খাটাইতে পারিতেছেন না। শান্তিশীলা প্রসন্নময়ীর হাতের জিনিস, প্রাণটা উদার,হৃদয়টা প্রশস্ত, মনটা অনেক বড়। চক্রবর্ত্তী হিতৈষী বটেন, কিন্তু সঙ্কীর্ণতা নামক পদার্থটা ডুবাইতে পারেন নাই, চক্রবর্ত্তী প্রেমিক বটেন,কিন্তু ভেদ-বোধের অঙ্কুর এখনও হৃদয়ে আছে। সাধারণের দিকে তাঁহার মনের গতি, কিন্তু বড় লোকদিগকে ঘৃণা করেন। প্রসন্নময়ী বড় ছোট বুঝেন না, তাঁহার সকলের প্রতি সমভাব। সুতরাং শান্তিশীলাও ভেদ মানেন না। দুই গ্রামেই অশান্তির আগুন অল্পে অল্প জ্বলিতেছে।

শান্তিশীলা বলেন, কর্ত্তার উইলানুসারে দীপ্তির শ্মশানে একটী পুণ্যমঠ নির্ম্মিত হউক, তাহার এক পার্শ্বে টোল ও অতিথিশালা এবং অন্য ধারে মহামায়ার মন্দির ও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হউক, এক কথায় তাঁহার ইচ্ছা স্বামীর উইলানুসারে এখনই কাজ হউক। এই সকল কাজের ভার নীলকান্ত গাঙ্গুলীর উপর তিনি দিতে চাহেন। চক্রবর্ত্তী বলেন,এখন এ সকল করিয়া কোনই কাজ নাই,মোকদ্দমার শেষ নিষ্পত্তি হউক, কর্ত্তা খালাস হইয়া আসিলে তারপর যাহা হয়, করা যাইবে। নীলকান্তকে সংসারে প্রবেশ করাইতে তাঁহার মোটেই ইচ্ছা নাই। সুতরাং অশান্তি অনিবার্য্য।

চরনগরে ভ্রাতা ভগিনীতে বিষম বিবাদ। চন্দ্রকলা যে ডাক্তারের প্রণয়ে আবদ্ধ, ভ্রাতা মুকুন্দরাম ক্ষমতা পাইয়াই তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন। চন্দ্রকলা ইহাতে ভ্রাতার উপর বড়ই বিরক্ত হইয়াছেন। মানুষ পৃথিবীর ধন ঐশ্বর্য্য, বিষয় বিভব সমস্ত রিপুর চরণে উৎসর্গ করিতে পারে; রিপুর সেবায় মত্ত হইলে আর কোন জ্ঞান থাকে না;—তোমার রাজ্য রহিল বা গেল, সে বিচার থাকে না। চন্দ্রকলার ইচ্ছা ছিল, প্রাণ ভরিয়া সুখের সরসীতে কেলি করিবেন, কিন্তু ভাই তাহা দিলেন না। ডাক্তার চরনগর পরিত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু চন্দ্রকলার মন লইয়া চলিলেন। যে গুপ্তপথ বাড়ীর মধ্যে ছিল, তাহা বহুদূর বিস্তৃত হইল। ঐশ্বর্য্য সম্পদ সকল ভুলিয়া চন্দ্রকলা ডাক্তারের জন্য পাগলিনী। চন্দ্রকলা পুণ্যপ্রভার প্রতি জঘন্য ব্যবহার করিলেও পুণ্যপ্রভা তাহার প্রতিশোধ লয় নাই, ইহাতে পুণ্যপ্রভার প্রতি চন্দ্রকলার ধারণা বড় উচ্চ হইয়াছে। পুণ্যপ্রভা বা তাহার পিতৃকুলের প্রতি আর অত্যাচার হয়, তিনি ইচ্ছা করেন না। মুকুন্দরাম শুনিবেন কেন? তিনি মোকদ্দমার প্রতিশোধ তুলিবেন, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। প্রতিশোধ তুলিবার জন্য নানা জঘন্য উপায় অবলম্বন করিতেছেন ও বিষম শত্রু ডেপুটীর সহিত মিলিয়াছেন। এ সকলই চন্দ্রকলার অসহ্য।

দুই বড় গ্রামের দুই বড় বাড়ীর এইরূপ অবস্থা। বেণীমাধব ও তারানাথ, বেণীমাধবের স্ত্রী ও প্রসন্নময়ী—দীপ্তির শোকে কাতর। তদুপরি মোকদ্দমার ঝঞ্ঝাটে তাঁহারা অস্থির ছিলেন। সরলাদের ঘরে দারুণ শোক। তিলোত্তমা ও লীলা আর কাহারও সহিত কথা বলে না, তাহাদের জীবনের সকল সুখ যেন দীপ্তি-সরলার চিতায় ভস্ম হইয়াছে। কোন বিলাস-বাসনা ইহাদের আর নাই। কঠোর বৈরাগ্যের কঠোর ব্রত পালনে ইহারা সংসারের সকল ভুলিতেছেন; মুখের হাসি নিবিয়াছে, নয়নের প্রফুল্লতা নিবিয়াছে, বদনের কমনীয়তা নিবিয়াছে, পৃথিবীটা যেন ঘোর আঁধারে ঘেরিয়াছে। ইহাদের নিকট যেন চন্দ্র সূর্য্য চির নির্ব্বাণ,—মহা আঁধার যেন পৃথিবী গ্রাস করিয়াছে। বিষের সাগর উথলিত হইয়া সমস্ত সংসারটা যেন গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। ঘোরতর উদাসীনতা ইহাদের জীবন-সুখ, যৌবন-সৌন্দর্য্যকে প্রভাহীন করিয়াছে। এই অবস্থায় পুণ্যপ্রভা বিধিকৃষ্ণপুর আসিয়াছেন। বিধিকৃষ্ণপুরের অবস্থা দেখিলে পাষাণও বিগলিত হয়। চরনগরের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে মানব-অহঙ্কারকে শত ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়। ঘোরতর অবস্থা-বিপর্য্যয়।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কর্ত্তব্যের কঠোর নির্দ্দেশ।

দুই বৎসরের অজন্মার পর এবার মাঠে সোণা ফলিয়াছে। "দানা এবং তেনার" হাহাকারধ্বনি মন্দীভূত হইতেছে, নরকঙ্কাল রাশির মুখেও হাসি ফুটিতেছে। দুঃখের অবসান হইয়াছে। দারুণ খাটুনির পর হিতৈষীদল তল্পি বাঁধিয়া, দুর্ভিক্ষের আফিস তুলিয়া, আনন্দিত মনে স্ব স্ব স্থানে যাইতেছেন। তারানাথ, প্রসন্নময়ী এবং শান্তিশীলার দারুণ দুঃখেও অপার আনন্দ। মাতৃকোলে শিশু হাসিতেছে, সতীর পার্শ্বে স্বামী হাসিতেছে, ভ্রাতার ধারে ভগ্নী হাসিতেছেন, চতুর্দ্দিকে আনন্দ-ঊষা আজ মধুর কিরণ বিকীর্ণ করিতেছেন। স্ত্রী পুত্রের নয়নধারা, নগ্নাবস্থা যাহারা দেখিতে না পারিয়া দেশত্যাগ করিয়াছিল, তাহারা দলে দলে দেশে ফিরিয়া আসিতেছে। যেন শরৎকালের সারদার আগমনে দেশ মহানন্দে পূর্ণ হইয়াছে। সম্মিলনের অপূর্ব্ব দৃশ্য, দুই বৎসরের দুঃখের কাহিনীর সহিত মিলিয়াছে সুখ-স্বপ্ন, শুষ্ক নয়নে পড়িতেছে আজ আনন্দের ধারা! শীতান্তে যেন বসন্তের আগমন হইয়াছে,—শুষ্ক শাখায় নবপল্লবের অঙ্কুর উঠিতেছে। যৌবন যে সকল যুবক যুবতীর অঙ্গ তুচ্ছ করিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আজ সুসময়ে সেও আসিয়া আবার সৌন্দর্য্য-তুলি দ্বারা রূপ ফুটাইতেছে। নগ্ন স্ত্রীদেহে বস্ত্র উঠিয়াছে, শুষ্ক মলিন বদন-প্রান্তে আজ স্ফূর্ত্তি খেলিতেছে। নিমগ্ন রূপ, শোভা, কমনীয়তা আজ অপূর্ব্ব প্রভায় উদ্ভাসিত। দুঃখ অন্তে আজ ফরিদপুরের গ্রামে গ্রামে সুখ-সূর্য্য নব প্রভায় প্রদীপ্ত। প্রকৃতি আজ মধুর হইতেও মধুর।

প্রেমাঙ্কুর কার্য্যক্ষেত্র পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে একবার বিধিকৃষ্ণপুর হইয়া যাইবেন কিনা, ভাবিতেছেন। একবার শেষ দেখা দেখিয়া যাইতে ইচ্ছা, কিন্তু দেখিবেন কি? শুনিয়াছেন, বিধিকৃষ্ণপুরের শোভা সৌন্দর্য্য, আনন্দ উল্লাস আর কিছুই নাই, দীপ্তির সহিত সকল গিয়াছে। দীপ্তি তাহাকে কিরূপ ভালবাসিতেন, তাহাও পুণ্যপ্রভার একখানি পত্রে পাঠ করিয়াছেন। সে দেব-দুর্লভ ভালবাসার তুলনায় তাহার জীবন তুচ্ছ। মনে ভাবিতেছেন, এখন নিষ্কাম ভালবাসা যদি পাইতাম, জীবন ধন্য হইত! দীপ্তিকে একবার বুকে করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছে। সেই মলিনা, সেই বিষাদ-

মাখা অপরূপ রূপমাধুরী দীপ্তি যেন প্রেমাঙ্কুরের হৃদয় মন গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। দীপ্তির শ্মশানের ভস্মে একবার গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু লোকে কি বলিবে? দয়া, প্রেম ও পবিত্রতার মূর্ত্তি যদি আজ ধূলায় গড়াগড়ি যায়, তবে লোকে কি বলিবে? ভাবিতেছেন,"লোকের কথা শুনিয়া কি হৃদ্‌পিণ্ড ছিন্ন করিব?" এমন জীবন্ত প্রেমের আভাস তিনি জীবনে আর কখনও পান নাই। নীরস পৃথিবীটা যেন সরস হইয়াছে। একাকিনী দীপ্তি যেন আজ তাহার বিশাল-বিস্তৃত হৃদয়টাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। পুণ্যপ্রভার যে পত্রে প্রেমাঙ্কুর দীপ্তির হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছেন, তাহা এই ;—

"দেব, আমার শরীর এখন সম্পূর্ণ সুস্থ, কিন্তু মনে শান্তি নাই। আমি দারুণ পরীক্ষার মধ্য দিয়া চলিয়াছি; আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন, জগদম্বার কৃপায়, সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইতে পারি।

দীপ্তির শেষ অনুরোধ আপনি জানেন। কিন্তু আপনি জানেন না, দপ্তি আপনাকে কিরূপ ভালবাসিত। অনন্ত আকাশের অনন্ত নক্ষত্রপুঞ্জকে সাক্ষী করিয়া দীপ্তিকে আমি আপনার সহিত বিবাহ দিয়াছিলাম। তাহা বাল্য-খেলা নহে, সত্যই দীপ্তি আপনাকে স্বামীর ন্যায় ভালবাসিত। আপনার সংস্পর্শে আসিয়া সে আপনাকে আরো ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু তুলনায় আপনার অযোগ্যা বলিয়া তাহার মনে ধারণা হইয়াছিল। আপনার আদর্শ বুকে করিয়া দীপ্তি ইহ-সংসার পরিত্যাগ করিয়াছে। দীপ্তি আদর্শ সতী।

দীপ্তি বাঁচিয়া থাকিতে২ এই সকল কথা আপনাকে বলিতে চাহিয়াছিলাম, দীপ্তির নিষেধে তাহা পারি নাই। দীপ্তি এখন স্বর্গে,—কিন্তু তাহার জীবনের আদর্শ-ছায়াটা আজও পড়িয়া রহিয়াছে। বর্ষা চলিয়া গিয়াছে, নদীর রেখাটা মাত্র আছে। কোথায় সে রেখা, আপনি অবশ্যই জানেন। দীপ্তির অনুরোধ রাখিয়া সেই রেখা অনুসরণ করিতে বলিতে আমি নিতান্তই অক্ষমা।

দীপ্তির সকল কথা যেন প্রহেলিকা, সে যেন একটা অস্ফুট স্বপ্ন, কেমনেই বা আপনাকে চিনিল, কেমনেই বা আপনার কথা জানিল, কেমনেই বা মনপ্রাণ সমর্পণ করিল, আমি ভাবি আর অবাক্ হই। তিলোত্তমা ও লীলা, দীপ্তির স্বর্গারোহণের পর, মৌনব্রত লইয়াছে। আমরা বৈরাগ্যব্রত লইয়াছি, মোকদ্দমার জন্য মৌনব্রত লইতে পারি নাই। দীপ্তি আমাদের হৃদয় প্রাণ সব লইয়া গিয়াছে। পড়িয়া রহিয়াছে কেবল ছায়া-রেখা। সূর্য্য

ডুবিয়াছে, কেবল শেষ রশ্মিটা এই হৃদয়-আকাশকে উজ্জ্বল করিতেছে। ফুল শুকাইয়াছে, শেষ সৌরভ এখনও বিধিকৃষ্ণপুরে পড়িয়া রহিয়াছে।

দুর্ভিক্ষ শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমাদের মোকদ্দমাও শেষ হইয়াছে। মোকদ্দমার ফল আপনি অবশ্যই জানেন। এই কমাস মাদারিপুরের ডেপুটীর হাতে আমি যে অত্যাচার সহ্য করিয়াছি,জীবনে তাহা ভুলিব না। সাক্ষাতে সে সকল কথা বলিব। দারুণ ঝটিকার পর গাঢ় বিষাদের নিস্তব্ধতা বিধিকৃষ্ণপুরকে আক্রমণ করিয়াছে। আপনি হয় ত শীঘ্রই কার্য্যক্ষেত্র পরিত্যাগ করিবেন। যাইবার পূর্ব্বে দীপ্তির শ্মশানটা একবার দেখিয়া যাইবেন কি ? শ্মশানে দেখিবার কি আছে ? জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। শ্মশান আমরা ঘিরিয়া রাখিয়াছি, মধ্যে দীপ্তি-সরলার ভস্মরাশি সুরক্ষিত, চতুর্দ্দিকে মৃত্তিকার দেউল, প্রত্যহ তাহা লেপিত হয়। প্রত্যহ তাহাতে পুষ্প প্রক্ষিপ্ত হয়। প্রত্যহ সেখানে নীরব পূজা অর্চ্চনা হয়। তিলোত্তমা ও লীলা, সেখানে আমার মাতার দক্ষিণ ও বামে বসিয়া মহা ধ্যানে নিযুক্তা। সকলের মস্তকের চুল কর্ত্তিত, সকলের অঙ্গে গৈরিক, এক অপূর্ব্ব দর্শন। লীলা ও তিলোত্তমা যৌবনে যোগিনী সাজিয়াছে। আর আমি ? আমি অদৃষ্ট-বিড়ম্বনায় এই কয় মাস কেবল কঠোর পরীক্ষার ভিতর দিয়া আসিয়াছি। আমিও গৈরিক ধারণ করিয়াছি বটে, কিন্তু বাসনা, কামনা আজও বলি দিতে পারি নাই। আজও দীপ্তির ন্যায় নিশ্চিন্তা, নির্লিপ্তা, নির্ভরশীলা হইতে পারি নাই। মাথার উপর দিয়া প্রবল ঝড় দিবানিশি বহিয়া যাইতেছে। ডেপুটীর অত্যাচার, মুকুন্দরামের অত্যাচার—চতুর্দ্দিকের রাশি রাশি অত্যাচার-বাণ তীব্রভাবে আমার উপর নিক্ষিপ্ত হইতেছে। আমি অসহায়া, আমি অবলা, আমি দুর্ব্বলা,—প্রবল অত্যাচার বাণে ক্ষতবিক্ষত হইতেছি। আপনি দূরে থাকিয়াও সকলই জানিতেছেন। এ দেশের কোন ঘটনাই আপনার অজ্ঞাত থাকে না। আপনি যেন নিরেট পাষাণ। আপনি যেন অভিমন্যু-বধের পর সুভদ্রার গৃহে শ্রীকৃষ্ণ—ধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি, নিশ্চিন্ত, নিঃশব্দ, নীরব, নির্ব্বাক্, নিশ্চেষ্ট। আপনি কেন যে এত নিশ্চিন্ত, বিধাতাই জানেন। আমরা ত ভাসিয়া যাইতেই জন্মেছি, কিন্তু আপনি ত হিতৈষী, আপনি সকল জানিয়াও স্থির থাকেন কেমনে ? আপনি এক অপূর্ব্ব লোক ! বলিতেছিলাম, দীপ্তি-সরলার শ্মশানটা একবার দেখিয়া যাইবেন কি ? দীপ্তির প্রকৃত শ্মশান কোথায়, জানেন কি ? সে শ্মশান এই বুকে, রক্ত-মাংস-জড়িত এই হৃদয়ে। শ্মশান দেখিবার আক-

র্গে আমাকে দেখিতে আহ্বান করিতেছি না, দীপ্তিকে হারাইয়া আমরা কি জীবন্ত-শ্মশান হৃদয়ে পূরিয়াছি, একবার দেখিয়া যাইতে বলিতেছি। তাহাতে অধর্ম্ম হইবার বুঝি বা সম্ভাবনা নাই। তবে আজ যাই।

আপনার পবিত্রতা-মুগ্ধা—পুণ্যপ্রভা।”

এই পত্রখানি প্রেমাঙ্কুর কতবার পড়িয়াছেন, পড়িয়া কতবার অশ্রু ফেলিয়াছেন, কতবার বুকে ধরিয়াছেন, কিন্তু তবুও তৃষ্ণা মিটে নাই। এই পত্রখানি যেন দীপ্তির বুকের রক্তে রঞ্জিত—অথবা যেন দীপ্তির জীবন্ত শ্মশান। যে ভাবে অনুপ্রাণিতা হইয়া পুণ্যপ্রভা এই পত্র লিখিয়াছেন, তাহা প্রেমাঙ্কুর বুঝিয়াছেন। যে স্বর্গীয় ভাবের দ্বারা পরিচালিতা হইয়া দীপ্তি শেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহাও বুঝিতেছেন। দীপ্তি পুণ্যপ্রভাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন, তারপর ভালবাসিয়াছিলেন, প্রেমাঙ্কুরকে। তিনি জানিতেন, তাহার অভাবে পুণ্যপ্রভা জীবন্মৃতা হইবেন। এই জন্যই আদর্শ ধরাইতে তাঁহার এত ব্যাকুলতা। তাহাকে সুখী করিবার জন্যই শেষ অনুরোধ। আপন প্রাণের জিনিস অন্যকে অম্লানচিত্তে দিতে পারে কে? আর কেহ পারুন বা না পারুন, দীপ্তি পারিয়াছেন। দীপ্তি পুণ্যপ্রভাকে রক্ষা করিতে জীবন দিয়াছেন, পুণ্যপ্রভাকে সুখী কবিতে প্রাণের আদর্শ প্রেমাঙ্কুরকে দিয়াছেন। নিঃস্বার্থতার জীবন্ত দৃষ্টান্ত, সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রেমাঙ্কুর এ অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন কি? কিন্তু পুণ্যপ্রভা এ দান গ্রহণ করিতে পারেন কি? দীপ্তির শোক যখন পুণ্যপ্রভাকে রাহুর ন্যায় পূর্ণ গ্রাস করিতে লাগিল, তখন এই প্রশ্ন উপস্থিত হইল। প্রেমাঙ্কুরকে হৃদয়ের এই শ্মশান দেখাইতে ইচ্ছা। দেখাইয়া চিরবিদায় লইতে বুঝিবা ইচ্ছা। প্রেমাঙ্কুর বাবু পুণ্যপ্রভার আকর্ষণ সম্বন্ধে একেবারে নির্লিপ্ত ছিলেন না; কিন্তু এই পত্র খানি তাঁহার হৃদয়কেও দারুণ শোকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। পুণ্যপ্রভার যদি আসক্তি থাকিত, দীপ্তির কথা গোপনে রাখিয়া প্রেমাঙ্কুরকে আকৃষ্ট করিতে পারিতেন। দীপ্তির শেষ অনুরোধ স্মরণ করাইয়া দিয়া উত্তেজিত করিতে পারিতেন। কিন্তু সে আসক্তির একটু অঙ্কুর উদ্গম হইতেছিল, দীপ্তির শ্মশানে তাহা ভস্ম হইয়া গিয়াছে। পুণ্যপ্রভা হইয়াছেন কেবল দীপ্তিময়ী। দীপ্তি যোগ-তপস্যা, দীপ্তি ধর্ম্ম-কর্ম্ম, দীপ্তি সাধন-ভজন। দীপ্তিময়ী পুণ্যপ্রভা দীপ্তির স্বামীকে দীপ্তির শ্মশান দেখাইতে আহ্বান করিতেছেন। প্রেমাঙ্কুর পুণ্যপ্রভার সরলতা বুঝিতেছেন। বুঝিয়া কষ্ট হইতেছে

না সুখ হইতেছে, আমরা জানিনা। মানব-চরিত্রের গম্ভীরতার মর্ম্মভেদ করিতে কে সমর্থ?

প্রেমাঙ্কুর বাবু দুই রাত্রি ঘুমাইতে পারিলেন না, প্রবল চিন্তার স্রোত হৃদয়কে তোলপাড় করিতেছে। একদিকে দেশানুরাগ, অন্যদিকে মানব-প্রেম; একদিকে পরদুঃখকাতরতা, অন্যদিকে পবিত্রতার বিশ্ববিমোহন ভাব,—সকলেরই সমান আকর্ষণ; কোন্ দিকে যাইবেন? কোন প্রশ্ন মীমাংসিত হয় না, সুতরাং চিন্তার উপর চিন্তা, দারুণ চিন্তা। এক এক বার ইচ্ছা হইতেছে, পুণ্যপ্রভাকে একখানি চিঠি লিখেন, কিন্তু আবার মনে হই-তেছে, একবার দেখা করেন। একবার ইচ্ছা হইতেছে, দীপ্তির শ্মশানের ভস্ম সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া সন্ন্যাসী বেশে দেশত্যাগ করেন। গভীর মর্ম্মবেদনা, গভীর উত্তেজনা, গভীর সম্মোহন। দুই রাত্রি আকাশকে সাক্ষী করিয়া কত কথাই ভাবিলেন। দুই রাত্রি জাগিয়া জাগিয়া, নির্জ্জন-বন্ধু নৈশ সমীরণের কাণে কাণে কত দুঃখের কাহিনীই বলিলেন! দুই রাত্রি একান্ত চিত্তে জীবনের ভূত ভবিষ্যতের কত বিষাদবার্ত্তাই গগনের উচ্চতা লক্ষ্য করিয়া ব্যক্ত করিলেন। অলিখিত সে ইতিহাস কে বুঝিবে, কে তাহার মর্ম্মভেদ করিবে? বীরত্ব ও কোমলত্বের সংগ্রাম, বৈরাগ্য ও আসক্তির যুদ্ধ, পবিত্রতা ও প্রেমের দ্বন্দ্ব—কতদূর হৃদয়দ্রবকারী, যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই প্রেমাঙ্কুরের হৃদয়-সমস্যা আজ বুঝিতেছেন। এ সকলের সাক্ষী কেবল একজন বন্ধু। একচুল এদিক কি একচুল ওদিক হইলেই প্রেমাঙ্কুরের জীবন-সমস্যার মীমাংসা হয়। মীমাংসা হয়, তিনি রিপুজয়ী নিষ্কাম, না তিনি ইন্দ্রিয়াধীন সকাম পুরুষ,—তিনি সংসারী, না তিনি অনাসক্ত কর্ম্মযোগী,—তিনি ন্যায়পরায়ণ, না তিনি ভাবুক-তার দাস! জীবন-সংগ্রামের ঘোরতর পরীক্ষার দিনে, সকলের সম্মুখেই এই দুই চিন্তা, হয় এপথ, নয় ওপথ। একপথে সংসার, অন্যপথে ধর্ম্ম। একপথে অধীনতা, অন্যপথে পবিত্রতা। প্রেমাঙ্কুর ভাবিতেছেন, "সংসারে থাকিলে কি ধর্ম্ম হয় না?" ভাবিতেছেন, "হইবে না কেন, সাধারণ লোকের ন্যায় ধর্ম্ম-লাভ হয়, কিন্তু খ্রীষ্ট, চৈতন্য, বুদ্ধ, নানক ও কবীরের ন্যায় ধর্ম্মলাভ হয় না। আসক্তিতে আসক্তিই বৃদ্ধি, সম্ভোগে সম্ভোগ-লালসাই বৃদ্ধি পায়। অতি-রিক্ত ইন্দ্রিয়চালনা করিলে মনঃসংযম আকাশ-কুসুম। আসক্তি, সম্ভোগ, ইন্দ্রিয়-চালনার পথ দিয়া অনাবিল পবিত্রতার পথে যাওয়া বড়ই কঠিন। পবিত্র-তার পথে যাইতে হইলে সংযমকে সম্বল করিতেই হইবে। কঠোর সংযম

ভিন্ন ধর্ম্মলাভ হয় না। বিবাহের পর বিবাহ, তার পর আবার বিবাহ, আবার বিবাহ,আবার বিবাহ—এরূপ করা যাহাদের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার, তাহারা ধর্ম্মভ্রষ্ট কি না?" প্রেমাঙ্কুর ভাবিতেছেন, "এহেন লোকেরা ধর্ম্ম মোটেই বুঝে না। অনেক যুবক,অনেক প্রবীণ ব্যক্তি, এইখানে ধর্ম্মকে ডুবাইয়া বিকারগ্রস্ত হন। কিন্তু তাঁহারা মরণ পর্য্যন্ত মনে করিতে ছাড়েন না যে তাঁহারা ধার্ম্মিক। পৃথিবী অপযশ ও কলঙ্কের মুকুট তাঁহাদের মস্তকে তুলিয়া দিলেও তাঁহারা মনে করেন বটে, তাঁহারা বড় ধার্ম্মিক; কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম অনেক দূর, অনেক দূর। মদ্য-বেশ্যা-সেবী সমালোচক যেমন আপনাকেই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করে, এহেন সংসার-কীটও তদ্রূপ মনে করে, তাহার ন্যায় আর ধার্ম্মিক নাই। কিন্তু ধর্ম্ম প্রকৃত পবিত্রতা, ন্যায়, দয়া, প্রেম, ভক্তি লইয়া অনেক দূরে, অনেক দূরে থাকেন।" প্রেমাঙ্কুর জীবন-সংগ্রামের কঠোর সংগ্রামে পড়িয়া পুনঃ ভাবিতেছেন—"আমি কোন্ পথে যাইব? ইন্দ্রিয়-সেবার পথে, না ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের পথে? ইন্দ্রিয়-সেবার পথে অশান্তি, অশান্তি, দারুণ অশান্তি। কেন তাহা বলি? এই পৃথিবীতে সুখী মানুষ কি নাই? কোথায় সুখ? সংসারে সুখী জীব কোথায়? তৃপ্তি মানুষের কিছুতেই নাই, ধনে নাই, ভোগে নাই, ইন্দ্রিয়-সেবায় নাই, কিছুতেই নাই। আছে কেবল অশান্তি, দুশ্চিন্তা, দুরারোগ্য ব্যাধি, আর কি? আমার জীবনের কঠোর ব্রত এই, সংযমের পথ ধরিয়া চিরকাল কেবল প্রেম, দয়া ও পবিত্রতার সেবা করিব। মানুষকে ভালবাসিব, কিন্তু কিছুই প্রত্যাশা রাখিব না। কর্ত্তব্যের জন্য জীবন ঢালিব, কিন্তু পরিণাম ভাবিব না। আর পবিত্রতার জন্য যাহা ছাড়িতে হয়, অম্লানচিত্তে ছাড়িব। আমি কেন কাপুরুষের ন্যায় ভাবিতে বসিয়াছি? আমার পথ ঐ বিমল শুভ্র আকাশ, ঐ বিশাল-বিস্তৃত মানব সমাজ, আমার পথ ঐ নির্জ্জন প্রকৃতির মধুর বিশ্বগ্রাসী জ্যোৎস্নারাশি। আমার ইচ্ছা হয়, এ হৃদয়টা ঐ নির্ম্মল আকাশের ন্যায় পবিত্র হউক, ঐ বিমল জ্যোৎস্নার ন্যায় শুভ্র হউক। আমি খাটিয়া খাটিয়া, দিয়া দিয়া—সব দিয়া দিয়া, সব সহিয়া সহিয়া চলিয়া যাই। পারিব না কি? পবিত্রতার বিঘ্ন অনেক, শত্রু অনেক, কিন্তু পারিব না কি? আমি সকল বিঘ্ন, সকল শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া পবিত্রতার গোলাম-গিরি করিতে পারিব না কি? এই সংসারে থাকিয়া সংসারকে জয় করিতে পারিব না কি? সংসারকে জয় করিতে পারিলে তবে পবিত্রতার

আস্বাদন পাওয়া যায়; আমি তা পারিব না কি? বিধাতা সহায় হউন, আমি অবশ্য পারিব। না পারি, জীবন ত্যাগ করিব। তবুও, রিপুর পথে চলিব না। বিধাতা সহায় হউন, আমি রিপুর পথে চলিব না।”

ভাবিতে ভাবিতে প্রেমাঙ্কুর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। কঠোর নূতন ব্রত লইলেন। তাঁহার জীবনের যে ব্রত, সেই ব্রতই আজ আরো নূতন হইয়াছে; তিনি সংযমে বুক বাঁধিলেন; এবং মনে স্থির করিলেন, একবার দীপ্তির শ্মশান-সহবাস করিয়া নবজীবন পাইয়া কর্ত্তব্যপথে যাইবেন। এইরূপে, বিধিকৃষ্ণপুর যাইতে তিনি আবার ও প্রস্তুত হইলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সাধ্বীর সংস্পর্শে।

পর দিন প্রত্যূষে একখানি ছোট নৌকা ঘাটে লাগিল। প্রেমাঙ্কুরের নিকট সংবাদ পৌঁছিল, বিধিকৃষ্ণপুর হইতে একখানি নৌকা আসিয়াছে। প্রেমাঙ্কুরের নিকট যেন এ সংবাদ স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। আনন্দের প্রবাহ সর্ব্বাঙ্গকে শিথিল করিল। তিনি অন্তরের ভাব অন্তরে চাপিয়া নৌকার নিকট উপস্থিত হইলেন। নিকটে যাইয়া বুঝিলেন, নৌকায় তারানাথ, নীলকান্ত, প্রসন্নময়ী ও পুণ্যপ্রভা আসিয়াছেন। বুঝিলেন, এক খানি নৌকা নহে, এ যেন ব্রত ভাঙ্গিবার একখানি কঠোর মুদ্গর, অথবা বীরত্ব চূর্ণ করিবার যেন অপূর্ব্ব এক সুদর্শন-চক্র; অথবা প্রতিজ্ঞা-অভিমন্যু বধের যেন সপ্তরথী-ব্যূহ। প্রেমাঙ্কুরের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। প্রেমাঙ্কুরকে দেখিয়া তারানাথের অন্তরে বিমল আনন্দ উপস্থিত হইল। প্রেমাঙ্কুরের সৌম্য, সুন্দর ও প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিলে সকলেরই আনন্দ হয়। বিধাতা অপরূপ সাজে ঐ মূর্ত্তি সজ্জিত করিয়াছেন, চরিত্র তদুপরি তুলি ধরিয়া মধুর হইতেও মধুর রং ফলাইয়াছে, সংযম বিলাসিতাহীনতার তুলি দ্বারা মূর্ত্তিকে পবিত্র হইতেও পবিত্র করিয়াছে। প্রিয়-দর্শন প্রেমাঙ্কুরকে দেখিয়া মোহিত হইলেন, তারানাথ, তারপর নীলকান্ত, তারপর প্রসন্নময়ী, তারপর পুণ্যপ্রভা। প্রেমাঙ্কুর নৌকায় উঠিয়া তারানাথ, নীলকান্ত এবং দেবী প্রসন্নময়ীকে প্রণাম করিলেন। তাঁহা-

দিগের এই ভাবে আগমনের উদ্দেশ্য কি, প্রেমাঙ্কুর বুঝিতেছেন না। এজন্য তিনি একটু উৎকণ্ঠিত। সে উৎকণ্ঠা দূর করিবার জন্য তারানাথ বলিলেন— “বাবা,এতদিন পর বুঝি বা আমাদিগকে বিধিকৃষ্ণপুর পরিত্যাগ করিতে হইবে, অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াও এতদিন ছিলাম,কিন্তু এখন আমাদের সাধ্যের অতীত হয়েছে। তুমি চলিয়া যাইতেছ,শুনিয়াছি, এজন্য তোমার সহিত আমরা সকলে শেষ দেখা করিতে আসিয়াছি। পুণ্যপ্রভাকে বাড়ীতে রাখিয়া আর কোথাও যাওয়ার উপায় নাই, এজন্য তাহাকে অনেক বুঝাইয়া লইয়া আসিয়াছি। তোমার সহিত কিছু কথা আছে। তুমি যদি আমাদিগকে রক্ষা কর, বিধিকৃষ্ণপুর থাকিব, নচেৎ সকল স্মৃতি ডুবাইয়া কাশীবাসী হইব।”

প্রেমাঙ্কুর বুদ্ধিমান্ যুবক, বুঝিতে কিছু বাকী রহিল না। তিনি কোন কথা না বলিয়া সাদরে সকলকে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি সামান্য একখানি কুঁড়ে ঘরে থাকিতেন। এই কুঁড়ে ঘরে আজ আতিথ্যের সুন্দর বন্দোবস্ত হইল। যে কুঁড়ে ঘর এই কয়মাস অসংখ্য দরিদ্রের সেবা করিয়াছে, সেই কুঁড়ে ঘরে আজ দয়ার অবতার তারানাথ-প্রমুখ দলের সেবার আয়োজন হইতেছে। দুই প্রহর পর্য্যন্ত আহারাদির আয়োজনেই কাটিয়া গেল। অপরাহ্নে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার উপস্থিত। প্রেমাঙ্কুর বাবু চলিয়া যাইবেন, এ কথা গ্রামে গ্রামে রাষ্ট্র হইয়াছে, আজ দুঃখী দুঃখিনীগণ শেষ কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য দলে দলে উপস্থিত হইতেছে। অপরাহ্ন তিন ঘটিকার পূর্ব্বে প্রায় দুই সহস্র ডিঙ্গি প্রেমাঙ্কুরের বাসস্থানের চতুর্দ্দিকে লাগিয়াছে। এক বিলের বুকে ৮।১০ বিঘা জমী ভাসিতেছে। এইরূপ স্থলে প্রেমাঙ্কুরের বাসাবাড়ী। বাড়ীর চতুর্দ্দিক নৌকায় ভরিয়া গিয়াছে। ৪ ঘটিকার সময়ে প্রায় পাঁচ সহস্র দরিদ্র উপস্থিত। সকলের মুখে আজ বিষাদের ধারা বহিতেছে, তাহাদের জীবনদাতাকে বিদায় দিতে সকলের প্রাণে দারুণ কষ্ট। কমাস পর্য্যন্ত প্রেমাঙ্কুর যেন সকলের“পিতা-মাতা-ভাই-বন্ধু” ছিলেন। প্রেমাঙ্কুরের ভালবাসায় সকলে বশীভূত। প্রতি গৃহস্থ এই কমাস ছিল যেন প্রেমাঙ্কুরের পরিবার। এই কমাস প্রেমাঙ্কুর ছিলেন যেন অসংখ্য জনক জননীর পুত্র, অসংখ্য ভগ্নীর ভাই, অসংখ্য বালক বালিকার পিতা, অসংখ্য দরিদ্রের বন্ধু। তিনি এই কমাস না খাইয়া সকলকে খাওয়াইয়াছেন, নিজের পরিধানের বস্ত্র পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া রমণীজাতির লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন,—কখনও লেপের ওয়াড় পরিয়া, কখনও বিছানার চাদর পরিয়া, কখনও গামছা পরিয়া দিন কাটাইয়াছেন।

অনাহারে ও অল্পাহারে, পরিশ্রমে পরিশ্রমে, অনিদ্রায় অনিদ্রায় শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে। জীর্ণ শীর্ণ শরীরে প্রেম-প্রলেপে অপরূপ শোভা ফুটিয়াছে। আজ অসংখ্য পরিবার হৃদয়-সরোবরে কৃতজ্ঞতার তরঙ্গ তুলিয়া কুঁড়ের চতুর্দ্দিকে উপস্থিত। আজ বিদায়ের দিন, সকলের হৃদয়ের মধুর কৃতজ্ঞতা উথলিয়া উঠিয়াছে। দরিদ্রের "পিতা-মাতা-ভাই-বন্ধু" আজ নীরব কৃতজ্ঞতার জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছেন। অনেকেই নীরবে পদধূলি লইতেছে, অনেকেই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছে। সকলের নয়নে অশ্রু। কেহ হাত ধরিয়া টানিয়া দুটো প্রাণের কথা বলিতেছে, কেহ বা কেবল প্রেমাঙ্কুরের প্রেম-বিগলিত স্বর্গীয় মূর্ত্তি দেখিতেছে। প্রেমাঙ্কুর যেন আজ সকলেরই। সকলের হৃদয় কাড়িয়া, প্রাণ কাড়িয়া স্বর্গের দেবতা আজ যেন ধরায় অবতীর্ণ। কোন উপহার নাই, বক্তৃতা নাই, প্রস্তাব নাই, কেবল নীরব অশ্রুর ভিতর দিয়া আজ কৃতজ্ঞতার স্বর্গীয় প্রভাব দ্রব হইয়া পড়িতেছে। এমন দৃশ্য যে দেখে, সেও ধন্য হয়। তারানাথ প্রভৃতি সকলে এই পবিত্র দৃশ্য দেখিয়া মোহিত হইলেন। প্রেমাঙ্কুর আজ প্রেম-বিগলিত-চিত্তে কত মধুর কথা বলিলেন,কত সান্ত্বনা দিলেন,কিন্তু কাহারও চক্ষের জলধারা আজ আর থামে না। যাহারা কথা বলিতে পারিতেছে, তাহাদের মুখে কেবল এই একটী কথা শুনা যাইতেছে "বাবু, দুঃখের দিনে আপনি আমাদিগকে বাঁচাইয়াছেন, সুখের দিনে অবশ্য একবার আসিবেন।" এক গ্রামের কতকগুলি দীন দুঃখী ৫৲২॥ চাঁদা সংগ্রহ করিয়া একদিন প্রেমাঙ্কুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছিল, আজ তাহারা প্রেমাঙ্কুরের চরণ ধূলি মাথায় লইয়া বলিতেছে—"বাবু,আর একবার যেন আমাদের গ্রামে পদার্পণ হয়।" কোন গ্রামের লোক বলিতেছে, "আমাদের গ্রামে যেন শেষবার আপনার পদধূলি পড়ে।" প্রেমাঙ্কুর আজও চাউল ও বস্ত্র দিতেছেন। পূর্ব্বে অনেক বস্ত্র দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে সকলের নগ্নাবস্থা ঘুচে নাই; আজ শেষবার অনেককে পরিধানের বস্ত্র এবং শীতবস্ত্র দিতেছেন। যখন মুক্ত হস্তে দান-কার্য্য চলিতেছে, তখন দীন দুঃখীরা গগন কাঁপাইয়া বলিতেছে "প্রেমাঙ্কুর বাবুর জয়।" সেই শব্দের সহিত প্রেমাঙ্কুরের জন্য সকলের সরব এবং নীরব মঙ্গল প্রার্থনা আকাশে উঠিতেছে। এই ভাবে সমস্ত দিন গেল। রাত্রি ৮টার সময় বাসাবাড়ীর জনতা কমিল। প্রেমাঙ্কুরের নিকট প্রতিশ্রুতি লইয়া সকলে ভগ্নমনে বাড়ী ফিরিল। এই জীবন্ত দৃশ্য দেখিয়া পুণ্যপ্রভা, দেবী প্রসন্নময়ী

বুঝিলেন, প্রেমাঙ্কুর মানুষ নহে, দেবতা। সহস্র সহস্র লোকের ভালবাসা যে পায়, সে কি মানুষ ?

সমস্ত দিনের মধ্যে আর প্রেমাঙ্কুর আলাপের তেমন সময় পাইলেন না। মনের মধ্যে একটা চিন্তার ছায়া পড়িয়াছে। কি করিবেন, ভাবিয়া ঠিক পাইতেছেন না। কার্য্যের ভিড়ে এক প্রকার ছিলেন ভাল ; যখন ভিড় কমিল, তখন প্রাণটা দুরু দুরু করিতে লাগিল। যাঁহাদিগের মহত্ব স্মরণেও আনন্দ হয়, তাঁহাদিগের সম্মান রাখিতে হইবে, অথচ কর্ত্তব্যে অবহেলা করা হইবে না, বিষম ভাবনার কথা।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই চতুর্দ্দশীর চাঁদ আপন সিংহাসনে বসিয়া রাজ্য বিস্তারের আয়োজন করিতেছে ; দীপ্তি রাশি চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিয়া স্নিগ্ধতায় জগৎকে বশে আনিবার চেষ্টা করিতেছে। ফুল হাসিতেছে,ফল হাসিতেছে, বৃক্ষের পাতা হাসিতেছে, মুকুল হাসিতেছে, চতুর্দ্দিকের জল হাসিতেছে, স্থল হাসিতেছে। নীরব হাসির মহাসাগর ক্রমেই উজ্জ্বলতর হইতেছে, স্ফুট হইতে স্ফুটতর, মধুর হইতে মধুরতর, পবিত্র হইতে পবিত্রতর হইয়া চাঁদ ক্রমেই জগৎকে বশ করিতেছে। মানুষ সেই মধুরতায় ডুবিয়া আত্মহারা হইয়াছে। যুবক হাসিতেছে, যুবতী হাসিতেছে, বালক হাসিতেছে, বালিকা হাসিতেছে। খোলা গায়ে খোলা স্থানে সকলে হাসিয়া হাসিয়া আকুল। হৈমন্তিক শোভায় আজ সকল বিভাসিত। শোভার উপর শোভা, তার উপর আরো শোভা। এই শোভা পুণ্যপ্রভাকে, দেবী প্রসন্নময়ীকে অপূর্ব্ব সাজে সাজাইয়াছে। রাত্রিতে প্রেমাঙ্কুরকে নৌকায় তুলিয়া গ্রাম হইতে কিছু দূরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। প্রেমাঙ্কুরের একটী সহচর আছে, তাহাকেও লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ছয়ের উপরে চাঁদনী রজনীতে মহা মেলা বসিয়াছে। একদিকে নীলকান্ত,তারানাথ, অন্যদিকে দেবী প্রসন্নময়ী,পুণ্যপ্রভা, মধ্যে প্রেমাঙ্কুর। এই চিত্র দেখিয়া চাঁদ হাসিয়া আজ আকুল। আকাশে চাঁদের মেলা, না নৌকায় চাঁদের মেলা, চাঁদ ভাবিয়া যেন ঠিক পাইতেছে না। ছুটিয়া ছুটিয়া ইহার গায়ে, তাহার গায়ে পড়িতেছে এবং জলের মধ্যে নামিয়া সহস্র রূপ ধারণ করিয়া রঙ্গময় কেবল হাসিয়া হাসিয়া আটখান হইতেছে। চাঁদের জ্যোতিতে বিহ্বল হইয়া বায়ু মৃদু মন্দ ভাবে বহিতেছে। অথবা ছুটিয়া ছুটিয়া, ইহার গায়ে, তাহার গায়ে বিহ্বল ভাবে পড়িতেছে। এর বাতাস তার গায়ে, তার বাতাস ইহার গায়ে লাগাইতেছে। অপূর্ব্ব মিলন !

এ হেন সময়ে মানুষ কি সংযমের অধীন হইয়া চলিতে পারে? রিপুর উত্তেজনা, ভাবের উত্তেজনা, প্রেমের উত্তেজনা, কিছুরই উত্তেজনা হইবে না, এরূপ নির্ব্বিকার চিত্তে এ হেন সময়ে থাকা মানুষের পক্ষে সম্ভব কি? প্রেমাঙ্কুর বাবু বিচলিত হওয়া সম্ভব মনে করিয়া বিধাতাকে স্মরণ করিলেন। তিনি নীরব,—গম্ভীর, নিস্পন্দ, নিঃশব্দ, নিশ্চিন্ত। ক্ষণকাল সকলেই এইভাবে রহিলেন। ক্ষণকাল সকলেই সময়ের গাম্ভীর্য্য এবং পবিত্রতা উপলব্ধি করিলেন। তৎপর দেবী প্রসন্নময়ী নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া প্রেমাঙ্কুরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আমরা কি বিপদে পড়িয়াছি, আপনি বুঝিতেছেন। মা জগদম্বার কৃপায় সকল বিপদকে তুচ্ছ করিতে শিখিয়াছি, কিন্তু পুণ্যপ্রভাকে রক্ষা করা আমাদের সাধ্যের অতীত হইয়াছে। মাদারিপুরের ডেপুটী বাবুর হাত হইতে ইহাকে কিরূপে রক্ষা করিব, ভাবিয়া ঠিক পাইতেছি না। সে পাগল হইয়াছে। মুকুন্দরামের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছে। আমাদিগকে হত্যা করিয়াও তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবে, তাহার নাকি এই প্রতিজ্ঞা। আমাদের মান ইজ্জত সকল এখন আপনার হাতে। হিন্দু সমাজে এই মেয়েকে বিবাহ করিবে, এমন লোক আপনি ভিন্ন আর দেখি না। আমরা এই সোণার প্রতিমাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হতে চাই। আমরা এই রত্নকে আপনার দেবোপম জীবনে উৎসর্গ করে দীপ্তির শেষ অনুরোধ রক্ষা কর্‌তে চাই। পুণ্যপ্রভাকে আপনার অযোগ্যা বিবেচনা না করিলে, আপনি ইহাকে গ্রহণ করিয়া আমাদের মান সম্ভ্রম বজায় রাখুন। সকল প্রকার অত্যাচার হইতে আমাদিগকে রক্ষা করা এখন আপনার হাতে।"

তারানাথ বলিলেন, "প্রবল চক্রান্তের হস্তে পড়ে এখন আর রক্ষার উপায় দেখিতেছি না। আমাদিগকে দেশত্যাগী হইতে হইবে। হরিগোপাল মনস্থ করেছেন, দীপ্তির শ্মশানের ধারে মহামায়ার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করে একটী অতিথিশালা স্থাপন করিবেন। প্রচুর টাকা এতদর্থে তিনি দান করিবেন। লীলা, তিলোত্তমা ও পুণ্যপ্রভার ইচ্ছা, ইহারা সেবা-দাসী হয়ে মহামায়ার মন্দিরে জীবন কাটাইবে। দীপ্তির শ্মশানে দিবারাত্রি লীলা ও তিলোত্তমা পড়িয়া আছে। তিলোত্তমার স্বামী, সকল সংবাদ জানিয়া বিরক্ত হয়ে, তিলোত্তমার পিতার কলিকাতার বাসা পরিত্যাগ করে, পুনরায় বিবাহ করেছে। তিলোত্তমার সে জন্য কোন চিন্তা নাই। লীলার কোন কাজেই তাহার বাড়ীর লোকের কোন আপত্তি নাই। লীলা ও তিলোত্তমা সংসারের আসক্তি ডুবাইয়াছে, যে প্রকার দেখা

যাইতেছে, তাহারা যে অধিক দিন বাঁচিবে, সে সম্ভাবনাও নাই। পুণ্যপ্রভাও সেই দলে। ইহার জীবনেরও আর কোন আসক্তি নাই। দীপ্তির অনুগমন করিতে সকলেই প্রস্তুত, কিন্তু তাহাতে দীপ্তির ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। দীপ্তির মাতা উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়াছেন, দীপ্তির পিতা জীবন্মৃত হইয়া আছেন। পুণ্যপ্রভা কাছে থাকিলে তাঁহারা একটু সুস্থ থাকেন, কিন্তু পুণ্যপ্রভা দূরে গেলেই তাঁহারা অস্থির হন। বিধিকৃষ্ণপক্ষে এই অবস্থায় পুণ্যপ্রভাকে আর রাখার উপায় নাই। পুণ্যপ্রভা গেলে দীপ্তির পিতা মাতা, লীলা তিলোত্তমা—সকলেই যাইবে। শান্তিশীলার পরিণামও অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইবে। আমরা আর উপায় না পাইয়া, বাবা, তোমার দ্বারে ভিখারী। ভিক্ষা এই, দীপ্তির শেষ অনুরোধ রাখিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর।"

প্রেমাঙ্কুর বলিলেন, যে অবস্থা দেখিতেছি, পুণ্যপ্রভাকে রক্ষা করার কর্ত্তা কেবল ভগবান। তিনি না রাখিলে আর রাখিবে কে? জগদম্বার কৃপায় এত বিপদ কাটিয়াছে যখন, তখন আর ভয় কি?

প্রসন্নময়ী।—বিপদ কাটে নাই, বিপদ আরো বাড়িয়াছে। দীপ্তিকে হারাইয়া আমরা শক্তিহীনা হইয়াছি। সে ছিল মহাশক্তি বা কায়া, আমরা ছিলাম ছায়া। পুণ্য পবিত্রতা হারাইয়া আমরা এখন নিষ্প্রভ হইয়াছি। ধর্ম্ম গিয়াছে, কিন্তু অধর্ম্মের রাজত্ব আছে। ভয় ষোল আনা।

প্রেমাঙ্কুর।—দীপ্তির শক্তিতে পুণ্যপ্রভা অনুপ্রাণিতা, আপনি বিশ্বাস করেন না কি?

প্রসন্নময়ী।—তাহা অসম্ভব। পুণ্যপ্রভা দীপ্তির পূর্ণ শক্তির অর্দ্ধশক্তি মাত্র পাইয়াছে। তাহারও বিশ্বাস ছিল, আমাদেরও বিশ্বাস, আপনার সহিত মিলিতা হইলে তবে পুণ্যপ্রভা পূর্ণ শক্তি পাইবে। দীপ্তির অদ্বৈত শক্তি কতক আপনাতে, জানেন না কি?

প্রেমাঙ্কুর।—আমি দীপ্তির নিতান্ত অযোগ্য ছিলাম, আজও আছি। আমি পুণ্যপ্রভারও অযোগ্য; আমি জগতের সকলের অযোগ্য। আমি নগণ্য, আমি সামান্য, অতি সামান্য। আমাতে মিশিলে মানুষ সামান্য, নগণ্য হইয়া যাইবে। আমার সংস্পর্শে কাহারও আসা উচিত কি? আমি ত নিজের নই, আমি জগতের। আমি জগতের সহিত যেখানে মিলিয়াছি, সেইখানে আমার সামান্যত্ব ঘুচিয়াছে। আমার নিজত্ব বা ব্যক্তিত্ব কিছুই নাই, যে জগতের হইবে, সে-ই আমার।

প্রসন্নময়ী।—আমরা সকলেই সাধ্যমত এই ব্রত পালন করিয়া আসিতেছি,

আপনার যিনি উপাস্য ও গুরু, আমাদেরও তিনিই উপাস্য ও গুরু। দেশ হিত-ব্রতে আমরাও নিজত্ব ভুলিয়া ফকীরি লইয়াছি, আপনি সকলই জানেন। পুণ্যপ্রভা সামান্যই চায়। পুণ্যপ্রভা জগতের দ্বারে আপনাকে বিক্রয় করিতেই চায়। পুণ্যপ্রভা আপনারই যোগ্য।

প্রেমাঙ্কুর।—আমি আমার উপদেষ্টার নিকট চিরকৌমার্য্য-ব্রত গ্রহণ করিয়াছি। দেশের জন্য খাটিব, দেশের জন্য বাঁচিব, দেশের জন্য মরিব, ইহাই ব্রত। আর কামনা নাই, আর বাসনা নাই।

প্রসন্নময়ী।—পুণ্যপ্রভাও তাই চায়। পুণ্যপ্রভাও চির[illegible]রী থাকিয়া দেশের সেবা করিতে চায়।

প্রেমাঙ্কুর।—ভাল কথা। তবে আর গ্রহণের কথা, উৎসর্গের কথ[illegible]ন কেন? দুই জন অনন্তকাল দূরে দূরে থাকিয়া জগতের মঙ্গল চিন্তা করিয়া যাই না কেন?

প্রসন্নময়ী।—প্রলোভনকে জয় করিতে পারিলে পুরুষের আর ভয় নাই, প্রলোভনকে জয় করিতে পারিলেও নারীর ভয় দূর হয় না; নারী পরাধীনা। পুরুষের অত্যাচারের হাত হইতে নারীকে কে রক্ষা করিবে?

প্রেমাঙ্কুর।—নর নারীকে রক্ষা করিতে ব্রহ্মাণ্ডে কেবল ধর্ম্মই আছেন। আর সহায় নাই, আর সম্বল নাই। পুণ্যপ্রভা যদি ধর্ম্ম পান, তবে ধর্ম্মই তাহাকে রক্ষা করিবে, ভাবনা কি?

প্রসন্নময়ী।—ধর্ম্ম সাধনের জন্য স্ত্রীপুরুষের মিলন প্রয়োজন। প্রকৃতি ও পুরুষ, দুই মিলিয় সৃষ্টি, অস্বীকার করিতে পারেন কি? বৈচিত্র্যময়ী স্[illegible]তে এই দুইয়ের মিলন হইলে তবে ধর্ম্ম অবতীর্ণ হন, জানেন না কি?

প্রেমাঙ্কুর।—জানি, সাধারণ নিয়ম উহাই। জগতে ইহার ব্যতিক্রম আছে। অনেক মহাত্মা, পরিবারের বন্ধন ছিঁড়িয়া, জগতের সেবা করিয়াও ধর্ম্মের অধিকারী হইয়াছেন। অনেক মহাত্মা, সাধন-পথে স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিয়াও ধর্ম্ম পাইয়াছেন। ঈশা, ম্যাট্‌সিনি প্রথম শ্রেণীতে গণ্য; বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে গণ্য। উঁহারা ধার্ম্মিক নহেন, বলিতে পারেন কি?

প্রসন্নময়ী।—উঁহারা সংসারত্যাগী, না সংসারী? জলে না নামিয়া সাঁতার শিক্ষা হয় না। সংসারে না নামিয়া কেহই বৈরাগ্য শিক্ষা করিতে পারে না। আসক্তির বস্তুর ভিতর থাকিয়া অনাসক্ত হওয়া যায় না কি?

প্রেমাঙ্কুর।—তাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়াও মহাসংসারী, তাহা জানি; কিন্তু তাঁহারা আসক্তিহীন সংযমী সংসারী, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

প্রসন্নময়ী।—সংসার পাতিয়া সংযম শিক্ষা করিতে হয়, না সংসার ছাড়িয়া?

প্রেমাঙ্কুর।—বিষয়-মদে নিমগ্ন থাকিয়া সংযম শিক্ষা করা বড়ই কঠিন। এজন্যই মহাজনেরা একএক সময় সংসার-প্রলোভন পরিত্যাগ করা আবশ্যক মনে করেন?

প্রসন্নময়ী।—শরীরের ইন্দ্রিয় সকল বিনষ্ট করিয়া সংযম শিক্ষা করা উচিত কি? প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া প্রলোভন জয় করা মহত্ব নয় কি? সংসারও যাঁহার সৃষ্টি, অরণ্যও তাঁহার সৃষ্টি। সংযম-শিক্ষার স্থল সর্ব্বত্র নয় কি?

প্রেমাঙ্কুর বুঝিলেন, প্রসন্নময়ীর সহিত সাধন সম্বন্ধে কথা বলা ধৃষ্টতা মাত্র। বুঝিলেন, ইনি ধর্ম্মরাজ্যে এত অনুপ্রবিষ্ট যে, সকল কথার উত্তর দেওয়া অসাধ্য। ক্রমে তিনি নিতান্ত সঙ্কীর্ণ স্থলে উপস্থিত হইতেছেন, তাহা বুঝিলেন। কি উত্তর করিবেন, ক্ষণকাল ভাবিলেন, ভাবিয়া বলিলেন—"ইন্দ্রিয় সকল রাখিয়াই সংযম শিক্ষা করিতে হইবে।"

প্রসন্নময়ী।—বিবাহ করিয়াও যে অবিবাহিতের ন্যায় মহাসংযমী থাকিতে পারে, সাধন-রাজ্যে সে কি শ্রেষ্ঠ নয়?

প্রেমাঙ্কুরকে অবনত মস্তকে একথা স্বীকার করিতে হইল। নিজের দুর্ব্বলতার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন—আমি দুর্ব্বল মানব, কঠোর কর্ত্তব্যপথে পদস্খলিত হওয়ার সম্ভাবনা বলিয়াই আমার উপদেষ্টা ঐ ব্রত দিয়াছেন। বিবাহ করিয়াই লোক আসক্তি-সাগরে ডুবিয়া যায়, কর্ত্তব্য ভুলিয়া যায়, জগতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে। আমার মনে সদা এই ভয়।

প্রসন্নময়ী।—প্রণম্য বিদ্যাসাগর মহাশয় বিবাহ করিয়াও কি জগতের সেবা-ব্রত পালন করিতে পারেন নাই?

প্রেমাঙ্কুর।—সকলে ত আর বিদ্যাসাগর নয়।

প্রসন্নময়ী।—সকলে না হইলেও, দয়া, প্রেম ও পবিত্রতা যাহার জীবনের আদর্শ, সেই প্রেমাঙ্কুর বিদ্যাসাগরের পদানুসরণের অযোগ্য নয়।

প্রেমাঙ্কুর।—আমি অনেক কাজে তাঁহারই পদানুসরণ করিতেছি। কিন্তু বিবাহ বিষয়ে ম্যাট্সিনিই আমার আদর্শ।

প্রসন্নময়ী।—মাতৃজাতিকে অবহেলা করিয়া কেহ কখনও বড় হইতে পারে নাই। ম্যাট্সিনি মাতৃভক্ত ছিলেন বলিয়াই জগতে মহিমান্বিত। আপনার মাতা থাকিলে মাতৃভক্তির পথ দিয়াই প্রেমের সাধনে সিদ্ধ হইতে পারিতেন। মাতৃহীনের পক্ষে স্ত্রী গ্রহণ একান্ত কর্ত্তব্য। আদ্যাশক্তি মহাশক্তি রমণী হৃদয়ে, জানেন না কি?

এই কথা বলিবার সময় দেবী প্রসন্নময়ীর সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইতেছিল, চক্ষু হইতে জলধারা বহিতেছিল, ভক্তিতে বদন অপূর্ব্ব শোভায় প্রদীপ্ত হইতেছিল। পুনরায় বলিলেন, জানেন না কি, জগতের সকল শক্তি মা জগদম্বা!

প্রেমাঙ্কুর ভাব দেখিয়া নির্ব্বাক হইলেন। বুঝিলেন, এইবার মাতৃশক্তি প্রসন্নময়ীর শরীরে অবতীর্ণ হইয়াছে। বুঝিলেন, এই মাতৃশক্তির অঙ্কুরে পুণ্য-প্রভার শরীর গঠিত। তর্কে পরাজিত, বিশ্বাসে পরাজিত, ভাবে পরাজিত—তিনি যেন আজ কেবল পরাজিত হইবার জন্যই আছেন। অধিক কথা বলা বাচালতা হইতেছে বুঝিলেন এবং বলিলেন,—মা, আপনি কি করিতে বলেন?

প্রসন্নময়ী সেই ভক্তি-গদগদ চিত্তেই বলিলেন—বলি, পুণ্যপ্রভাকে বিবাহ করিয়া দীপ্তির কথা রাখুন। দীপ্তি মানবী ছিল না, সে আকাশের বাণী। বলি, বিবাহ করিয়া সংযমী হউন, পবিত্রচিত্ত হউন, নিষ্কাম হইয়া জগতের দাসত্ব করুন। জগতের সেবা ও জগতের দাসত্ব, একই কথা। আসক্তিহীন হইয়া দাসত্ব করুন। বলি, উভয়ে যুক্ত হইয়া বিধিকৃষ্ণপুরে দীপ্তির মহা-শ্মশানে মহামায়ার মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া মহাধর্ম্ম সাধন করুন। আমরা দেখিয়া ধন্য হইয়া যাই। তবে দেশোদ্ধার হইবে, তবে প্রেম পুণ্য অবতীর্ণ হইবে। কথা রাখুন, পুণ্যপ্রভা আপনার অযোগ্যা নহে। প্রেম সাধনের আদর্শ জননী এবং সতী স্ত্রীর হৃদয়, দয়া সাধনের আদর্শ দীন দুঃখী অনন্ত মানব পরিবার, পবিত্রতা সাধনের আদর্শ ঐ নির্ম্মল শুভ্র আকাশ।

প্রসন্নময়ীর কথাগুলি ধর্ম্মানুপ্রাণিত, তিনি যাহা বলিতেছিলেন, সকলই যেন বিধাতার আদেশে স্ফুরিত হইতেছিল। কথাগুলি সকলের হৃদয়েই পশিতে-ছিল। স্বর্গীয় প্রভায় সকলের হৃদয় মনই পরিপূর্ণ হইতেছিল। প্রবল বন্যায় যেমন পর্ব্বত হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডও স্খলিত হইয়া ভাসিয়া যায়, আজ তেমনি প্রেমাঙ্কুরের কঠিন কর্ত্তব্য-প্রস্তরের বাঁধ ভাসিয়া গিয়াছে—প্রসন্নময়ীর স্বর্গীয় ভাবে তিনি অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। তিনি আর কথা বলিতে পারিলেন না। জননী-তুল্যা প্রসন্নময়ীকে ভক্তির সহিত একটী প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, যদি অনুমতি করেন, তবে পুণ্যপ্রভার সহিত দুই চারিটা কথা বলিয়া মতামত প্রকাশ করিতে চাই।

সকলে বলিলেন, "তাহাই হউক।"

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

উৎসর্গ।

যখন নদীর বাঁধ ভাঙ্গে, তখন প্রবল বন্যার স্রোতকে বাধা দেয়, কাহার সাধ্য? প্রবল শক্তির সংঘর্ষে সামান্য শক্তি চিরদিনই পরাজিত। মহাত্মা বুদ্ধদেবের সংস্পর্শে মহাপরাক্রান্ত রাজা বিম্বসার পরাজিত হইয়াছিলেন, মহাত্মা চৈতন্যের সংস্পর্শে ঘোর বিষয়ী রূপসনাতন পরাজিত হইয়াছিলেন। সাধনার দুর্জ্জয় প্রভাবের গতিরোধ করে,কাহার সাধ্য? ধর্ম্মের অদম্য পরাক্রম নিবারণ করে, কাহার ক্ষমতা? প্রেমাঙ্কুর কর্ম্মবীর,ব্রতপরায়ণ ব্যক্তি, আজ প্রসন্নময়ীর উজ্জ্বল ধর্ম্মজীবনের নিকট ম্লান, আজ প্রসন্নময়ীর নিকট পরাজিত। আজ প্রেমাঙ্কুর মহামায়ার নবোৎসর্গীকৃত জীব, তাহার কর্ম্ম এবং ব্রত আজ যেন ধর্ম্মের যূপকাষ্ঠে বলি হইয়াছে। বিধির অপূর্ব্ব বিধান। সপ্তরথী ঘেরিয়া যেন প্রতিজ্ঞা-অভিমন্যুকে বধ করিয়াছে।

"তাহাই হউক" বলিয়া সকলে ছয়ের উপর হইতে অবতরণ করিলেন, রহিলেন কেবল, পুণ্যপ্রভা ও প্রেমাঙ্কুর। এরূপ সর্ব্ববাদীসম্মত প্রস্তাবের পর উভয়ের এই প্রথম সন্দর্শন, এই প্রথম মিলন। অনুরাগের চক্ষে দেখিলে, প্রকৃতির সকলই মধুময় বোধ হয়। আসক্তি এবং অনুরাগ যখন মানুষের হৃদয়কে আর্দ্র করে,তখন অতি কুৎসিৎও সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। একে পুণ্যপ্রভা সুন্দরী, তাতে গুণবতী, তাহার উপর একটু অনুরাগের আকর্ষণ যখন প্রেমাঙ্কুরের হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়াছে,তখন সৌন্দর্য্য অতুলনীয় রূপ উন্মেষ করিয়াছে। নির্ম্মল, নির্ম্মেঘ গগনের পূর্ণচন্দ্রের যে ধবল জ্যোৎস্না রাশি জগৎ ছাইয়াছে, সেই জ্যোৎস্না-বিধৌত, সমীরণ-সেবিত রূপরাশি অমিয়া ঢালিয়া যেন প্রেমাঙ্কুরকে আকর্ষণ করিতেছে। শুভ্রগৈরিকাবৃতা, আসক্তিহীনা পুণ্য-জ্যোতিতে হেমাভ উজ্জ্বল জ্যোৎস্না আজ যেন অনন্ত শোভা ঢালিয়াছে,—নয়নে জ্যোতি, ললাটে জ্যোতি, বদনে জ্যোতি, সর্ব্বাঙ্গে জ্যোতি, আজ পুণ্যপ্রভা জ্যোতির্ম্ময়ী। শুভ্র আকাশের একপার্শ্বে কেবল গাঢ় কালমেঘ। বদন-চন্দ্রমাকে আবৃত করিবার জন্য কুন্তলরূপী কালমেঘ বায়ুভরে উড়িয়া উড়িয়া পড়িতেছে। প্রেমাঙ্কুরের চক্ষে আজ অনুরাগ-অঞ্জন সুলেপিত,সুতরাং দেখিলেন, অপরূপ দৃশ্য। দেখিলেন—পুণ্যপ্রভা মাধুর্য্যে, সৌন্দর্য্যে, পবিত্রতায়

আজ অলৌকিক শোভায় সজ্জিতা; দেখিলেন—বিষাদে আজ অনন্ত প্রেম-ধারা বহিতেছে, দয়ায় আজ অনন্ত কমনীয়তা মিশিয়াছে, পবিত্রতায় আজ অনন্ত দীপ্তি ক্রীড়া করিতেছে। তিনি সে প্রেমাভ অপরূপ দেখিয়া মোহিত এবং বিগলিত হইলেন। দেখিয়া দেখিয়া আজ আর নয়ন তৃপ্ত হইতেছে না, ঐ সৌন্দর্য্যরাশিকে বুকে পুরিতে ইচ্ছা হইতেছে। দেখিয়া দেখিয়া আজ আর মন শান্তি পাইতেছে না, সেই মোহিনী মূর্ত্তিকে প্রাণের ঘরে পুরিয়া রাখিতে ইচ্ছা হইতেছে।

প্রেমাঙ্কুর কথা বলিবেন কি, রূপ দেখিয়া আত্মহারা হইলেন। তাঁহার এত কালের কঠোর সংযম, কঠোর কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, নিষ্কাম-সেবা-পিপাসা সব যেন লুপ্ত বা সুষুপ্ত। তিনি থাকিয়াও যেন নাই। তিনি কোন্ রাজ্যে আছেন, তাহার নিজেরই সন্দেহ হইতেছে। সর্ব্বাঙ্গ শিথিল, হস্ত পদাদি নিস্পন্দ, নয়ন পলকহীন, তিনি তন্ময়ত্বে নিমগ্ন। মনে ভাবিতেছেন, "আমি কি স্বর্গে, না স্বপ্ন দেখিতেছি? এই অনন্ত সৌন্দর্য্য রাশি কি আমারই জন্য? আমি কি ইহার যোগ্য? আমি পিতৃহীন, মাতৃহীন, ধনহীন, ঐশ্বর্য্যহীন, বিদ্যাহীন, বুদ্ধিহীন। আমি কি এই সৌন্দর্য্যের যোগ্য? ধূলিশয্যা আমার অঙ্গে সাজে ভাল, এই কুসুম-বিনিন্দিত কমনীয়তায় আমার কাজ কি? আমি এখানে কেন? আমার দরিদ্র-সেবা কোথায়? জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালময় দীন দুঃখীগণের করুণ আর্ত্তনাদ কোথায়? আমি সত্যই কি স্বপ্ন দেখিতেছি? আমাকে এই তন্ময়ত্বের রাজ্যে কে আনিল? এই কি মরণের পথ? আমার জীবনে এ হেন ছবি কেন জাগিতেছে? এ চক্ষু কেন অন্ধ হইল না? হায় আমি মাতৃগর্ভে কেন মরি নাই! হায়, সংসারের কর্ত্তব্যের পথে ঘুরাইতে ঘুরাইতে কে আমাকে পথভ্রষ্ট করিল? আমি এখন পলায়ন করি কোথায়? আমার সর্ব্বাঙ্গ আজ নিশ্চল হইতেছে কেন? আমার কর্ত্তব্য এবং ধর্ম্মবুদ্ধি কোথায়? এই মোহ-বিকারে আমাকে আজ একেবারে আচ্ছন্ন করিতেছে, আমাকে রক্ষা করে কে?" ভাবিতে ভাবিতে প্রেমাঙ্কুরের সর্ব্ব শরীর ভেদ করিয়া ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল, সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন। হস্তপদাদি কাঁপিতে লাগিল। পুণ্যপ্রভা বুঝিলেন, প্রেমাঙ্কুরের ফিট হইয়াছে। তিনি লজ্জায় অভিভূতা, কি করিবেন, ঠিক পাইতেছেন না। তাহাকে আজ কর্ত্তব্য কে বুঝাইয়া দিবে? তিনি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ার ন্যায় প্রেমাঙ্কুরের মাথা ক্রোড়ে তুলিয়া অঞ্চল দ্বারা

বীজন করিতে লাগিলেন এবং এই অবসরে, চাঁদের জ্যোতি-প্লাবিত সেই প্রেম-দয়া-পবিত্রতার আদর্শ মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তিনিও সেই শোভায় তন্ময় হইলেন। অনেকক্ষণ পর প্রেমাঙ্কুরের চেতন হইল, তিনি চাহিয়া দেখিলেন, পুণ্যপ্রভার ক্রোড়ে তাঁহার মস্তক রহিয়াছে। কি এক স্বর্গীয় ভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। একটীও কথা না বলিয়া মাথা তুলিয়া লইলেন এবং বলিলেন "দেবি, প্রভাময়ি, পুণ্যময়ি, আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি ঐ চরণের দাস, দোহাই আপনার, আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

পুণ্যপ্রভা বলিলেন, আপনার ভুল হয়েছে, আমি দেবী নহি, আমি শ্রীচরণের ভিখারিণী—আপনার দাসী।

প্রেমাঙ্কুর পুনরায় বলিলেন—আপনি জগদারাধ্যা মাতৃমূর্ত্তি।

পুণ্যপ্রভা বলিলেন, আপনার ভুল হয়েছে, আমি প্রেম-দয়া-পবিত্রতার কাঙ্গালিনী।

প্রেমাঙ্কুর পুনরায় বলিলেন,আপনি প্রেমময়ী,রসময়ী, রূপময়ী শ্রীরাধিকা।

পুণ্যপ্রভা বলিলেন, আপনার ভুল হয়েছে, আমি প্রেমহীনা, রূপহীনা, রসহীনা, মায়াহীনা, গুণহীনা, সেবিকা, সখী, সহচরী।

ভাবের মাত্রা আর একটু বাড়াইয়া প্রেমাঙ্কুর পুনরায় বলিলেন, "তুমি যে হও, সে হও, আমি তোমারি, আমি তোমারি ; চিরদিন, সুখ দুঃখে আমি তোমারি, আমি তোমারি।"

পুণ্যপ্রভা বলিলেন, "আপনার ভুল হয়েছে, আপনি আমার নহেন, আমি আপনারই—জীবনে মরণে আমি আপনারই, আমি আপনারই।" এই বলিয়া পুণ্যপ্রভা প্রেমাঙ্কুরের শ্রীচরণে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন "দেব, আমি কখনও আপনার ব্রত ভাঙ্গিব না, কখনও আপনাকে ডুবাইব না, কখনও আপনাকে মজাইব না ; আমি আপনার শ্রীচরণের দাসী হয়ে ছায়ার ন্যায় আপনার সঙ্গে থাকিব, কখনও আপনাকে আমাতে নিমগ্ন করিব না। সেবা যদি আপনার ব্রত হয়, সেই সেবাতে আমি শক্তি সঞ্চার করিব, সংযম যদি আপনার সাধন হয়, সেই সাধনে আমি সাহায্য করিব। দীপ্তির শ্মশানে আসক্তি নির্ব্বাণ করিয়াছি, রিপু বলি দিয়াছি ;—আমি কেবল আপনার সহিত মিলিয়া জগতের সেবায় লাগিবার জন্য আছি। আমি কখনও আপনার সৌন্দর্য্য খর্ব্ব করিব না। আপনি হইবেন কায়া, আমি হইব ছায়া, আপনি হইবেন ঈশ্বর, আমি হইব দাসী। শক্তিতে শক্তি মিলিবে—দয়াতে

দয়া, প্রেমেতে প্রেম, পবিত্রতায় পবিত্রতা। আমার পৃথক অস্তিত্ব থাকিবে না। স্বাধীনতা আমি জানি না, স্বাতন্ত্র্য আমি মানি না;—আপনাতে ডুবিব। আপনার ইচ্ছায় আমার ইচ্ছা মিলিয়া একাকার হইবে। আপনি "আমার" হইবেন না;—"আমার" বলিতে আমার কিছুই থাকিবে না; পুণ্যপ্রভা নিমগ্ন হইবে প্রেমের সাগরে। আপনার কোন ভয় নাই। আমি আপনার কর্ত্তব্য-পথে কখনও বাধা দিব না, বরং সংসারের সকল ভাবনা হইতে আপনাকে রক্ষা করিব। সকল কাজে আপনার সুখ বর্দ্ধন করাই আমার ব্রত। আমি প্রলোভন নহি, আমি আসক্তি নহি, আমি বিলাসিতা নহি, আমি কামনা নহি, আমি ইন্দ্রিয় নহি, আমি সংসার নহি,—আমি, আমি নহি। আমি দীপ্তিতে অনুপ্রাণিতা।"

প্রেমাঙ্কুর চাহিয়া দেখিলেন, পুণ্যপ্রভার নয়ন আকাশে উঠিয়াছে, দুনয়ন হইতে ভক্তি-মিশ্রিত অশ্রু ধারাবাহী হইয়া পড়িতেছে, কি এক অপরূপ জ্যোতি ফুটিয়াছে। দীপ্তি যেন পুণ্যপ্রভার সর্ব্বাঙ্গ গ্রাস করিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত করিয়া অপূর্ব্ব জ্যোতি খেলিতেছে;—সে জ্যোতি ভক্তি-বিশ্বাসে, পুণ্য-শান্তিতে, আরাম-আনন্দে পরিপূর্ণ। প্রেমাঙ্কুর চকিত নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন, যে মূর্ত্তি পূর্ব্বে ছিল, সে মূর্ত্তি আর নাই। পূর্ব্ব শোভা নিবিয়াছে, আর এক শোভা জ্বলিয়াছে, পূর্ব্বের রূপের স্থলে আর এক অতীন্দ্রিয় রূপ জাগিয়াছে, পবিত্রতা, ভক্তি, দয়া, সেবা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়াছে। প্রেমাঙ্কুর দেখিয়া অবাক্ হইলেন এবং অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "পুণ্যপ্রভা, সতি, সাধ্বি, তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য। আমি এতদিন পর বুঝিয়াছি, তুমি কি? আমাকে ক্ষমা করিও, আমি ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি তোমাকে লইয়াই কর্ত্তব্য-পথে যাইব। তুমি আমারি, তুমি আমারি।" পুণ্যপ্রভা মুহূর্ত্তের মধ্যে নয়ন ফিরাইলেন, এবং বিহ্বল চিত্তে বলিলেন—"সত্যই আমি তোমারি, আকাশের দেবতারা সাক্ষী, দীপ্তি সাক্ষী, দীপ্তিও তোমারি, আমিও তোমারি। আমার বলিতে যাহা, সে সকলই তোমাকে উৎসর্গ করিয়াছি।"

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মনোহর দাসের কথা।

প্রেমাঙ্কুরের ভাবান্তর দেখিয়া সেই রাত্রেই সকলে বুঝিলেন, প্রেমাঙ্কুরের মন ফিরিয়াছে। সকলের আনন্দের আর সীমা রহিল না। সেই রাত্রেই

তারানাথ সকলকে লইয়া বিধিকৃষ্ণপুর রওয়ানা হইলেন। প্রেমাঙ্কুর পরে যাইবেন, প্রতিশ্রুত হইলেন। পরদিন আনন্দিত মনে সকলে বিধিকৃষ্ণপুর পৌঁছিলেন। শান্তিশীলা, হরিগোপাল, লীলা, তিলোত্তমা সংবাদ শুনিয়া সকলেই আনন্দিত।

গ্রামে কোন সংবাদই গোপন থাকে না, এ শুভ সংবাদও কাণে কাণে দেশের হাটে বাজারে বিস্তৃত হইয়াছে। তারানাথকে সকলেই ভালবাসে, সকলেই আনন্দিত হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে বিধিকৃষ্ণপুর ছাড়িয়া সংবাদটা চরনগরে ও মাদারিপুরে পৌঁছিয়াছে। চন্দ্রকলাও আনন্দিতা হইয়াছেন, কিন্তু সংবাদ শুনিয়া মুকুন্দরাম ও ডেপুটী বাবুর মুখ মলিন হইয়াছে, অন্তর্জালা উপস্থিত হইয়াছে। উভয়ে ঘোরতর ষড়যন্ত্র করিতেছেন। উভয়ে উভয়ের বন্ধু,এক লক্ষ্য,এক গতি, এক মতি। উভয়ে যেন এক-হাড়,এক-প্রাণ। গোপনে গোপনে পুণ্যপ্রভার বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। শান্তি-শীলা বিবাহের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন, ঠিক হইয়াছে। গোপনে গোপনে বিবাহের আয়োজন হইলেও কথাটা চাপা থাকিল না। বাড়িয়া বাড়িয়া, কাণে কাণে উঠিয়া উঠিয়া কথাটা চতুর্দ্দিকে দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল। শত্রুপক্ষ ক্ষেপিল, মিত্রপক্ষ হাসিল। এক পক্ষে নিরানন্দ, অন্য পক্ষে আনন্দ।

মাদারিপুরের ডেপুটী ইহার মধ্যে এক ভয়ানক কাজ করিয়াছেন, তাঁহার মনে বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তাঁহার স্ত্রী বর্ত্তমান আছে বলিয়াই পুণ্যপ্রভা তাঁহার হইতেছেন না। এই অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি বিষপ্রয়োগে পত্নী-হত্যা করিয়াছেন এবং রাষ্ট্র করিয়াছেন যে, ওলাউঠায় হঠাৎ তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হইয়াছে! ডেপুটীর বিরুদ্ধে কোন কথা বলে, কাহার সাধ্য? বিষ-প্রয়োগ-ঘটনা চাপা পড়িয়াছে। ইহা ভিন্ন তিনি পুণ্যপ্রভার মনস্তুষ্টির জন্য এক খানি কবিতা পুস্তক ছাপাইয়া পুণ্যপ্রভার নামে এই মর্ম্মে উৎসর্গ করিয়াছেন;—"সুখে দুঃখে যাহার প্রেমমূর্ত্তি অন্তরে ধ্যান করিয়া শান্তি পাইয়াছি, যে ললনার অতুল সৌন্দর্য্যে আমি বিভোর, সেই প্রেমময়ী, সেই রূপময়ী, সেই মহীয়সী অবলাকুলের গরীয়সী পুণ্যপ্রভার শ্রীচরণে এই পুস্তক সাদরে উৎসর্গ করিলাম।" নির্লজ্জ ডেপুটী ইহাতেও ক্ষান্ত হন নাই। একখানি পুস্তক ভাল করিয়া বাঁধাইয়া, নানা উপহারের সহিত বিধিকৃষ্ণপুর প্রেরণ করিয়াছিলেন। উপহারের সহিত পুণ্যপ্রভার নামে এই পত্রখানি ছিল।

"প্রেমময়ি, তুমি জান, আমি এ সংসারে কেবল তোমাকেই চাই।

তোমাকে পাওয়ার পথে যত কণ্টক ছিল,সব অবসৃত হইয়াছে। আমি স্বৈরিণীর দল বিদায় করিয়াছি, শুনিয়া সুখী হইবে,আমার পত্নী-কণ্টক স্বর্গে গিয়াছেন ; এখন তোমাকে পাইলেই জীবন কৃতার্থ হয়। তোমার পিতার নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলাম, তিনি আমার সহিত কিছুতেই তোমাকে বিবাহ দিবেন না। সুতরাং আর উপায় নাই। তুমি যে দিন বলিবে, আমরা যাইয়া সেই দিন তোমাকে লইয়া আসিব। তোমাকে পাইবার পথে যত বিঘ্ন আছে, সকল মস্তক পাতিয়া লইব। তুমি সদয় হও, ইহাই প্রার্থনা।" উপহার ও পত্র গোপনে প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু পুণ্যপ্রভা পিতার নিকট পত্র ও দ্রব্যাদি দিয়াছিলেন। তারানাথ দ্রব্যাদি বাহকের সম্মুখে কুমারে নিক্ষেপ করিয়া পত্রখানি পদ দ্বারা দলিত করিয়াছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া দলিত সর্পের ন্যায় অপমানিত ডেপুটী ক্রোধে উন্মত্ত হইয়াছেন। নারকীর নরকের দ্বার উন্মোচিত হইয়াছে।

বলিতেছিলাম, বিবাহের আয়োজনের কথা। বিবাহের আয়োজনের মধ্যেই এই ঘটনা ঘটিয়াছে। বিবাহের সংবাদ পাওয়ার পর ডেপুটীর ক্রোধের উপর হিংসা প্রদীপ্ত হইয়াছে। এত আশার পুণ্যপ্রভা অন্যের হইবে, ইহা তাঁহার প্রাণের অসহ্য! পুণ্যপ্রভা তাঁহার জীবনের সুখস্বপ্ন ; তাঁহার আশা, কামনা, আসক্তি সকল ঐ খানে। এহেন পুণ্যপ্রভা অন্যকে পতিত্বে বরণ করিবে,ইহা শীতল রক্তে সহ্য করা তাঁহার ন্যায় অনুরাগীর পক্ষে, অথবা কামোন্মত্ত ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নহে। ডেপুটী, তারানাথ ও প্রেমাঙ্কুরের উপর নিক্ষেপ করিবার জন্য ক্রোধ এবং হিংসার বাণ শাণিত করিতেছেন।

প্রেমাঙ্কুরের একজন সহচরেরর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এ সহচর কে, কোথা হইতে আসিল ? কালীকান্তের একজন বরকন্দাজ পুণ্যপ্রভার শিরশ্ছেদের আদেশ পাইয়াছিল, পাঠকের স্মরণ আছে। পুণ্যপ্রভার কোমল শরীরে অস্ত্রাঘাত করিতে না পারিয়া, চাকরীর মায়া পরিত্যাগ করিয়া সে পলায়ন করিয়াছিল, তাহাও মনে আছে। এই বরকন্দাজ সেই ঘটনার কিছু দিন পরে একরাত্রে বিধিকৃষ্ণপুর আসিয়া সরলার দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত কথা বলিল। সরলার দাদার সহিত তাহার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। বিধিকৃষ্ণপুরের নিকটবর্ত্তী ঘরণী গ্রামে তাহার বাড়ী। বাল্যকালে উভয়ে মাদারিপুর কোন উকীলের বাসায় ভাণ্ডারী-গিরি করিত। সেই সময় হইতে উভয়ের হৃদ্যতা। মধ্যে বহুদিন নানা পারিবারিক বিপদে সংসার-

বিরাগী হইয়া মনোহর দাস দশ বৎসর বিদেশে ছিল। তার পর আবার বঙ্গদেশে আসিয়াছে। সরলার দাদার নাম প্রেমদাস, বরকন্দাজের নাম মনোহর দাস। প্রেমদাস, মনোহর দাসের মহত্ত্বের কথা শুনিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। সমস্ত কথা শুনিয়া তাহার প্রাণে বিমল আনন্দ হইল। প্রেমদাস তাহার সাধুতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিল—"তোর জন্য গরিবের মা-বাপ তারানাথ এবার রক্ষা পাইলেন।"

দুই বন্ধু ইষ্ট দেবতাকে সাক্ষী করিয়া অনেক পরামর্শ করিল। তৎপর উভয়ে মিলিয়া এক মহাজনের নিকট হইতে কতকটা টাকা কর্জ্জ করিল। সেই টাকা এই পত্রসহ, মনোহর, প্রেমদাসের দ্বারা চরনগরে কালীকান্তের নিকট প্রেরণ করিয়াছিল—"আপনার কাজে নিযুক্ত থাকিয়াও আপনার আদেশ পালন করি নাই, সে জন্য আমি অনুতাপে দগ্ধ হইতেছি। আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে কি না, আমি জানি না। আমার দ্বারা আপনার কোনই উপকার হয় নাই, সুতরাং আপনার নিকট যে বেতন গ্রহণ করিয়াছি, তাহা রাখিবার আমার আর কোন অধিকার নাই। আপনার নিকট যে বেতন লইয়াছি, এই বন্ধুর সহিত তাহা প্রেরণ করিলাম। দয়া করিয়া গ্রহণ করিয়া আমাকে ঋণমুক্ত করিবেন।" কালীকান্ত এই পত্র এবং টাকা পাইয়া বরকন্দাজের সততা দেখিয়া অবাক্ এবং বিস্মিত। বরকন্দাজকে পাওয়ার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বরকন্দাজ কোথায় আছে, কি করিতেছে, প্রেমদাস কিছুই ভাঙ্গিয়া বলে নাই। কালীকান্ত এই টাকা গ্রহণ করেন নাই, আরো দুই শত টাকা পুরস্কার দিয়াছিলেন। ঋণশোধ দিয়াও সে টাকার কিছু অবশিষ্ট ছিল। এই ঘটনার পর কয়েকদিন প্রেমদাস ও মনোহর দাস বিধিকৃষ্ণপুরেই ছিল। উভয়েই দীপ্তির সেবা শুশ্রূষায় তৎপর ছিল। পুণ্যপ্রভা এক রাত্রিতে একবার মাত্র দেখিয়াছিলেন, সুতরাং বরকন্দাজকে চিনিতে পারেন নাই। বরকন্দাজের চাকরী ত্যাগের সহিত পরিচ্ছদ বেশ ভূষাও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই সময়ে প্রেমাঙ্কুরের স্বর্গীয় চরিত্র এবং পুণ্যপ্রভার বিমল প্রেমে মনোহর দাস বিশেষ রূপ আকৃষ্ট হইয়াছিল। ইঁহাদিগের চরণ-সেবা করিয়া জীবন কাটাইবে, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। দীপ্তির এবং সরলার মৃত্যুর পর প্রেমদাসের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে আর কোন বাধা না মানিয়া কিছুদিন পরই বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া, কি এক বিষম প্রতিজ্ঞা হৃদয়ে লইয়া, চরনগরে যাইয়া মুকুন্দরামের চাকরী স্বীকার করিল। মনোহর দাস প্রেমাঙ্কুর বাবুর নিকট যাইয়া

দরিদ্র সেবা-ব্রত গ্রহণ করিল। প্রেমাঙ্কুর, মনোহর দাসকে পাইয়া, বিধাতার দান বলিয়া গ্রহণ করিলেন। মনোহর দাসের সহিত প্রেমাঙ্কুরের প্রথম সাক্ষাতের দিন এইরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। মনোহর দাস উপস্থিত হইয়া প্রেমাঙ্কুর বাবুকে প্রণাম করিলে প্রেমাঙ্কুর বলিলেন—"তুমি বিধিকৃষ্ণপুর পরিত্যাগ করিয়া আসিলে কেন?"

মনোহরদাস।—দরিদ্রের সেবা-ব্রত লইয়াছি। আপনার চরণের দাস হয়ে থাকিলে ঐ ব্রত সাধনে সক্ষম হইব, এই জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি।

প্রেমাঙ্কুর।—আমি একজন দরিদ্র ব্যক্তি, তোমাকে অর্থ সাহায্য করিতে পারিব, সে উপায় নাই, আমার এখানে কিরূপে থাকিবে?

মনোহর দাস।—আমি অর্থ-প্রত্যাশী নই, আমি সেবা-প্রত্যাশী। খাটিতে জন্মেছি, খাটিয়াই মরিব। আর কোন উচ্চাভিলাষ নাই।

প্রেমাঙ্কুর।—তুমি বিবাহ কর নাই?

মনোহর।—বিবাহ করিয়াছিলাম, সব কালের গর্ভে ভাসিয়া গিয়াছে।

প্রেমাঙ্কুর।—তোমার আর কে আছে?

মনোহর।—এ পৃথিবীতে কেহই নাই, কেবল একজন বন্ধু আছে, তাহার নাম প্রেমদাস, বিধিকৃষ্ণপুরে আপনি তাহাকে দেখিয়াছেন। সরলার দাদা বলিয়া ঐ গ্রামে সে পরিচিত।

প্রেমাঙ্কুর।—সে এখন কোথায়?

মনোহর।—সে বিধিকৃষ্ণপুর পরিত্যাগ করিয়া এখন চরনগরে আছে।

প্রেমাঙ্কুর।—তাহার এ দুর্ম্মতি কেন হইল, চিরকাল যাহাদের মঙ্গল কামনা করিয়াছে, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল কেন?

মনোহর।—তাহা জানি না। সে বলিয়াছে, যাহাদের মঙ্গল সাধন তাহার জীবনের ব্রত, তাহাদের মঙ্গলের জন্যই চরনগর গিয়াছে।

প্রেমাঙ্কুর।—তুমি আমার এখানে আসিলে কেন?

মনোহর।—আপনার ব্যবহার দেখে বুঝেছি, আপনিই আমার মনের মানুষ। আপনার জীবনের কথা শুনে বুঝেছি, আপনিই আমার মনের মানুষ। আপনারও এ পৃথিবীতে কোন আত্মীয় নাই, আমারও নাই। কিছু না পাই-লেও আপনার এখানেই থাকিব।

এইরূপ কথার পর প্রেমাঙ্কুর আর কোন কথা বলিলেন না। মনোহর দাস সেই হইতে প্রেমাঙ্কুরের সহিত মিলিয়া দরিদ্রের সেবা করিতে লাগিল।

প্রেমাঙ্কুর যখন অনাহারে থাকেন, সেও তখন অনাহারে থাকে। প্রেমাঙ্কুর যখন গ্রাম পরিদর্শনে যান, সেও তখন গ্রাম পরিদর্শনে যায়। প্রেমাঙ্কুরের সহিত সমস্ত দিন খাটে। খাটিয়া খাটিয়া ধন্য হইতেছে। প্রত্যাশা কিছুই নাই। তবে কয়েকমাস একত্র থাকায় প্রেমাঙ্কুরের হৃদয়ের গভীর ভালবাসা সে পাইয়াছে। কয়েকমাস একত্র আহার বিহার, সেবা শুশ্রূষায় প্রেমাঙ্কুরেরও অনুরাগ জন্মিয়াছে। উভয়ে উভয়ের সুখ দুঃখের বন্ধু।

সেই রাত্রে মনোহর দাস, তারানাথ ও প্রসন্নময়ীর সকল কথা শুনিয়া গভীর মর্ম্মবেদনা পাইয়াছে। ডেপুটীর অত্যাচারের কথায় তাহার মনে বিষম গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে। অত্যাচারীর অত্যাচার দমন করিতে না পারিলে বাঁচিয়া থাকিয়া প্রয়োজন কি?—এইরূপ ভাবিতেছে। আরো কত কথা ভাবিতেছে, কে তাহার সংবাদ রাখে?

একদিকে পুণ্যপ্রভার বিবাহের আয়োজন হইতেছে, একদিকে চক্রান্ত চলিয়াছে, আর একদিকে মহা আত্মগ্লানি উপস্থিত। বিধিকৃষ্ণপুরের নৌকা চলিয়া যাওয়ার পর হইতে প্রেমাঙ্কুরের মনে কেমন একটা উদাস ভাব উপস্থিত হইয়াছে। মনোহর প্রথমে ভাবিয়াছিল, ইহা বিচ্ছেদের লক্ষণ; কিন্তু পরদিন সে সন্দেহ দূর হইয়াছে। সমস্ত রাত্রি প্রেমাঙ্কুরের নিদ্রা হয় নাই, ঘরের বাহিরে আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কেবল ভাবিয়াছেন। প্রাণে দারুণ যন্ত্রণা—"কি করিলাম, কি করিলাম! এত অল্পেই ব্রতভঙ্গ করিলাম?" হৃদয়ে কেবল এই চিন্তা। প্রাতে মনোহর দেখিল, প্রেমাঙ্কুরের চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, মুখে গাঢ় কালিমা, সর্ব্ব শরীর যেন উৎসাহ ও উদ্যম হীন! যে মুখে সদা হাসি, সেই মুখ গভীর নিরানন্দে পরিম্লান। প্রেমাঙ্কুর যে অন্যের দুঃখে সদা কষ্ট পাইতেন, তাহা মনোহর জানিত। গরিবের দুঃখ কাহিনী শ্রবণ করিলে তিনি ঠিক থাকিতে পারিতেন না, তাহা সে বহুবার দেখিয়াছে। যে দেশের সহস্র সহস্র লোক অভাবের তীব্র আঘাতে নিত্য নিষ্পেষিত, সে দেশের লোকের হাস্য পরিহাস করা বা বাবুগিরি করা, বা নিজের জন্য অধিক ব্যয় করাকে প্রেমাঙ্কুর পাপের কার্য্য মনে করেন, তাহা সে জানে। দেশের লোক দুঃখী গরিবের কথা ভুলিয়া মদ্য ব্যভিচারে, নৃত্য তামাসায়, পোষাক পরিচ্ছদে বা গহনা-গাটিতে লক্ষ লক্ষ টাকা অম্লান চিত্তে ব্যয় করিতেছে, এ জন্য সর্ব্বদাই তিনি দুঃখ করিতেন; কিন্তু ইহা সত্বেও প্রেমাঙ্কুরের মুখে শোভা বা কমনীয়তা, প্রফুল্লতা বা প্রেমবিহ্বলতা

ছিল। চেহারায় এমন কিছু ছিল, যাহা দেখিলে মানুষ আকৃষ্ট না হইয়া পারিত না। এমন কোন অব্যক্ত জিনিসে বদন রঞ্জিত থাকিত, যাহা দেখিলে ঘোর শত্রুও প্রেমাঙ্কুরকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। কিন্তু আজ সে শোভায় যেন গাঢ় কালী পড়িয়াছে। প্রেমাঙ্কুর যেন মরণের কোল হইতে প্রাতে উঠিয়া আসিয়াছেন।

আজ প্রেমাঙ্কুরের এই মলিন চিত্র দেখিয়া মনোহরের প্রাণ অস্থির হইল। কি জানি কেন, সে ঠিক থাকিতে পারিল না। সে প্রেমাঙ্কুরের চরণে প্রণাম করিয়া বলিল, "আজ আপনাকে এরূপ দেখিতেছি কেন?"

মনোহরকে দেখিয়াই প্রেমাঙ্কুরের হৃদয়টা তরল হইয়াছিল, কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিলেন—"দেখ মনোহর, তুমি আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করে থাক, তোমার ভালবাসা কখনও ভুলিব না। আমি আজ কলুষিত-চিত্ত হয়েছি, আমার এখানে আর কি আশায় তুমি থাকিবে? তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর। আমি কিছুদিন নির্জ্জন সাধন করিব।"

প্রেমাঙ্কুর কেন এরূপ কথা বলিতেছেন, মনোহর দাস তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। সে বলিল, আমি আপনাকে পরিত্যাগ করে কোথায় যাইব? আমার আর দাঁড়াবার ঠাঁই নাই। আপনি যাহাই হউন, আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিব না।

প্রেমাঙ্কুর বলিলেন—"দেখ, আমি পবিত্রতা হারাইয়াছি। তুমি সাক্ষী, আকাশের চন্দ্র সাক্ষী, আমি ব্রত ভাঙ্গিয়া কাল পাপ-নরকে ডুবিয়াছি। তোমাকে একান্ত অনুরোধ, আমাকে স্পর্শ করিও না। আমাকে ছুঁলে তুমিও অপবিত্র হবে।"

এই কথা বলিয়া প্রেমাঙ্কুর উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন কাঁদিয়া কাটাইলেন। অনুতাপে যেন অন্তর দগ্ধ হইতেছে। সমস্ত দিন একটু জলও গ্রহণ করিলেন না। মনোহরও কিছুই খাইল না। প্রেমাঙ্কুরের পার্শ্বে বসিয়া কেবল মুখের দিকে চাহিয়া ভাব দেখিতেছে। মনোহর বুঝিতেছে না, কেন এরূপ হইতেছে।

রাত্রি আসিল। আবার আকাশে চাঁদ উঠিল। বিমল চাঁদের কিরণ দেখিয়া প্রেমাঙ্কুরের হৃদয় আরো অস্থির হইল। রাত্রে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া প্রেমাঙ্কুর মনোহরকে বলিতে লাগিলেন—"দেখ ভাই মনোহর, এই

চাঁদই আমাকে নরকে ডুবাইয়াছে? এই চাঁদই, কাল পুণ্যপ্রভার মুখে অলৌকিক শোভা ঢালিয়া,আমার মন কাড়িয়া আমাকে অজ্ঞান করিয়াছিল! হায়, আমি কি মানুষ? আমার ন্যায় নরাধম কি আর আছে? কঠোর ব্রত পরিত্যাগ করিয়া রমণীর প্রেমে বদ্ধ হইলাম? অসীম প্রেম-জলধির সুস্নিগ্ধ বারি পরিহার করিয়া আজ ক্ষুদ্র পঙ্কিল কুণ্ডে মাথা ধুইলাম? আমার ব্রত, অসংখ্য নরনারীর সেবা করা; তা কি ক্ষুদ্রতায় সিদ্ধ হইবার উপায় আছে? মনোহর, ভাই, আমাকে ছুঁয়ো না, ঐ নিষ্ঠুর চাঁদ আমাকে মজাইয়াছে!”

এই কথা বলিয়া আবার প্রেমাঙ্কুর কাঁদিতে লাগিলেন। বস্ত্রে মুখ আবৃত করিলেন, মনোহর এতক্ষণে বুঝিল, কি জন্য এই ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। সাধ্যমত সে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল যে, ইহাতে কোনই অপরাধ হয় নাই; সকল ধার্ম্মিক চূড়ামণিই এরূপ করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রেমাঙ্কুর বুঝিতেছেন না। উভয়ের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে।

প্রেমাঙ্কুর।—মানব-সমাজে বাস করার আমি নিতান্ত অযোগ্য। যাহার সংযম সাধন হয় নাই, যাহার ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য বিদূরিত হয় নাই, সমাজ তাহার মহা বিঘ্নের সোপান। আমাকে ছাড়, আমি গহন বনে চলে যাই।

মনোহর।—আসক্তি সর্ব্বত্র, যে সংসার ছেড়ে বনে যায়, বনেই তাহার আসক্তি। আসক্তির মধ্যে থাকিয়াই আসক্তি নির্ব্বাণ করিতে হয়।

প্রেমাঙ্কুর।—যে তাহা না পারে, সে কি করিবে?

মনোহর।—সে কেবল সেবা-ধর্ম্ম লইয়া থাকিবে। সেবার ন্যায় আর ধর্ম্ম নাই। খাটিতে খাটিতে মানুষের আসক্তি নির্ব্বাণ হয়।

প্রেমাঙ্কুর।—সেবা-ধর্ম্ম কাহাকে বল?

মনোহর।—সেবা-ধর্ম্ম,অর্থাৎ দাম্পত্য ধর্ম্ম। পরিবার-বন্ধন ভিন্ন আসক্তি-নির্ব্বাণের আর উপায় নাই। সংসারই আসক্তি-নির্ব্বাণের স্থান। আসক্তি যাহার নাই, তাহার নির্ব্বাণ হইবে কি? প্রথমতঃ কোন বস্তুর প্রতি আসক্ত হইতে হইবে, তারপর সেই আসক্তিকে নির্ব্বাণ করিতে হইবে। ঠেকিয়া তবে শিখিতে হইবে। আসক্তি কাহাকে বলে, আসক্ত না হইলে তাহা আপনি কেমনে জানিবেন?

প্রেমাঙ্কুর।—জানিয়া কাজ কি?

মনোহর।—জানিয়া কাজ, ধর্ম্ম-লাভ। দাম্পত্য-প্রেম ভিন্ন ধর্ম্মলাভ হয় না। প্রেম-সাধনের প্রথম কথা—আসক্তি। প্রেম-সাধনের আদি শিক্ষা,

"বিবাহ।" একজনকেও যে হৃদয়ে ধারণ, হৃদয়ে রোপণ, হৃদয়ে পোষণ, হৃদয়ে নিমজ্জন, হৃদয়ে একীকরণ করিতে পারে নাই, সেবা-ধর্ম্ম, প্রেমের ধর্ম্ম তাহার নিকট কেবল কল্পনা।

প্রেমাঙ্কুর।—তুমি এসকল কথা কোথায় শিখিলে?

মনোহর।—আমি অবস্থার পীড়নে আজ সেবা-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, আমি স্ত্রী-পুত্র, পিতা-মাতা সকলকে গঙ্গায় ভাসাইয়া দশ বৎসর বিদেশে ছিলাম। বঙ্গদেশে ফিরিতে আর ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু আমার গুরু উপদেশ দিতেন, "যাহাতে ইচ্ছা নাই, তাহাই করিতে হইবে। স্বেচ্ছার পথে যাহারা পাদচারণা করে, তাহারা স্বেচ্ছাচারী, তাহারা মায়াবদ্ধ জীব, তাহারা আসক্তির হাত হইতে কখনও নিষ্কৃতি পাইবে না। আর যাহারা আসক্তি ডুবাইতে চায়, তাহাদিগকে, যাহাতে রুচি নাই, মতি নাই, বাসনা নাই, কামনা নাই, সেই পথেই যাইতে হইবে। নিষ্কাম ব্রত না শিখিলে ধর্ম্ম লাভ হয় না। বাসনা ডুবাইতে হইলে ইচ্ছার বিরুদ্ধ পথে যাইতে হয়।" তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম বুঝিয়াই আমি বঙ্গদেশে আসিয়াছি। কালীকান্তের সংসারে আমার চাকরী গ্রহণও ইচ্ছার বিরুদ্ধে গমন। আমি ইচ্ছাকে বলি দিবার জন্য বহুদিন চেষ্টা করিতেছি, আজও কৃতকার্য্য হই নাই। ইচ্ছাকে বলি না দিলে ধর্ম্ম লাভ হইবে না, আমার গুরুদেব বলিয়াছেন। কত দিন কর্ম্মভোগ আছে, জানি না।

প্রেমাঙ্কুর।—তোমার গুরুদেব কোথায় আছেন? আর কি তাঁহার দেখা পাইবে না?

মনোহর দাস।—আমার ইচ্ছা নির্ব্বাণ হইলে তিনি দেখা দিবেন, নচেৎ নহে।

প্রেমাঙ্কুর।—কোথায় দেখা দিবেন?

মনোহর দাস।—তাহা বলেন নাই।

প্রেমাঙ্কুর।—তুমি অতি মহৎ ব্যক্তির উপদেশ পাইয়াছ, বাস্তবিকও ইচ্ছার বিনাশ ভিন্ন ধর্ম্মের উদয় হয় না। কি করিলে, মনোহর, ইচ্ছার বিলোপ হয়, বলত?

মনোহর।—আমার গুরুদেব বলিয়াছেন, যাহা তোমার মন করিতে চায়, কখনও তাহা করিবে না। এইরূপ করিলে সংযম শিক্ষা হইবে। সংযম শিক্ষা হইলে ইচ্ছাদমন সহজ হইবে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলাই তখনকার কাজ। ইচ্ছাকে খর্ব্ব করিতে করিতে তবে ইচ্ছার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ডুবিবে। প্রিয় যাহা, তাহা ভুলিলে তবে শ্রেয় যাহা, তাহা পাওয়া যায়। ইচ্ছা মানুষকে কেবল প্রিয়

ধস্তর পথেই লইয়া যায়। এই জন্যই ইচ্ছাকে বিনাশ করিতে তিনি বলেন। ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট হইলে তবে অদ্বৈত জ্ঞানের উদয় হওয়া সম্ভব। মানুষের ইচ্ছা বিনাশ হইলে, তবে ভগবদিচ্ছার প্রকাশ হয়। অদ্বৈত জ্ঞানের উদয় না হইলে প্রকৃত ধর্ম্ম লাভ হয় না।

প্রেমাঙ্কুর।—উহা ত জ্ঞানীর ধর্ম্ম। প্রেমের ধর্ম্ম কি?

মনোহর।—প্রেমের ধর্ম্মও উহাই। সীমা হইতে সাধন আরম্ভ করিয়া শেষে অসীমে প্রেমের পরিণতি হইবে। সীমা, পবিবার।

প্রেমাঙ্কুর।—তোমার গুরুদেব পরিবার সাধন করিতে বলেন কি?

মনোহর।—তিনি কেবল ইচ্ছার রিরুদ্ধে যাইতে বলেন। যে পরিবার চায়, তাকে পরিবার ছাড়িতে, এবং যে বৈরাগী, তাহাকে পরিবার গ্রহণ করিতে বলেন।

প্রেমাঙ্কুর।—তোমাকে কি আবার বিবাহ করিতে বলেছেন?

মনোহর।—আবার বিবাহ করাকে তিনি অধর্ম্ম বলেন। যে ইচ্ছার বিরুদ্ধ সাধন একবার হইয়াছে, তাহা আর করিতে হইবে না।

প্রেমাঙ্কুর।—ক্রমাগতই যদি মানুষের বিবাহ করিতে ইচ্ছা হয়, তবে?

মনোহর।—একবার ইচ্ছাকে দমন করিলে আর সে ইচ্ছার উদয় হইবে না, ইহাই নিয়ম, তিনি বলেন।

প্রেমাঙ্কুর।—ক্রমাগতই যদি বিবাহ করিতে অনিচ্ছা থাকে, তবে কি করিবে?—ক্রমাগতই কি বিবাহ করিবে?

মনোহর।—এ কথার উত্তরও উহাই, যে ইচ্ছা একবার খর্ব্ব হয়, সে ইচ্ছার আর উদয় হয় না।

প্রেমাঙ্কুর।—যাহার হয়, সে কি করিবে?

মনোহর।—তাহার ধর্ম্ম লাভ হইবে না, গুরুদেব বলেন। গুরুদেব বলেন, যে ইচ্ছা দমন করিবে, সে ইচ্ছার কদাপি আর উদয় হইবে না।

প্রেমাঙ্কুর।—তুমি কি তাহা প্রত্যক্ষ করেছ?

মনোহর।—অনেকবার করেছি।

প্রেমাঙ্কুর।—আমার পক্ষে কি বিধি?

মনোহর।—যদি ধর্ম্ম-জীবন চান, ইচ্ছার বিরুদ্ধেই চলিতে হইবে। বিবাহ করিতে আপনি অনিচ্ছুক, সুতরাং আপনাকে বিবাহ করিতেই হইবে।

প্রেমাঙ্কুর বলিলেন, দেখ, মনোহর, বিবাহকে বাল্যকাল হইতে আমি

বিষের ন্যায় জ্ঞান করিয়া আসিতেছি। কতস্থানে দেখেছি,বিবাহ করেই মানুষ চিরদিনের জন্য সৎপ্রবৃত্তি বিসর্জ্জন দিয়া নরকে ডুবেছে। বিবাহ করিলেই মানুষ ঘোরতর স্বার্থপর হয়। কেবল স্বার্থ সাধনই যেন বর্ত্তমান সময়ের মানুষের উদ্দেশ্য। দেখে কত অশ্রুপাত করেছি, বিধাতাই জানেন! আসক্তিতে আসক্তিই বৃদ্ধি হয়,বিবাহের পর,স্ত্রীবিয়োগ হলে মানুষ পুনরায় বিবাহ করেই সুখী হতে চায়। পৃথিবী এই রূপে স্বার্থপরতায় ডুবিতেছে। আমি বিবাহকে এই জন্য বিষ বলে বুঝেছি। এখন যদি আমাকে ঐ কথা ভাবিতে হয়, আমার পক্ষে মরণ সহস্র গুণে ভাল।

মনোহর।—দেশের অবস্থা সকলই জানি। আপনি কি জন্য দয়া ও পবিত্রতাকে সম্বল করেছেন, তাহাও বুঝেছি; কিন্তু প্রেম সাধন ভিন্ন ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশের আর পথ নাই। এই আসক্তির পথ ধরে অনাসক্তির পথে যেতে হবে। বিশেষতঃ ইচ্ছাকে না ডুবাইলে অদ্বৈত প্রেম লাভ অসম্ভব। আপনি বিজ্ঞ,সকলই বুঝিতেছেন। ভাবিয়া ও প্রার্থনা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করুন, ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা। অধিক আর কি বলিব?

প্রেমাঙ্কুর সামান্য লোক মনোহরের নিকট এই সকল কথা শুনিয়া অবাক্ হইলেন। বুঝিলেন, লোকটী ছদ্মবেশী!

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিপদের উপর বিষম বিপদ।

ইচ্ছার বিরুদ্ধে পদনিক্ষেপ করা এবং মৃত্যু, মানুষের পক্ষে একই। মনোহরের কথাগুলির যৌক্তিকতা প্রেমাঙ্কুর বুঝিয়াছেন, কিন্তু বাল্যকাল হইতে যে পথকে ঘৃণা করিয়াছেন, সে পথে কিরূপে যাইবেন? মনের মধ্যে তুফান খেলিতেছে। একদিন, দুদিন, তিন দিন এই ভাবেই গেল, আহারে মতি নাই, বিহারে মন নাই, কর্ত্তব্যে স্পৃহা নাই, শয়নে রুচি নাই, কয়েকদিন প্রেমাঙ্কুর নির্জ্জনে পড়িয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে লাগিলেন। যে সময়ে তাঁহার দুর্ভিক্ষ-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করার কথা ছিল, সে সময় অতীত হইল। তিনি যাই যাই করিয়াও যাইতে পারিতেছেন না। মহা মোহ যেন তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। মনোহর বুঝাইতে ক্রটী করিতেছে না, কিন্তু কর্ত্তব্য কি প্রেমাঙ্কুর বুঝিতে পারিতেছেন না। সৎ এবং অসৎ বুদ্ধির ভীষণ সংগ্রাম

চলিয়াছে। কয়েক দিন পর বিধিকৃষ্ণপুর হইতে এই পত্রখানি আসিল। পত্রখানির শিরনামায় প্রেমাঙ্কুরের নাম। প্রেমাঙ্কুর পত্র খুলিয়া দেখিলেন, পত্রখানি পুণ্যপ্রভার লেখা। প্রেমাঙ্কুর পত্র পড়িতে লাগিলেন—

"আপনাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব, ভাষায় এমন শব্দ নাই। আমার হৃদয় আজ আচ্ছন্ন এবং অবসন্ন। আপনাকে কি লিখিব? বাল্যকাল হইতে যে বিপদের সহিত সংগ্রাম করিয়া আসিতেছি, সেই বিপদ ক্রমেই ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতেছে। এই সময়ে আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

শুনিবেন কি যে, কি বিপদে পড়িয়াছি? আপনাকে কি করিয়া সংবাদ দিব যে, আমার পিতৃদেব আর ইহ সংসারে নাই! কাল তিনি মাদারিপুর হইতে হাট করিয়া বাড়ী আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে তাঁহাকে কে যেন হত্যা করিয়াছে!! এই দারুণ সংবাদ পাইয়া মা কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, সংবাদ পাইতেছি না! বিধিকৃষ্ণপুরে হাহাকার উঠিয়াছে—আমি অকূল পাঁতারে ভাসিতেছি। দীপ্তির মাতা আজ প্রাতে কুমারে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন! আপনি দয়া করিয়া,আমার প্রতি সদয় হইয়া, অবশ্য অবশ্য একবার আসিবেন।

আপনার স্নেহের পুণ্যপ্রভা।"

এই পত্র পাওয়ার পর প্রেমাঙ্কুরের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া বজ্র পড়িল; চতুর্দ্দিক যেন শূন্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পত্রখানি মনোহর দেখিয়া বুঝিল, মুকুন্দরাম এবং ডেপুটীর চক্রান্তেই এই সকল অত্যাচার হইতেছে। মনোহর যেন আগুনের ন্যায় উষ্ণ হইয়াছে। সে আর সহ্য করিতে পারিতেছে না। প্রেমাঙ্কুরকে একবার বিধিকৃষ্ণপুর যাইতে বারম্বার অনুরোধ করিল, কিন্তু প্রেমাঙ্কুর শূন্য পুরীতে যাইয়া কি দেখিবেন, কি করিবেন, ভাবিয়া ঠিক পাইলেন না। মনোহরের সহিত অনেক পরামর্শ করিলেন, এবং অনেক কথা বলিলেন। শেষে বলিলেন—"দেখ মনোহর, এই অবস্থাতে আমার পক্ষে বিধিকৃষ্ণপুর যাওয়া ভাল নহে, সমাজ এবং ধর্ম্ম, কিছুই আমার এ গমন অনুমোদন করিবে না। পাপী ত হইয়াছি, অপরাধ ত করিয়াছিই, কিন্তু আর পাপের বোঝা বৃদ্ধি করিতে পারি না। এখন তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর, আমার কর্ত্তব্য আমি করি। তুমি একবার বিধিকৃষ্ণপুর যাও। পুণ্যপ্রভাকে এই পত্রখানি দিও। আমি একবার দেবী প্রসন্নময়ীর অনুসন্ধানে বহির্গত হই। তাঁহাকে যদি পাওয়া যায়, তবে বিধিকৃষ্ণপুরে ফিরিব, নচেৎ—"

প্রেমাঙ্কুরের কথা শুনিয়া মনোহরের সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইল, বিস্ময়ের সহিত বলিল "নচেৎ কি করিবেন ?"

প্রেমাঙ্কুর।—এ মুখ আর পুণ্যপ্রভাকে দেখাইব না। আমি পুণ্যপ্রভার মলিন মুখ কিছুতেই দেখিতে পারিব না।

মনোহর।—এই বিপদের দিনে আপনাকে দেখিলে তিনি নববল পাইবেন। এই পরীক্ষার সময় সাহায্য করা আপনার একান্ত উচিত।

প্রেমাঙ্কুর।—আমার যাওয়া সমাজ ও ধর্ম্মানুমোদিত নহে। পরীক্ষার হাত পুণ্যপ্রভা এড়াইতে পারিবে, আমার বিশ্বাস আছে। এ অবস্থায় আমার পক্ষে বিধিকৃষ্ণপুর যাওয়া অসঙ্গত। তুমি যাইয়া এই সময়ে পুণ্যপ্রভার সহায় হও, এই ত সেবা-ধর্ম্ম পালনের প্রকৃত সময়।

মনোহর আর তর্ক করিল না। প্রেমাঙ্কুর নিম্নলিখিত পত্রখানি মনোহরের হাতে দিয়া মনোহরকে বিদায় করিলেন এবং আপনিও সেই দিনই দুর্ভিক্ষ-কেন্দ্র পরিত্যাগ করিলেন।

"পুণ্যপ্রভা, তোমার পত্র পাইয়া কিরূপ ব্যথিত হইলাম, একমাত্র সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরই জানেন। এই বিপদের দিনে তোমার সহায় হইতে পারিলে কৃতার্থ হইতাম, কিন্তু তাহা সমাজ ও ধর্ম্মানুমোদিত নহে। এ সকল কথা তুমি অবশ্যই বুঝিতেছ। বিধিকৃষ্ণপুরের শূন্য পুরীতে আমার যাওয়া বিধেয় নহে। তুমি দেব সদৃশ বীর তারানাথ এবং সাধ্বী দেবী প্রসন্নময়ীর কন্যা, তোমার নিকট কোন বিপদই বিপদ নয়। আমার বিশ্বাস আছে, তুমি কোন অবস্থাতেই বিচলিতা হইবে না। ধর্ম্মকে যে জন আশ্রয় করে, ধর্ম্মই তাহাকে সকল বিপদে রক্ষা করেন। বিশেষতঃ বিধিকৃষ্ণপুরে এখনও পুণ্যবতী শান্তিশীলা, সাধু বেণীমাধব ও নীলকান্ত আছেন। তাঁহারা সকল বিপদে তোমার সাহায্য করিবেন। আমি চলিলাম—কোথায় চলিলাম, এখন জিজ্ঞাসা করিও না। তোমার মাতার অনুসন্ধানই প্রধান কাজ। তাঁহাকে পাইলেই বিধিকৃষ্ণপুর পৌঁছিব। মনোহরকে তোমার নিকট পাঠাইলাম। মনোহর তোমার জীবন-দাতা। বিপদে তোমাকে রক্ষা করিতে মনোহর বিধাতার প্রেরিত ছদ্মবেশী দূত। সকল অবস্থায় মনোহর তোমাকে রক্ষা করিবে ও তোমার সেবা করিবে। ইহাকে বিশ্বাস করিবে। চরনগরের যে বরকন্দাজ তোমার শির লইবার আদেশ পাইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, এই মনোহর সেই বরকন্দাজ। ইহাকে প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করিবে। পিতা মাতার গৌরব

রক্ষা করা এখন তোমার প্রধান কাজ, তাহা সর্ব্বপ্রযত্নে করিবে। বিপদে ধৈর্য্য ও সাহস তোমার চির সহায়, কোন ভয় নাই, বিধাতা তোমাকে অবশ্য রক্ষা করিবেন। আমার প্রতি বিরক্ত হইও না। তোমার স্নেহের—প্রেমাঙ্কুর।"

মনোহর প্রেমাঙ্কুরকে বিদায় দিয়া, এই পত্র লইয়া বিধিকৃষ্ণপুর যাত্রা করিল। ক্রোধে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছে, অত্যাচারীর মস্তক ছেদন করিতে একান্ত ইচ্ছা। নিকটবর্ত্তী এক ডাকঘরে ডেপুটী বাবুর নিকট এই বিনামী পত্রখানি দিয়া যথা সময়ে বিধিকৃষ্ণপুর পৌঁছিল ;—"আমি ধর্ম্মের খাতিরে আদেশ করিতেছি, সপ্তাহের মধ্যে তুমি মাদারিপুর পরিত্যাগ করিবে। যদি এই আদেশ পালন না কর, অষ্টম দিনে তোমার রক্তে আমি তর্পণ করিয়া তারানাথের হত্যার ও তাঁহার কন্যার প্রতি অমানুষী অত্যাচারের প্রতিশোধ তুলিব। তোমাকে অবসর দিলাম, এই অবসরে তুমি যদি নিজের প্রাণ রক্ষা না কর, আমার কোন অপরাধ নাই। জানিবে, এই পত্রের প্রতি পংক্তি ধ্রুব সত্য। জানিও, তোমার ন্যায় নরাধমের রক্ত পান করিতে এদেশে লোক আছে। এই পৃথিবী উল্টিলেও আমার প্রতিজ্ঞার অন্যথা হইবে না।"

এই পত্র পাওয়ার পরই ডেপুটী স্থান পরিত্যাগ করিবার জন্য টেলিগ্রামে গবর্ণমেণ্টের অনুমতির প্রার্থনা করিলেন। তিনি ভীত ব্যক্তি, মাদারিপুর থাকিতে বড়ই ভয় হইতে লাগিল। কিন্তু জীবনের শেষ কাজ এখনও বাকী। তারানাথ এক অন্তরায় ছিল, তাহা দূর হইয়াছে, দেবী প্রসন্নময়ীও আর দেশে নাই। ভাবিতেছেন, এ আবার কোন্ দৈত্যের অভ্যুদয়? এখন কিরূপে পুণ্যপ্রভাকে লইয়া পলায়ন করা যায়, মনে কেবল এই চিন্তা। পরামর্শ করিবার একমাত্র উপযুক্ত বন্ধু মুকুন্দরাম। অবিলম্বে মুকুন্দরামের সহিত মিলিত হইলেন। মুকুন্দরামের সঙ্গে ভৃত্য প্রেমদাস আছে। প্রেমদাস মুকুন্দরামের মন যোগাইয়া এখন সকল ভৃত্য অপেক্ষা অধিক বিশ্বাসী হইয়াছে। ডেপুটীর বজরায় মুকুন্দরাম ও ডেপুটীর সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে।

ডেপুটী সর্ব্বপ্রথম বিনামা পত্রখানি মুকুন্দরামকে দেখাইলেন, তারপর বলিলেন—"এখন কর্ত্তব্য কি?"

মুকুন্দরাম।—কর্ত্তব্য আর নাই। যেদিন গবর্ণমেণ্টের অনুমতি পাইবেন, সেই দিনই আমি পুণ্যপ্রভাকে উদ্ধার করিয়া আপনার শ্রীচরণে উৎসর্গ করিব।

ডেপুটী।—আপনার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। ঈশ্বর কি আমার বাসনা পূর্ণ করিবেন?

মুকুন্দরাম।—আপনার সুকৃতি এবং আমার হাত যশ, অবশ্যই কৃতকার্য্য হইব।

ডেপুটী।—এই পত্র কাহার লেখা, আপনি অনুমান করেন?

মুকুন্দরাম।—বুঝিতেছি না, তবে আমার মনে হয়, প্রেমাঙ্কুরের লেখা হইবে। সেই লোকটাই এখন প্রধান অন্তরায়। সে লোকটার হাত এড়াইতে পারিলেই হয়।

ডেপুটী।—শুনেছি, সে অত্যন্ত ধার্ম্মিক লোক, সে কি এরূপ পত্র লিখিতে পারে?

মুকুন্দরাম।—হিংসার উত্তেজনায় সবই পারে।

ডেপুটী।—তার হাত হতে রক্ষার উপায় কি?

মুকুন্দরাম।—তাহাকে হত্যা করার জন্যও বিধিপূর্ব্বক চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোন লোক তাহার গায়ে হাত দিতে চায় না। লোকটা এবারগরিবের "মা-বাপ" হয়েছে; কোন লোক তার বিরুদ্ধে যেতে রাজি হয় না।

ডেপুটী।—তবে উপায়?

মুকুন্দরাম।—এখনও উপায় আছে। আজ আবার লোকের জন্য চেষ্টা করিব।

ডেপুটী।—আমার সকল আশা ভরসা আপনি,সকল ভার আপনার উপর।

মুকুন্দরাম।—সে জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই; আমি মুকুন্দরাম শর্ম্মা, আমার অসাধ্য কিছুই নাই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। সব ঠিক করিব।

এই সকল কথা প্রেমদাস বজরার পার্শ্বের কামরায় থাকিয়া শুনিয়াছিল। সে প্রমাদ গণিল। সহ্য করিয়া এতদিন সে ছিল, কিন্তু আর পারে না। গুপ্ত প্রতিজ্ঞা আজই প্রতিপালন করিবে, ভাবিল। ভাবিল—"এত করেও এই হতভাগ্যের মন ফিরাইতে পারিলাম না, অবশেষে হাত কলঙ্কিত করিতেই হইল!" সে সমস্ত দিন অন্যমনস্ক ভাবে কাটাইল,—মুখে হাসি নাই,এক ভীষণ মূর্ত্তি!

সন্ধ্যার পর, বজরার পায়খানার ঘরে যখন মুকুন্দরাম যাইতেছিল, এমন সময়ে প্রেমদাস মুকুন্দরামের গলদেশে এক ভীষণ অস্ত্রাঘাত করিল। এক আঘাতেই মুকুন্দরাম পড়িয়া গেল, তখন প্রেমদাস আর এক আঘাত করিয়া ঐ অস্ত্র দ্বারা নিজের গলদেশ ছিন্ন করিল। সন্ধ্যার পর বজরায় দুই চারিবার শব্দমাত্র হইল। সকলে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, দুইটী লোকই মৃতবৎ পড়িয়া

ছটফট্ করিতেছে। এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া ভয়ে ডেপুটীর মাথা ঘুরিয়া গেল। তাঁহার সকল আশায় যেন ছাই পড়িল! ডেপুটীর নৌকায় হত্যাকাণ্ড, মহা হুলস্থুল ব্যাপার! পরদিন দেশময় রাষ্ট্র হইল যে, প্রেমদাস, মুকুন্দরামকে হত্যা করিয়া, নিজে আত্মহত্যা করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। প্রেমদাসের এই প্রতিশোধের সংবাদে দেশে যেন একটা তাড়িতপ্রবাহ ছুটিল। মনোহর এই সংবাদ শুনিয়া মনে মনে ভাবিল, প্রেমদাস মানুষ, না দেবতা? ডেপুটীর প্রাণ ভয়ে জড়সড়। তিনি টেলিগ্রামের উপর টেলিগ্রাম করিয়া, গবর্ণমেণ্টের অনুমতি আনাইয়া, সাত দিনের মধ্যেই মাদারিপুর পরিত্যাগ করিলেন। এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডের পর মাদারিপুরে হুলস্থূল ব্যাপার। বিধিকৃষ্ণপুরে পুণ্যপ্রভা, বেণীমাধব, প্রেমদাসের বৃদ্ধ পিতা মাতা শোকে জর্জ্জরিত! সে দুঃখের কাহিনী কে লিখিতে পারে?

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পরীক্ষার উপর পরীক্ষা—মহা পরীক্ষা।

ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে আর একটী ঘটনা ঘটিয়াছে। ধলামেঞার বংশধরের চক্রান্তে, একটী ফৌজদারী মোকদ্দমায়, হরিগোপালের কর্ম্মচারী চক্রবর্ত্তীরও মেয়াদ হইয়াছে। বিপদের সময় বিপদ ভিন্ন আর কি আসিবে? চতুর্দ্দিক হইতে বিপদ উপস্থিত হইয়া সকলকে অস্থির করিতে লাগিল। চরনগরে চন্দ্রকলার মনের মানুষ সেই ডাক্তার বাবু আসিয়া কর্ত্তৃত্বের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বিষয় ঋণে জড়িত, এই এক মোকদ্দমার ব্যয়ে দুই ষ্টেট এমন ঋণে ডুবিয়াছে যে, আর রক্ষার উপায় নাই। তার উপরে লুটপাট্ বিষয় আত্মসাৎ করিতে মুকুন্দরামের চেষ্টা ছিল, কিন্তু ততদূর কৃতকার্য্য হন নাই। বিধিকৃষ্ণপুরে, হরিগোপালের বিষয় রক্ষার ভার নীলকান্ত পাইয়াছেন। শান্তিশীলা এই দারুণ বিপদে পুণ্যপ্রভাকে কোলে করিয়া রক্ষা করিতেছেন।

শব-ব্যবচ্ছেদ-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হওয়ার পর, বেণীমাধব ও নীলকান্ত, মাদারিপুর হইতে দীপ্তির মাতা ও তারানাথের শরীর বিধিকৃষ্ণপুরে আনয়ন করিলেন। পিতৃহীনা পুণ্যপ্রভা এবং কন্যাহারা বিপত্নীক বেণীমাধবের অবস্থা পাঠক ভাবিতে পারিতেছেন কি? পুণ্যপ্রভা আজ কাঁদিয়া২ আকাশ বিদীর্ণ করিতেছেন। বেণী-

মাধবের নীরব গভীর শোকোচ্ছ্বাস সকলকে আচ্ছন্ন করিতেছে। এই দুই ঘটনায় বেণীমাধবের নবজীবন আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে ছিলেন সৎ, এখন হইতে চলিলেন ভক্ত। বিধিকৃষ্ণপুর দারুণ শোকে সমাচ্ছন্ন। তারানাথের মৃতদেহের সম্মান করিতে বিধিকৃষ্ণপুরের এবং নিকটবর্ত্তী সকল গ্রামের লোক সমবেত হইয়াছে। দীনদুঃখীদিগের আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিক পূর্ণ। হা হুতাশ ভিন্ন কাহারও মুখে কোন কথা নাই, সকলের চক্ষে বিষাদ-ধারা, সকলেই ভাবিতেছে এবং বলিতেছে—"হা বিধি, এমন ঘটনাও তোমার মঙ্গলময় রাজ্যে ঘটে!" দলে দলে লোক আসিয়া তারানাথের শবের পদধূলি লইতেছে, দলে দলে লোক আসিয়া পুষ্প বর্ষণ করিতেছে। তারানাথের ও দীপ্তির মাতার মৃত দেহ অতি সমারোহের সহিত দীপ্তির শ্মশানের পার্শ্বে চিতায় উঠিল। বিষাদিনী পুণ্যপ্রভার চক্ষের সম্মুখে এত ভালবাসাময় পিতার দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইল! লীলা ও তিলোত্তমা পুণ্যপ্রভাকে কত বুঝাইতেছেন, কিন্তু অধীরার আর কি সান্ত্বনা আছে? তাঁহার জীবনের সকল আসক্তি আজ ছিন্ন। পিতৃগতপ্রাণা পুণ্যপ্রভার শোকোচ্ছ্বাসে পশু পক্ষীও আজ আকুল। উচ্চ ক্রন্দনের রোলে এই কথা কেবল শুনা যাইতেছে;—"বাবা, তুমিত এক দিনও আমার কথার উত্তর না দিয়া থাকিতে না, আজ তুমি কেন মৌনী? তুমি ভিন্ন আমার আর কেহ নাই বাবা! আমি একাকিনী শত্রুবেষ্টিত এই শূন্য পুরীতে তোমাকে ও মাকে ছাড়িয়া কেমনে থাকিব? বল বাবা, আমার বুক যে ফেটে যায়, আমি কেমনে থাকিব?" এই আকুল ক্রন্দনে সকলের নয়নে ধারা বহিতেছে। সোণার প্রতিমা আজ ধরায় গড়াগড়ি যাইতেছে! যখন পুণ্যপ্রভা শোকে সমাচ্ছন্ন হইয়া ধরায় গড়াগড়ি যাইতেছিলেন, তখন মহা সান্ত্বনা রূপে মনোহর চরণ-সেবা করিতে বিধিকৃষ্ণপুর উপস্থিত হইল। তারানাথের চিতা তখন নির্ব্বাণ হইয়াছে। মনোহর পুণ্যপ্রভাকে প্রণাম করিয়া প্রেমাঙ্কুরের পত্র হাতে দিয়া বলিল—"মা, আমি আপনার অধম সন্তান। চরনগরের সেই রজনীর কথা স্মরণ করুন, আমিই বরকন্দাজ রূপে আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম। আমি আজ আপনার চরণ-সেবার জন্য উপস্থিত। আপনার পিতৃদেবের অনেক পুণ্যের জোর, তাঁহার পুণ্যকীর্ত্তি বজায় রাখিতে প্রস্তুত হউন, এ দাস আপনার সেবক। প্রেমাঙ্কুর বাবুর এই পত্র গ্রহণ করুন।"

এই ঘটনার পর বেণীমাধবের সহিত পুণ্যপ্রভারও নবজীবনের সূত্রপাত হইল। মনোহরের উপদেশে এবং প্রেমাঙ্কুরের পত্রে পুণ্যপ্রভার দেহ মন নব

বলে বলীয়ান হইল। পিতা ও মাতার কীর্ত্তি বজায় রাখিতে পুণ্যপ্রভা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন। আসক্তিকে পিতার শ্মশানে ভস্ম করিয়া, পুণ্যময়ী প্রভা, জগতের দাসীরূপে যেন বিধিকৃষ্ণপুরে আভির্ভূতা হইলেন। জগদম্বার মন্দির তাঁহার সাধন-ক্ষেত্র, তারানাথ ও দীপ্তির শ্মশান তাঁহার বিহার ক্ষেত্র, বিধিকৃষ্ণপুর তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র। দীপ্তি, সরলা, তারানাথ যে সকল দ্রব্য ভালবাসিতেন, তাহা সাজাইয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা যে সকল বস্তু খাইতে ভালবাসিতেন, তাহা প্রত্যহ শ্মশানে উপহার দেন, সে সকল দ্রব্য নিজে আহার করেন না; আর তাঁহারা যে সকল কাজ ভালবাসিতেন, তাহা প্রাণপণে করিতে লাগিলেন। শান্তিশীলা অন্তরালে থাকিয়া পুণ্যপ্রভার সাহায্য করিতে লাগিলেন। দুই সখী পুণ্যপ্রভার দক্ষিণ বামে যেন লক্ষ্মী সরস্বতী। তাহাদের মুখে কথা নাই, কিন্তু হাতে কেবল সেবা। আর মনোহর? মনোহরের কথা আর কি বলিব? মনোহর একা যেন সকলের অভাব পূর্ণ করিল। পুণ্যপ্রভাকে মনোহর মা বলিয়া ডাকিত এবং পুন্যপ্রভার পদধূলি দুবেলা মাথায় লইত। বীরের ন্যায় সে দরিদ্র-সেবা-ব্রত পালন করিতে লাগিল। এক পবিত্র দৃশ্য।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যাদি,—বিচার আচার আর আমরা অনুসরণ করিব না। এই উপন্যাসে গবর্ণমেণ্টের শেষ কীর্ত্তি, কালীকান্ত, চক্রবর্ত্তী এবং তিন পুত্র সহ হরিগোপালের জেলে স্বর্গারোহণ। ৮।৯ মাসের মধ্যেই সকলেই একে একে প্রাণত্যাগ করিলেন। হাইকোর্টের আপিলে কোন ফল হইল না। ব্যারিষ্টার ও উকীলগণ দুই ষ্টেট লুটিয়া লইল, কিন্তু সকলই পণ্ড হইল। আসামীগণ দমিয়া গেল, জীবন ভারবহ বোধ হইতে লাগিল। যখন সকল আশা নির্ব্বাণ হইল, তখন একে একে সকলেই, জেলের অপার মহিমা ঘোষণা করিয়া, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। জেলের কঠিন পরিশ্রম কাহারও সহ্য হইল না, সকলেই একে একে প্রস্থান করিলেন! বিধিকৃষ্ণপুরে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে এ পৃথিবীতে রহিলেন, তিন পুত্রবধূ সহ শান্তিশীলা। শান্তিশীলার আদেশে স্বামী পুত্রের দেহ দীপ্তির শ্মশান পার্শ্বে দাহ করা হইয়াছে। চরনগরে পাপের সেবা করিতে রহিলেন, কেবল চন্দ্রকলা ও ডাক্তার বাবু। কালীকান্ত-রাবণের সোণার লঙ্কা ছারখার যাইতে লাগিল। আর বিধিকৃষ্ণপুর যেন শোকের লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠিল।

সকলের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য শেষ হইলে, শান্তিশীলা, হরিগোপালের উইল অনুসারে কাজ আরম্ভ করিলেন। শান্তিশীলা এখন দেবী প্রসন্নময়ীর দ্বারা অনুপ্রাণিতা

মাতৃমূর্ত্তি। শোককে জয় করিয়া তিনি তিন পুত্রবধূ সহ স্বামী পুত্রের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য বিবিধ পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তিন বধূ না যেন তিন দেবী। শ্বশ্রূসহ ব্রহ্মচারিণীগণ পবিত্র সেবা-ব্রত উদ্‌যাপন করিতে লাগিলেন। হরিগোপালের উইল এই সময়ে প্রকাশিত হইল। উইলের প্রধান কথাগুলি এই।

"আমার অবর্ত্তমানে আমার স্ত্রী বিষয় সংরক্ষণ করিবার ভার পাইবেন, তিনি বেণীমাধব, নীলকান্ত এবং তারানাথের পরামর্শ মত নিম্নলিখিত রূপ কাজ করিবেন।

১। মোকদ্দমার পর আমার ষ্টেট থাকিলে আমার তিন পুত্র প্রত্যেকে মাসে এক শত টাকা করিয়া পাইবে। তাহাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে, তদীয় বিধবা বা বংশধর আবশ্যক মত খরচপত্র পাইবে।

২। জগদম্বার পূজার জন্য ও তারানাথের দরিদ্র-সেবার জন্য যাহা প্রয়োজন, সে সকল ব্যয় আমার ষ্টেট হইতে প্রদত্ত হইবে।

৩। দীপ্তির শ্মশানে একটী পুণ্যমঠ হইবে, পার্শ্বে একটী মহামায়ার মন্দির ও একটী টোল স্থাপিত হইবে। এই টোলে অধ্যাপক রাখিয়া সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হইবে। অপর পার্শ্বে একটী ধর্ম্মসঙ্গত এবং ধর্ম্মশালা (অতিথিশালা) এবং একটী চিকিৎসালয় স্থাপিত হইবে, সেখানে বারমাসে যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান হইবে এবং যাঁহারা ধর্ম্ম চর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিবেন, তাঁহারা যত দিন ইচ্ছা থাকিতে পারিবেন। এই কাজে যত প্রয়োজন, অর্থব্যয় হইতে পারিবে।

৪। পুণ্যপ্রভা কখনও যদি বিবাহ করেন; তবে তিনি মাসে একশত টাকা করিয়া পাইবেন।

৫। আমার স্ত্রীর অবর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট আমার বিষয় সংরক্ষণ করিবেন এবং আমার এই উইল অনুসারে কার্য্যাদি করিবেন।"

এই উইলানুসারে শান্তিশীলা যখন একটু একটু কাজ আরম্ভ করিতে সংকল্প করিলেন, তখন চতুর্দ্দিকে বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইল। কিন্তু সে সকল কথার বিস্তৃত বিবরণের প্রয়োজন নাই। শান্তিশীলা সর্ব্বপ্রথমে দেবী প্রসন্নময়ীর অনুসন্ধানার্থ চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। শাক্তধর্ম্মের প্রাধান্য যে সকল তীর্থে, সেই সকল স্থানেই প্রধানত লোক প্রেরিত হইল। কালীঘাট, কামাখ্যা, বিরজা-ধাম প্রভৃতি স্থানে লোক প্রেরিত হইল।

ঊনচত্তারিংশ পরিচ্ছেদ।

পুণ্যপ্রতিষ্ঠা।

যখন ঘর ধনধান্যে পূর্ণ হয়, তখন কেহ সন্ধান পায় না, কেমনে কি হয়? যখন যায়, তখনও কেহ বুঝেনা, কিসে কি যায়? এই এক মোকদ্দমায় কালীকান্ত ও হরিগোপালের নগদ সম্পত্তি সব গিয়াছে এবং বিষয় বন্ধক পড়িয়াছে। পরের দ্বারাও বিষয় সংরক্ষণ হইতে পারে, যাঁহাদের ধারণা, তাঁহারা বঙ্গের জমীদারদিগের ইতিহাস কিছুই জানেন না। বঙ্গের জমীদার-শ্রেণী প্রায়ই অলস, বিলাসপরায়ণ, সুখ-সেবী, ইন্দ্রিয় এবং মদ্য মাংসের দাস, জমীদারী রক্ষার ঝঞ্ঝাটের মধ্যে অনেকেই যাইতে চাহেন না, প্রজার মঙ্গলামঙ্গলের ভার অন্যের হাতে! বঙ্গের বড় বড় জমীদার ঘর এই এক কারণেই, বুঝিবা, ধ্বংসের কবলে পতিত। এই কথাটা বুঝিতে পারেন অনেকেই, কিন্তু কাজের বেলায় অনেকেরই একদশা। আজ বঙ্গের ধ্বংস-প্রাপ্ত জমীদারদিগের উদ্ধার সাধন করিতে ঢাকার গার্থ সাহেব প্রভৃত শক্তিসম্পন্ন হইতেছেন, ইহাতেও এই কথা প্রতিপন্ন হইতেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অক্ষুণ্ণ রাখিতে অনেক রক্ষণশীল সম্পাদক একান্ত লালায়িত, কিন্তু চরিত্রহীনতার দুর্জ্জয় প্রভাব হইতে কে জমীদারদিগকে রক্ষা করে, কেহ ভাবেন না। ব্যভিচার ও মদ্য-পানে এবং মামলা মোকদ্দমায় সোণার জমীদারবংশ দিন দিন ধ্বংসের পথে চলিয়াছে; কই তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে একজনকেও দেখি না। অন্যের হাতে বিষয়ের ভার দিয়া কালনিদ্রায় অনেক জমীদার অভিভূত। যায়, যায়, যায়, সোণার বাঙ্গালার জমীদার শ্রেণী এই রূপেই যায়! কে রক্ষা করিবে? কর্ম্মচারীগণের ষড়যন্ত্রে বাঙ্গলার গৌরব, বড় বড় ঘর আজ শ্মশানতুল্য। হরিগোপাল এবং কালীকান্তের বিপুল ঐশ্বর্য্য অল্প সময়ের মধ্যেই যায় যায় হইল।

কালীকান্তের ষ্টেটের ঋণ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। চন্দ্রকলা উপপতি লইয়া সুখের সাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন, চতুর্দ্দিকে লুটপাট্ সমভাবে চলিতেছে। মোকদ্দমার পরও যাহা ছিল, এই ভাবে যাইতে লাগিল। ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে পাকা এমারত উঠিল। জিনিস পত্রে তাঁহার বাড়ীর সকল ঘর পূর্ণ হইল, ক্রমে কিছু কিছু বিষয়ও যাইতে লাগিল। চন্দ্রকলা চরনগরের সর্ব্বস্ব

ডাক্তারের বাড়ীতে পাঠাইতে লাগিলেন। রিপুর দাসত্বের মত্ততায় মানুষের সব বুদ্ধি লোপ পায়—মানুষ হাতে ধরিয়া হলাহল পান করে। চন্দ্রকলা ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য স্বামীর অপার ঐশ্বর্য্য উড়াইয়া দিতে লাগিলেন। গ্রন্থকার বলেন, ধন ঐশ্বর্য্য সম-বিভাগ ভিন্ন সাধারণ মানুষের অভাব মোচনের উপায় নাই বলিয়াই, বুঝি বা, বড় লোকদিগের এইরূপ দুর্ম্মতি হয়! বিধাতার ইচ্ছা কে বুঝিবে?

শান্তিশীলা স্বামীর বিষয় সংরক্ষণের ভার যখন হাতে লইলেন, তখন বুঝিলেন, এতঋণ হইয়াছে যে, বিষয় রক্ষার আর উপায় নাই। বহু টাকা ব্যয় করিয়া উইলের প্রোবেট লইতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না, তিনি গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া বিষয় বিক্রয় করিয়া স্বামীর ঋণ পরিশোধ করিতে লাগিলেন। ঋণ পরিশোধে বিষয় প্রায় সমস্ত গেল, তিনি তাহাতে একটুও কুণ্ঠিতা হইলেন না। অম্লান চিত্তে সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিতে লাগিলেন। সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইলে যাহা অবশিষ্ট রহিল, তদ্বারা স্বামীর ইচ্ছানুরূপ কাজ করিতে লাগিলেন।

এইরূপ ভাবে এবং এইরূপ কাজে প্রায় দেড় বৎসর অতিবাহিত হইল। এই সময়ের মধ্যে প্রেমাঙ্কুরের বা দেবী প্রসন্নময়ীর কোন সংবাদই পাওয়া গেল না। সকল লোক যথা সময়ে ফিরিয়া আসিল। এক বৎসর পর দেবী প্রসন্নময়ীর নিকট হইতে এই পত্র খানি আসিল।

"মা পুণ্যপ্রভা,

তোমাকে অকূল পাঁতারে ভাসাইয়া আমি সুখে আছি, মনে করিবে না। মহামায়ার ইচ্ছার প্রতিকূলে চলিতে না পারিয়া আমি কামরূপ কামাখ্যা পাহাড়ে আসিয়াছি। তুমি তোমার পিতার কীর্ত্তি বজায় রাখিতে পারিবে, আমার সে বিশ্বাস আছে। তোমার পিতার হত্যার বিবরণ পাইয়া আমি আত্ম-হারা হইয়াছিলাম—শোক এবং ক্রোধ, যন্ত্রণা এবং প্রতিহিংসা আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল, এত দিন কঠোর সাধনার পরও আমি প্রকৃত ধর্ম্মের অধিকারিনী হইতে পারি নাই, বুঝিয়া, তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। আমার ন্যায় রমণীকে কি ধার্ম্মিকা বলিয়া দেশের লোক অধিক দিন পূজা করিতে পারে? আমার ন্যায় রমণীর দ্বারা কি দেশের লোকের মতিগতি ফিরিতে পারে? তাহা অসম্ভব। যাহার হৃদয়ে হিংসা বিদ্বেষ ও কাম ক্রোধের বসতি, তাহার হৃদয় ধর্ম্মের উপযোগী নয়। আমি বুঝিলাম, আমার সাধন ভজন বৃথা; বুঝিলাম, চরিত্রহীনতার জন্যই দেশ পাপে ডুবিতেছে। বুঝিয়া মুহূর্ত্তও থাকিতে

পারিলাম না, দেশ ত্যাগ করিলাম। আমার ভণ্ডামীর জন্য কি দুঃখে, কি কষ্টে আমার এই একবৎসরের অধিক কাল কাটিয়াছে, মা জগদম্বাই তাহা জানেন। তোমার পিতার মৃত্যুতে আমার সংসারের আসক্তি নিবিয়াছে। সংসারে থাকিয়া আর কি করিব, ইহা ভাবিয়া দেশত্যাগ করিয়াছি। তোমার পিতার সহিত যখন তীর্থ-ভ্রমণে গিয়াছিলাম, তখন কামাখ্যা তীর্থ আমার প্রাণ হরণ করিয়াছিল। তোমার মনে আছে কিনা,জানি না,কামাখ্যা শাক্ত-ধর্ম্মের জীবন্ত কীর্ত্তি,মা জগদম্বার সত্তাতে পূর্ণ। যখন বুঝিলাম, বিধিকৃষ্ণপুরে থাকিয়া সাধন করিলে আমি কখনও সিদ্ধাবস্থায় পৌঁছিতে পারিব না, বরং আরো নরকের পথে যাইব, তখন মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করিয়া পলায়ন করিলাম। মা জগদম্বার কৃপায়, অনেক কষ্ট দুঃখের পর,এই স্থানে পৌঁছিয়াছিলাম। সে সকল কষ্টের কথা আর লিখিলাম না, বৃথা তুমি কষ্ট পাইবে। আসিবার সময় সঙ্কল্প ছিল না যে, তোমাকে পুনরায় পত্র লিখিব। আমার মন এবং আমার জীবন সংযত না হইলে কাহাকেও পত্র লিখিব না,প্রতিজ্ঞা ছিল। আমি কামাখ্যা পাহাড়ের নিভৃত গুহায় এক বৎসরের অধিককাল কঠোর সাধন করিয়া কতক শান্তি পাইয়াছি। মধ্যে মধ্যে কামাখ্যা দেবীর মন্দিরে ও ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে যাইয়া থাকি। ভুবনেশ্বরীর এই নির্জ্জন মন্দিরে,প্রকৃতির কাম্যকাননে, নির্জ্জন গুহায় কঠোর সাধনা করায় আমার জীবনের অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। এখন আর তোমার পিতার শোকে আমি কাতর নই। এখন পৃথিবীর কোন দুঃখ কষ্টই আমাকে বিচলিতা করিতে পারে না। এখন বুঝিয়াছি, এখন দেখিতেছি, তোমার পিতা নিত্যানন্দ-ধামে, সেই পুণ্যময় অতীন্দ্রিয় রাজ্যে, বিধাতার কৃপা পাইয়া ধন্য হইয়াছেন। তিনি সংসারে থাকিতেও সংসারের অতীত ছিলেন, সেখানে পুণ্য, এবং পবিত্রতায় তাঁহার মূর্ত্তি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়াছে। আমিও সেই ধামে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। আমার জীবনের শেষকার্য্য সমাধা হইলেই আমি অনন্তধামে প্রস্থান করিব। দুই মাস হইল, কামাখ্যায় একজন সাধুর সমাগম হইয়াছে। নানা তীর্থ পর্য্যটনে তাঁহার শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে। তিনি এখানে আসিয়াই পীড়িত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে আমি সাধ্যানুসারে তাঁহার সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছি। তিনি এখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলাম না। এক দিন তাঁহার পরিধানের গৈরিকের এক কোণে একটী কৌটার ভিতর তোমার একখানি পত্র দেখিতে পাইয়া

তাঁহাকে চিনিয়াছি। তিনি এখনও আমার পরিচয় পান নাই। সবল এবং সম্পূর্ণ সুস্থ না হইলে তাঁহার নিকট আমি আর পরিচয় দিব না। তিনি আমাকে পূর্ব্বে যদি ভাল করিয়া দেখিতেন, তবে বোধ হয় চিনিতে পারিতেন। অথবা, আমার বর্ত্তমান শরীর দেখিলে তোমরাও চিনিতে পারিবে কি না, তাহাতেও সন্দেহ। তিনি সংযমী বীর, রোগের যন্ত্রণায় যখন অস্থির হইতেন, তখনও তিনি উচ্ছ্বাসের কোন কথা বলিতেন না। কেবল একদিন অস্ফুট স্বরে দীপ্তির নাম, এক দিন তোমার নাম, একদিন তোমার পিতার নাম এবং একদিন আমার নাম করিয়াছিলেন। তিনি সদা অন্যমনে থাকেন, কি যেন হারাইয়াছেন, চিত্তের সদা এই ভাব। আমি সাধ্যানুসারে তাঁহার শরীর ও মনের স্বাস্থ্যের জন্য চেষ্টা করিতেছি। জগদম্বার কৃপা হইলে শীঘ্রই তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবেন। তিনি যখন আমার পরিচয় পাইবেন, না জানি তখন কতই আনন্দিত হইবেন। তিনি আমার জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছেন! আমিই তাঁহার পীড়ার কারণ!! আমার জীবনের শেষ কার্য্য করিতে পারিব, আশা ছিল না, এখন জগদম্বা যেন আমাকে মতি ও আশা দিতেছেন, যিনি আমার জন্য এত করেছেন, তাঁহার মঙ্গলের জন্য আমাকে আবার একবার সংসারে যাইতে হইবে। কিন্তু কতদিন পর, আজও তাহা লিখিতে পারিলাম না। তুমি সংযম শিক্ষা করিবে, এবং জগদম্বার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া পিতার কীর্ত্তি বজায় রাখিবে। আমার নিকট কোন পত্র লিখিবে না। আমি তোমার পত্র পাইব না। আমি কোন্ গুহায় থাকি, কি খাই, কি করি, কেহই জানে না। তুমি কোন অবস্থাতে যখন বিচলিতা হইবে না, আমি আদেশ পাইয়াছি, তখন প্রেমাঙ্কুরের সহিত তোমার শুভ পরিণয় হইবে। সংসার-সুখের অতীত রাজ্যে না যাইতে পারিলে, কাহারও বিবাহের অধিকার নাই। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সংযম শিক্ষা করিবে।—তোমার মাতা—প্রসন্নময়ী।”

মনের যে অবস্থার সময় পুণ্যপ্রভা জননীর এই পত্র পাইলেন, তখন চাঞ্চল্য সম্ভব ছিল না। দীর্ঘকাল পর জননীর সংবাদ লইয়া পুণ্যপ্রভা আনন্দিতা হইলেন বটে, কিন্তু উচ্ছ্বাসে মত্ত হইলেন না। পত্র মনোহর দেখিল। শান্তিশীলাও দেখিলেন। প্রসন্নময়ীর নামে পুষ্পচন্দন বর্ষিত হইল, দিন দিন আরো তাঁহার সম্মান বাড়িতে লাগিল। তারানাথ সাক্ষাৎ দয়ার অবতার বলিয়া পূজিত হইতে লাগিলেন।

পুণ্যপ্রভার প্রাত্যহিক কার্য্য এইরূপে নিয়মিত হইয়াছে—অতি প্রত্যূষে

গাত্রোত্থান করিয়া তিনি স্বহস্তে ফুল তোলেন, তৎপর জগদম্বার গৃহ এবং শ্মশান লেপন করেন। তৎপরে স্নানান্তে প্রায় দুই ঘণ্টা নির্জ্জন ঘরে ধ্যান করেন। তৎপর সেবার জন্য লীলা ও তিলোত্তমার সহিত পাড়ায় পাড়ায় ভ্রমণ করেন। যাহার যে অভাব, তাহা মোচন করিতে চেষ্টা করেন। তৎপর স্বহস্তে রন্ধন করিয়া শ্মশানে ভোগ দেন, তৎপর অতিথি-সৎকার করেন। দুই প্রহর অতীত হইলে জগদম্বার চরণে পূজান্তে অঞ্জলি দিয়া সামান্য কিছু আহার করেন। আহারান্তে দুই ঘণ্টা শাস্ত্র পাঠ করেন। তৎপর দুই ঘণ্টা শান্তিশীলার বাড়ীতে ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ করেন। সেখানে পাড়ার অনেক মেয়ে উপস্থিত হইতেন। তৎপর আবার লীলা ও তিলোত্তমার সহিত মিলিতা হইয়া দুঃখী দরিদ্রদিগের বাড়ী বাড়ী গমন করিয়া সাধ্যানুসারে তাহাদের অভাব দূর করিতে চেষ্টা করেন। তৎপর লীলা ও তিলোত্তমার সহিত মিলিয়া শ্মশানে রাত্রি ১০ টা পর্য্যন্ত নাম কীর্ত্তন করেন। দীপ্তির স্বর্গারোহণের পর এক বৎসর লীলা ও তিলোত্তমা মৌনব্রত পালন করিয়াছেন। এখন আর তাঁহারা মৌনী নহেন। নাম কীর্ত্তনের সময় বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে। তৎপর কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া শয়ন করেন। সাধারণ নিয়ম এইরূপ; কিন্তু যে দিন রোগীর শুশ্রূষা করিতে হয়, সেদিন আর কোন কাজে মন যায় না। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া রোগীর শুশ্রূষা করিতে থাকেন। এই রূপ ভাবে দিন যাইতে লাগিল। বিধিকৃষ্ণপুরের দৈত্যের প্রাদুর্ভাব আর নাই। ঐশ্বর্য্যের গরিমা ডুবিয়াছে, এখন শান্তিধামের ন্যায় হইয়াছে। শান্তিশীলা স্বামীর ঋণ পরিশোধ করিয়া তিন পুত্রবধূ সহ পুণ্যপ্রভার সহবাসে সুখে কালাতিপাত করিতেছেন। নীলকান্ত এবং বেণীমাধব তাঁহাদের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। ঋণ শোধের পর যে কিছু বিষয় ছিল, তাহাতে কোন রূপে দেব-সেবা, অতিথি-সেবা এবং এই কয়টী পরিবারের খরচ চলিতে লাগিল।

বিধিকৃষ্ণপুরের কথা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইতে লাগিল যখন, তখন দেশ দেশান্তর হইতে বহু লোক বিধিকৃষ্ণপুরের শোভা দেখিতে আসিতে লাগিল। পুণ্যপ্রভার গুণে মুগ্ধ হইয়া অনেক লোক বিবাহের জন্য প্রস্তাব করিতে লাগিল। নীলকান্ত ও বেণীমাধব অভিভাবক স্থানীয়, তাঁহারা ভদ্রতার সহিত সকল প্রস্তাব উড়াইয়া দিলেন। আসক্তি, কামনা, ও বাসনাহীনা পুণ্যপ্রভার জীবন অনেকের পরিবর্ত্তনের কারণ হইল।

চত্তারিংশ পরিচ্ছেদ।

হিংসারাক্ষসী—মূর্ত্তিমতী।

সুখ বল, বিলাস বল, সে সকল যেন স্বপ্ন। যৌবন বল, ইন্দ্রিয়ের তাড়না বল, সে সকল যেন মেঘ-পটলে ক্ষণ-বিজলী-চমক। উত্তেজনা, আস্ফালন, মুহূর্ত্ত মাত্র। তারপর স্রোত থামিয়াছে, মেঘগর্জ্জন আর নাই, উৎসাহ উদ্যম, আনন্দ উল্লাস—সব যেন নিবিয়া কোন্ অদৃশ্য রাজ্যে পলায়ন করিয়াছে। কালীকান্ত বিশুদ্ধ বায়ুর খাতিরে আড়িয়াল-খাঁ নদীর তীরে আপন নগর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। নদী ক্রমে ক্রমে ভ্রুকুটী দেখাইয়া নিকটে আসিতেছে, পাপের ভবন ডুবাইতে বুঝিবা তাহার একান্ত ইচ্ছা। ক্রমে ক্রমে তীর ভাঙ্গিতেছে—ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে কালীকান্তের বাড়ীর অর্দ্ধেক নদীর গর্ভে গিয়াছে! বিষয় বন্ধক,নগদ সম্পত্তি কিছুই নাই,বাড়ীখানিও যায়!! আর চন্দ্রকলার যৌবন ও সৌন্দর্য্য কোথায়? তাঁহার এখনও রূপের বয়স ছিল বটে, কিন্তু ৩ মাস হইল বসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়ায় রূপে কালী পড়িয়াছে—চেহারা অতি কদাকার হইয়াছে। তার উপর অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-চালনায় ঐ কদাকার মূর্ত্তি আম্‌শীর মত শুষ্ক হইয়াছে। এই অবস্থায় যেমন হইয়া থাকে, ডাক্তার বাবুর আদর ও যত্ন কমিয়াছে,তাঁহার স্বার্থ সাধন হইয়াছে,টাকা কড়ি জিনিসপত্র অধিকাংশই আত্মসাৎ করিয়া, এখন চন্দ্রকলার পরিণাম ডুবাইয়া, পলায়ন করিতে তিনি তৎপর হইয়াছেন। বসন্তের কোকিল, বসন্ত অন্তে আর কি কাননের মাধুর্য্য বৃদ্ধি করিতে থাকে এবং ডাকে? একটু একটু ঘৃণা তাচ্ছল্য, একটু একটু উপেক্ষা ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে। বিশুদ্ধ এবং পবিত্র প্রণয় বার্দ্ধক্যে আরো মধুর এবং সরস হয়,আর অপবিত্র,রিপুর উত্তেজনাজাত পঙ্কিল ভালবাসা, স্বার্থ, রূপ এবং যৌবনের হ্রস্বতায় সহিত মলিন এবং নিষ্প্রভ হয়। আর আসক্তি থাকিবে কেন? স্বার্থের আশায় যে ঘর বাঁধিয়াছিল, স্বার্থ পূর্ণ হইয়াছে, এখন সে থাকিবে কেন? সে রিপুর উত্তেজনায় ও রূপের মোহিনী মায়ায় পড়িয়াছিল, এখন চন্দ্রকলার রূপ গিয়াছে, এখন থাকিবে কেন? সে যৌবনের আকর্ষণে ভুলিয়াছিল, এখন জীর্ণ শীর্ণ কলেবরার শুষ্ক শরীরের মায়ায় থাকিবে কেন? স্বার্থ পূর্ণ হইয়াছে, রূপ ডুবিয়াছে, যৌবন

শুষ্কতার ভয়াবহ আক্রমণে কোথায় লুকাইয়াছে,কে জানে! এখন চন্দ্রকলা দিন দিনই তিক্ত ও ঘৃণার্হ বোধ হইতেছেন! ডাক্তার বাবুর আর বিন্দুমাত্র আসক্তি নাই। বিষয় ঋণে জড়িত, বাড়ীর শোভা পুলিস আক্রমণের পর যাহা ছিল, কালীকান্তের মেয়াদের পর, মুকুন্দরামের লুট্‌পাটে তাহাও ম্লান হইয়াছে, অবশিষ্ট যাহা ছিল, ডাক্তার বাবু কতক ম্লান করিয়াছেন, আর ম্লান করিতেছে, আড়িয়াল-খাঁ। প্রত্যহই 'টুপ টুপ, ঢিপ ঢিপ করিয়া মৃত্তিকা-রাশি নদীর গর্ভে পড়িতেছে—গাছ-পালা, বাড়ী-ঘরও তাহার সহিত নদীর গর্ভে যাইতেছে! নদী, রোষ-কষায়িত নেত্রে তাকাইয়া ভীষণ গর্জ্জন করিতেছে! সোঁ সোঁ রবে চতুর্দ্দিক পূর্ণ! পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত!! এই অবস্থার সময় চন্দ্রকলার সহিত একদিন ডাক্তার বাবুর এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

চন্দ্রকলা।—তুমি আমাকে পরিত্যাগ করে যাইবে, একমাস ধরে ভয় দেখাচ্ছ। ইহা কি তোমার ধর্ম্ম! অবলা বিধবার ধর্ম্ম নাশ করে শেষে এইরূপ করা কি তোমার ধর্ম্ম?

ডাক্তার বাবু।—তুমি দিবে দিবে বলে এখনও কত জিনিস ও কত গুপ্ত-ধন আমাকে দেও নাই, মনে নাই কি? লক্ষ টাকার জিনিসে পুণ্যপ্রভার বাসর-ঘর সাজান হয়েছিল, তুমি আমাকে তাহার কি দিয়াছ? সে সকল দ্রব্যাদি কোথায় গেল? নগদ টাকার লক্ষ অংশের এক অংশও আমাকে দেও নাই, কিসের মায়ায় এখানে থাক্‌ব?

চন্দ্রকলা।—তোমাকে কতবার বলেছি, যা কিছু ছিল, সবই তোমাকে দিয়াছি, আর কি আছে? জিনিসের ফর্দ্দ তোমার হাতে; কি আছে, কি নাই, সকলই তুমি জান। স্বামীর পরিধানের পোষাক পরিচ্ছদ, ঘড়ি চেইন, হীরকের অঙ্গুরী, জরির টুপি পর্য্যন্ত দিয়া তোমাকে সাজাইয়াছি। দিতে বাকী রেখেছি কি? তুমি ত দেখিতেছ, প্রত্যহই, ঋণ করে খরচ চল্‌ছে। এই একটা মোকদ্দমায় ষ্টেট ডুবেছে, অবশিষ্ট ষ্টেটের মুকুন্দরাম বড় কিছু রেখে যায় নাই; যা রেখেছিল, তোমাকে অম্লান চিত্তে সব দিয়াছি। ধন ঐশ্বর্য্য দিয়াছি, জীবন দিয়াছি, ধর্ম্ম দিয়াছি, রেখেছি কি? তোমারই জন্য পুণ্যপ্রভার সোণার রূপে তীব্র ঔষধ ঢেলেছিলাম! তুমি এমন কথা মুখে আনিও না। ছি, অধর্ম্ম হবে!!

ডাক্তার বাবু।—তোমার ধর্ম্মের কথা রেখে দেও; ধর্ম্ম তোমার জীবনের আগা গোড়া! এমন ধার্ম্মিকা কি আর মিলে? আমার জন্য পুণ্যপ্রভার তুমি কি করেছ?

চন্দ্রকলা।—তোমার জন্য করি নাই? তুমিই ত বলেছিলে, পুণ্যপ্রভা রাণী হইলে আমার কিছু পাইবার আর আশা নাই। এখন তা অস্বীকার করো না। আমার ধর্ম্ম নাই, আর তোমার ধর্ম্ম আছে ষোল আনা!! অন্যের সতীত্ব নাশ করে খুব ধর্ম্ম সঞ্চয় করেছ! তুমিই ত বলেছ, এ জগতে একজনকেও যে প্রাণ দিয়া ভালবাস্‌তে পারে, ধর্ম্ম তাহারই। আমি কি তোমাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসি নাই?

ডাক্তার বাবু।—তোমার স্বামীকে তুচ্ছ করে আমাকে ভালবেসে তুমি ধর্ম্মের চক্ষে কলঙ্কিনী হয়েছ, জান না কি?

চন্দ্রকলা।—তোমার প্রলোভনে মুগ্ধ হয়েই স্বামীকে তুচ্ছ করেছি। সমাজের নিকট কলঙ্কিনী হয়েছি, তাতে কি? তোমার নিকট এবং ধর্ম্মের নিকট ত হই নাই?

ডাক্তার বাবু।—ধর্ম্মের নিকটও তুমি ডুবেছ। আমাকে প্রলোভনে ভুলায়ে, অধর্ম্মের পথে লয়ে গিয়া তুমি উভয়ের পরিণাম আঁধার করেছ। বাকী রেখেছি?

চন্দ্রকলা।—আমি তোমাকে ভুলায়েছি, না তুমি আমাকে ভুলায়েছ? মিথ্যা কথা বলো না। উহাপেক্ষা অধর্ম্মের কাজ আর নাই। তোমাকে ভালবাসিলে অধর্ম্ম হবে, একদিনও তুমি তা বল নাই। আমি সেই কথাতেই ভুলেছি। এখন এরূপ কথা বল্‌ছ কেন?

ডাক্তার বাবু।—যাহা সত্য, তাহাই বল্‌ছি। তুমিও ডুবেছ, আমিও ডুবেছি। নরকের হাত এড়ানের আর উপায় নাই। এখন তুমি কাশীতে যাইয়া ধর্ম্মাচরণ কর, আমি সন্ন্যাসী হই। রক্ষার আর উপায় নাই।

চন্দ্রকলা।—তোমাকে ছেড়ে স্বর্গেও যেতে চাই না।

ডাক্তার বাবু।—তোমাকে লয়ে নরকে যাইতে আমি ভীত এবং অসমর্থ। এখন আমার মায়া ছেড়ে ধর্ম্মে মতি দেও।

চন্দ্রকলা।—আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই তুমি। আমি আর কিছু জানি না। তোমার মায়ায় স্বামীর ভালবাসা তুচ্ছ করেছি। প্রেমদাসকে প্রলুব্ধ ও উত্তেজিত করে, ভ্রাতৃ-হত্যার সহায়তা করেছি, নির্ম্মলা সোণার পুণ্যপ্রভার সর্ব্বনাশ করেছি—কি না করেছি? তোমার মায়ায় স্বামীর অতুল কীর্ত্তি বিনাশ করে তোমার ঘর পূর্ণ করেছি। বাকী রেখেছি কি? অবিশ্বাস করো না, ভাল হবে না।

ডাক্তার বাবু।—মিথ্যা কথা। তোমার ভাণ্ডারে এখনও লক্ষ টাকার অলঙ্কারাদি আছে।

চন্দ্রকলা।—আমি তোমাকে ছুঁয়ে বল্‌তেছি, ভাণ্ডার খালি, আর কিছুই নাই। অবিশ্বাস করো না, ভাল হবে না।

ডাক্তার বাবু।—অবিশ্বাস করিতেছি, তুমি আমার কি করিবে?

চন্দ্রকলা।—সহোদর এবং স্বামীর কলিজার রক্ত যে পান করতে পারে, সে কি কর্‌তে পারে, জান না?

ডাক্তার বাবু।—তুমি আমার ইন্দ্রিয়ের দাসী, দাসত্ব ভিন্ন অন্য কোন কাজে তোমার শক্তি নাই, নিশ্চয় জানিও। আমি ভীত এবং কাপুরুষ নহি যে ভয় পাইব? আমি তোমার সকলই জানি, কি করিবে?

চন্দ্রকলা।—এত করেও তোমার মন বাঁধিতে পারি নাই, আজ বুঝিলাম। স্বামীর সর্ব্বস্ব দিয়া তোমাকে সাজাইয়া নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, আজ বুঝিলাম। স্বামীর পোষাক পরিচ্ছদ অম্লান চিত্তে তোমাকে পরাইয়া কত সুখী হইয়াছিলাম! আজ বুঝিলাম, তুমি আমার হও নাই, আমি হলাহল পান করে কলঙ্কে ডুবেছি, আজ জানিলাম। তোমার ভালবাসা, স্বার্থ-বালীর বাঁধ, আজ হৃদয়ঙ্গম করিলাম। আর কিসের মায়া? আমি কি করিতে পারি, অচিরাৎ দেখিবে।

ডাক্তার বাবু পুরুষোচিত সাহসে বলিলেন, ঢের দেখেছি, ঢের শুনেছি, বাকী আছে, তোমার মর্দ্দানি দেখ্‌তে!

চন্দ্রকলার হৃদয় বিষে জর্জ্জরিত হইল, যাঁহার জন্য সে ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ডুবাইয়াছে, তাঁহার নিকট এইরূপ তীব্র কথা শুনিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল। চক্ষের জল ধারাবাহী হইয়া পড়িতে লাগিল। অন্তঃপুর-সংলগ্ন নদীর ভাঙ্গনকূলে যাইয়া বসিলেন। সমস্ত পৃথিবীটা যেন চক্ষের সম্মুখে ঘুরিতে লাগিল। আকাশটা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। নদীর গর্জ্জন যেন তাঁহাকে সম্বোধন করে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল। পাখীরা কুলায় বসিয়া যেন তীব্র ভৎর্সনা করিতে লাগিল। পেচক কর্কশ স্বরে ভেঙ্গাইয়া আজ কত যেন ঠাট্টা করিতেছে। এমন নিদারুণ ঘটনা চন্দ্রকলার জীবনে আর কখনও ঘটে নাই, ক্রোধে, দুঃখে, বিষাদে ও হিংসায় তাঁহার হৃদয় মন পূর্ণ। কেবল তাহাই নহে। আত্ম-গ্লানিতে সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্বলিতেছে। "এইরূপ লোকের জন্য আমি এত করেছি?" এই কথা বৃশ্চিকের

ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ দংশন করিতেছে। "ভালবাসাটা কি স্রোতের শেওলা, ক্রমাগত ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ানই স্বভাব? বোধ হয়, ইনি আর কাহারও প্রেমে পড়িয়া আমাকে ছাড়িতেছেন, অথবা পত্নীর ভালবাসাতেই পড়েছেন। আমার জীবনের আর লক্ষ্য কি? যাহার ভালবাসার কাঙ্গালিনী হয়ে সমস্ত তুচ্ছ করেছি, তিনি অন্যের হইবেন, অন্যকে আদর করিবেন, আমি তাহা সহিব? আমার ঐশ্বর্য্য অন্যকে লইয়া ইনি সম্ভোগ করিবেন? তাহা কথনও সহিব না। আমি হতভাগ্যের বুকের রক্ত পান করে আড়িয়াল-খাঁতে ঝাঁপ দিব, ইহাই প্রতিজ্ঞা। আর কিসের মায়া? আর ভুলিব না।"—এইরূপ ভাবিয়া চন্দ্রকলা ঘরে আসিয়া একখানি তীক্ষ্ণ ছুরিকা শাণিত করিলেন। ভীষণ প্রতিজ্ঞা পালনের আয়োজন হইল।

স্বৈরিণীর নিরাশ-প্রণয়ের দুর্জ্জয় প্রতিহিংসা ও ক্রোধ প্রতিহত করিবার শক্তি, বুদ্ধি ও বিবেচনা ডাক্তার বাবুর থাকিলে তিনি নির্ব্বোধের মত চন্দ্রকলাকে চটাইতেন না। বিষধরের ক্রোধ উদ্দীপ্ত করিয়া শান্তিতে যে থাকিতে বাসনা করে, তাহার ন্যায় মূর্খ আর কে? ডাক্তার বাবু চন্দ্রকলাকে যেরূপ জানিতেন, সেই ভাবেই চলিয়াছেন। আজ যে তিনি ফণিনী সদৃশ, বুঝিবার শক্তি ছিল না। অথবা পাপীর পরিণাম পাপী কি কথনও ভাবিতে পারে? ভাবিতে পারিলে পাপের বোঝা কথনও মানুষ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মাথায় তুলিত না। চক্রীর অপূর্ব্ব বিধান-চক্র!!

রাত্রে নিশ্চিন্ত ভাবে ডাক্তার বাবু, সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ঘরে, আমাদের পুণ্যপ্রভার সেই বাসর ঘরে পালঙ্গে নিদ্রিত হইয়াছেন। কথা হয়, কথা যায়, রাগ হয়, রাগ যায়—কতবার গিয়াছে, সেজন্য তাঁহার কোন উদ্বেগ বা চিন্তা নাই। গাঢ় নিদ্রায় তিনি অচেতন। এমন সময়ে চন্দ্রকলা পার্শ্ব হইতে শাণিত ছুরিকা ডাক্তারের বাম বক্ষে ধীরভাবে সজোরে প্রবেশ করাইতেছেন! প্রণয়ের উপযুক্ত পুরস্কার!! ছুরিকা যখন হৃদয় ভেদ করিতেছিল, তখন ডাক্তার বাবু "মাগো" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। চন্দ্রকলা অমনি বুকের উপর উঠিয়া বসিলেন। ডাক্তার চাহিয়া দেখিলেন, বুকের উপর বসিয়া ভীমা চন্দ্রকলা। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। চন্দ্রকলাকে দেখিয়া ডাক্তার বাবু বলিতে চেষ্টা করিলেন—"কে, তু—মি" কিন্তু আর বাক্য ফুটিল না। চন্দ্রকলা নিমেষ মধ্যে বক্ষের ছুরিকা তুলিয়া আবার গলদেশে বসাইলেন এবং বলিলেন—"আমি কি পারি, কি না পারি, তাহা দ্যাখ্! আমাকে পরিত্যাগ করে দেশে

যাইয়া অন্যের প্রণয়ে মজিবি, ভেবেছিস্, এই দ্যাখ্ সে সাধ মিটাইলাম!” এই বলিয়া বুকের রক্ত তুলিয়া পান করিলেন এবং বক্ষের উপর দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

ভীমার চক্ষে একবিন্দু জল নাই, হৃদয়ে একবিন্দু মমতা নাই। মুহূর্ত্তের মধ্যে ডাক্তারের প্রাণ বহির্গত হইলে, ভীমা পালঙ্গ হইতে ডাক্তারকে টানিয়া ফেলিয়া, সেই অবস্থায় ছুটিয়া নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। নদীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“মা, আমাকে আজ আশ্রয় দেও। আমি এজগতে পিতৃমাতৃহীনা, স্বামীহীনা, ভ্রাতৃহীনা, কলঙ্কিনী! যাহার প্রণয়ের খাতিরে জীবনে কলঙ্কের বোঝা বহিয়াছিলাম, সে আমাকে তুচ্ছ করেছিল—তাহার প্রতিশোধ তুলেছি। আর আমার জীবনে সুখের আশা নাই। তুমি আমাকে ক্রোড়ে স্থান দেও।” এই বলিয়া উন্মত্তা চন্দ্রকলা সেই উচ্চ ভাঙ্গন কূলের জমী হইতে নদীগর্ভে লম্ফ দিয়া পড়িলেন। তীব্র উচ্ছ্বসিত স্রোত, তট কাঁপাইয়া, ভীম গর্জ্জনে চন্দ্রকলাকে আপন ক্রোড়ে টানিয়া, কোন্ অদৃশ্য রাজ্যে লইয়া গেল, কেহ জানিল না।

চরনগরের অবশিষ্ট ঘটনা আর লিখিব কি? পাঠক সকলই বুঝিতেছেন। পুলিসের লুঠপাটে পাপের ভবন শ্মশানের ন্যায় হইয়া উঠিল। গবর্ণমেণ্ট ষ্টেটের ভার গ্রহণ করিলেন এবং বিষয় বিক্রয় করিয়া মহাজনদিগের প্রাপ্য পরিশোধ করিলেন। চরনগরে অন্ধকারে বাতি দিবারও লোক রহিল না। নির্ব্বংশ কালীকান্তের শ্মশানে ক্রমে ক্রমে কোলাহল করিতে উপস্থিত হইল, শিবার দল, পেচকের দল, এবং ঘুঘুর দল! এইরূপে একটা সোণার সংসার ছারখার গেল! আড়িয়াল-খাঁ নদী তিল তিল করিয়া ভাঙ্গিয়া ক্রমে পাপ-ভবনের সমস্ত কলঙ্ক লুকাইল। এখন দুর্বৃত্ত কালীকান্তের ঘৃণিত নামটা কেবল লোকের কর্ণে কর্ণে বিচরণ করিতেছে। আর কোন স্মৃতি নাই। পাপীর এমন পরিণাম আর কোথাও বড় একটা শুনা যায় নাই।

একচত্তারিংশ পরিচ্ছেদ।

যোগধাম।

গৌহাটীর নিকটে কামাখ্যা পাহাড়। কামাখ্যার উত্তর পশ্চিম দিয়া ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত হইয়াছে। কামাখ্যার সর্ব্বোচ্চ শেখরে ভুবনেশ্বরীর মন্দির। নানাবৃক্ষে কামাখ্যা পূর্ণ। ভুবনেশ্বরীর মন্দিরের উত্তরে দাঁড়াইলে ব্রহ্মপুত্রকে

অতি সুন্দর দেখায়। প্রকৃতির নির্জ্জনতা ভেদ করিয়া, পাহাড় পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া এই নদ অবিরাম গতিতে সাগর সঙ্গমে ধাইতেছে। কামাখ্যা শাক্ত-ধর্ম্মের লীলাভূমি, কামাখ্যা প্রকৃতির রম্য কানন। কামাখ্যা সাধকের বিহার স্থান, সাধনার আরামভূমি। যুগ যুগান্তর ধরিয়া পাহাড় এই নদের তীরে দাঁড়াইয়া কত সাধক সাধ্বীর মনোরথ পূর্ণ করিয়াছে, কেহ সে ইতিহাস রাখে নাই। বিচিত্র শোভাময় স্থান।

ভুবনেশ্বরীর মন্দিরের অনেক নীচে এক নির্জ্জন গুহায় যোগিনী প্রসন্নময়ী থাকেন। চতুর্দ্দিকে নিবিড় জঙ্গল, বন্য জন্তুর আবাস স্থান, মধ্যে একটী মনোরম্য গুহা, এইরূপ গুহা আসামের অনেক পাহাড়ে আছে। প্রসন্নময়ীর কুটীরে এক যোগীও আছেন, ইঁহারই কথা প্রসন্নময়ী পুণ্যপ্রভাকে লিখিয়াছিলেন। ইনি আমাদের প্রেমাঙ্কুর।

প্রেমাঙ্কুর দেশ দেশান্তর, তীর্থ তীর্থান্তর অন্বেষণ করিয়া শেষে কামাখ্যায় আসিয়া পীড়িত হন। প্রথমত কামাখ্যা-মন্দিরের জনৈক পাণ্ডা তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তৎপর ভুবনেশ্বরীর মন্দিরের ধারে এক কুটীরে ছিলেন। তারপর একটু সুস্থ হইলে তাঁহাকে আপন গুহায় সেবার জন্য প্রসন্নময়ী লইয়া যান। যোগীর মর্য্যাদা সন্ন্যাসিনী ভিন্ন কে বুঝিবে? অনেকদিন পর প্রসন্নময়ী একখানি পত্রে প্রেমাঙ্কুরের পরিচয় পাইয়াছিলেন, সে কথা লিখিয়াছি। সেই সময়েই পুণ্যপ্রভার নিকট তিনি পত্র লিখিয়াছিলেন। প্রেমাঙ্কুর এখনও পরিচয় পান নাই। পাওয়ার সম্ভাবনাও নাই। প্রেমাঙ্কুর মহিলা-কুলের মুখের দিকে চাহিয়া প্রায়ই কথা বলিতেন না। প্রসন্নময়ীকে অল্প কয়দিন দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কথা বলিতেন না। মুখের পূর্ব্বের আকৃতিও তাঁহার জানা ছিল না। প্রসন্নময়ীর যে আকৃতি, যে চেহারা পূর্ব্বে ছিল, তাহা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অশান্তির তীব্র দাহনে কতক আকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তারপর আর পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কঠোর সাধনায় এবং অনাহারে ও সংযমে। প্রেমাঙ্কুর ত দূরের কথা, এখনকার প্রসন্নময়ীকে দেখিয়া কোন পরিচিত লোক তাঁহাকে চিনিবেন, সে সম্ভাবনা নাই। প্রেমাঙ্কুর এখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। একদিন প্রসন্নময়ীর সহিত নিম্নলিখিত রূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে। প্রসন্নময়ীর চুলে জটা বাঁধিয়াছে, কঠোর সাধনায় পূর্ব্বের রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, পূর্ব্বের প্রসন্নময়ী আর নাই। দেশভ্রমণের কষ্টে, অনা-[illegible] প্রেমাঙ্কুরের আকৃতিও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রেমাঙ্কুর—মা, আপনি আমার জীবন দান করিয়াছেন, আমি কি করিয়া যে আপনার ঋণ পরিশোধ করিব, জানি না। আমি এখন অনেকটা সুস্থ হয়েছি, আমাকে বিদায় দিন, আমি স্থানান্তরে যাই। এখন আপনার পরিচয় পাইলে কৃতার্থ হইতাম।

যোগিনী।—বাবা,তোমার শরীর এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই। আর কিছু দিন পরে আমিও তোমার সহিত যাইব। তুমি কোথায় যাইবে? আমার পরিচয় এখন,পাইবে না,পরিচয়ের প্রয়োজন কি? আমি একজন সামান্য মহিলা।

প্রেমাঙ্কুর।—কোথায় যাইব, ঠিক নাই।

যোগিনী।—তুমি কেন কামাখ্যা আসিয়াছিলে? বাবা, তোমার বাড়ী কোথায়?

প্রেমাঙ্কুর ইঁহার সেবা শুশ্রূষায় জীবন পাইয়াছেন, কোন কথাই গোপন করিলেন না। সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া বলিলেন। যোগিনী শুনিয়া বলিলেন, বাবা, আর কিছু দিন অপেক্ষা কর, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব।

প্রেমাঙ্কুর বলিলেন, মা, আপনি আমার সঙ্গে কোথায় যাইবেন?

যোগিনী।—তোমাকে ছাড়িয়া এখানে থাকিতে পারিব না, তোমাকে বিধিকৃষ্ণপুর রাখিয়া আমি আবার আসিব। তোমার অভাবে না জানি তাহাদের কত কষ্ট।

প্রেমাঙ্কুর।—সে কথা ঠিক, কিন্তু মায়ের দর্শন না পাইলে আমি আর বিধিকৃষ্ণপুর ফিরিব না।

যোগিনী।—অবশ্যই তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। ভাল জিজ্ঞাসা করি, পুণ্যপ্রভাকে বিবাহ করিতে তোমার ইচ্ছা আছে ত?

প্রেমাঙ্কুর।—আমি বিবাহ করিব না, ইহাই প্রতিজ্ঞা ছিল, কিন্তু আমার ত্রিকুলে কেহ নাই। আমি অক্ষম সন্তান, দেশ সেবা ব্রত গ্রহণ করেছি। আমার কি বিবাহ করা উচিত?

যোগিনী।—তবে পুণ্যপ্রভার মায়ের অন্বেষণ কর কেন?

প্রেমাঙ্কুর।—পুণ্যপ্রভার কষ্টের কথা ভাবিলে আমার প্রাণ অস্থির হয়। জননীর অভাবে সে বালিকা না জানি কি কষ্টই পাইতেছে!

প্রেমাঙ্কুর বাবুর দুই চক্ষু হইতে জল পড়িল। যোগিনী বুঝিলেন, প্রেমাঙ্কুরের মন নরম হইয়াছে। বলিলেন, তুমি বিবাহ করিতে সম্মত হয়েছিলে, এই মাত্র বলিলে। আবার মতি ফিরিল কেন?

প্রেমাঙ্কুর।—সেটা আমার দুর্ব্বলতা। আমার কি বিবাহ করা উচিত?

যোগিনী।—বিবাহ করা উচিত,আমি বলিতেছি। প্রত্যেকেরই বিবাহ করা উচিত। বনে থাকিলে সংযম শিক্ষা হয় না। আমি বনে থাকিয়া ইহা বুঝিয়াছি। তুমি বিবাহ করিও। ঐ মেয়ের সহিত আমি তোমার বিবাহ দিব।

প্রেমাঙ্কুর।—আপনি আমার জীবন দান করেছেন, আপনার কথা অগ্রাহ্য করিতে আমি অসমর্থ। তবে ভাবিয়া দেখুন, আমার কি বিবাহ করা উচিত?

যোগিনী।—আমি ভাবিয়া দেখেছি, তোমার বিবাহ করা একান্ত উচিত।

প্রেমাঙ্কুর।—আমার জন্য আপনি এত কষ্ট স্বীকার করিবেন?

যোগিনী।—করিব, কোন চিন্তা করিও না। তোমার নিকট সকল কথা শুনে, ঐ গ্রাম দেখিতে আমার একান্ত ইচ্ছা হয়েছে। তুমি একটু সুস্থ হলেই তোমাকে লয়ে যাইব।

প্রেমাঙ্কুর।—যে জন্য দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতেছি, তাহা না পাইলে আমি ত যাইব না।

যোগিনী।—তুমি কিরূপে জানিলে যে পুণ্যপ্রভার মাতা আজও বিধি-কৃষ্ণপুর যান নাই?

প্রেমাঙ্কুর।—তিনি সেখানে গিয়াছেন কি না, তাহা জানি না।

যোগিনী।—একবার সেখানে যাইয়া দেখ, তিনি সেখানে না যাইয়া থাকেন, আবার অন্বেষণে বাহির হইও। বৃথা ঘুরিতেছ কেন? পুণ্যপ্রভার যে স্নেহময়ী মাতার কথা বলিলে, তিনি কি কন্যাকে বিপদে ফেলিয়া দীর্ঘকাল দূরে থাকিতে পারেন?

প্রেমাঙ্কুর।—পুণ্যপ্রভার প্রতি মায়ের অচলা বিশ্বাস।

যোগিনী।—বিশ্বাস থাকিলেও কি এরূপ সময়ে মা দূরে থাকিতে পারেন?

প্রেমাঙ্কুর।—তাঁহার পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়। তিনি মায়া মোহের অতীতা রমণী।

যোগিনী।—যাহাই হউক, তুমি একবার যাইয়া দেখ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বিধিকৃষ্ণপুরেই তুমি তাঁহাকে পাইবে।

প্রেমাঙ্কুরের মনে বহুদিন হইতে এই চিন্তা, বিধিকৃষ্ণপুরে যাইয়া একবার দেখা উচিত, মাতা সেখানে গিয়াছেন কি না? নানা ঘটনায় সে চিন্তা মনেই রহিয়া গিয়াছে, কাজে লাগে নাই। যোগিনীর কথায় সেই চিন্তাটা আবার জাগিয়া উঠিল। একটু ভাবিয়া বলিলেন,—আপনি কি মনে করেন,মা বিধি-কৃষ্ণপুরে আছেন?

যোগিনী।—আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস,তুমি সেখানে যাইয়া তাঁহাকে পাইবে। যাইবে কি? যদি তাঁহাকে পাও,তবে পুণ্যপ্রভাকে বিবাহ করিবে কি?

প্রেমাঙ্কুর।—আপনার আদেশ পালন করিতে আমি ধর্ম্মত বাধ্য, আপনি আমার জীবন দান করিয়াছেন, আপনি যদি যাইতে বলেন, তবে যাইব। এবং যদি মাকে পাই, এবং আপনি যদি বলেন, তবে পুণ্যপ্রভাকে বিবাহ করিব।

যোগিনী।—তুমি যে কাহিনী বলিয়াছ, তাহাতে বুঝিয়াছি, পুণ্যপ্রভাকে তুমি ধর্ম্মত বিবাহ করিয়াছ। সামাজিক ব্যাপারটা আর বাকী রাখিবে কেন? সেটা করিয়া তারপর অপর কর্ত্তব্যে মন দিও।

প্রেমাঙ্কুর।—তারপর কি করিব?

যোগিনী।—কি করিবে? আমার জিজ্ঞাসার অপেক্ষা নাই, তুমি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছ, তাহাই পালন করিবে। বিবাহের পর তোমরা উভয়ে ভবকিঙ্কর এবং ভবকিঙ্করী নাম লইয়া দেশের সেবা করিবে। সেবাতেই ধর্ম্ম। সেবার তুল্য আর ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্ম,জীবন্ত আকার ধারণ করেছেন,সেবা-রাজ্যে। সে কথা তোমাকে আমি আর কি বলিব, তুমি তাহা আমাপেক্ষা অনেক ভাল বুঝ। পূজা অর্চ্চনা,যোগ তপস্যা-সবই মিথ্যা—নিষ্কাম সেবাই জীবন্ত ধর্ম্ম। সেবাতে মতি থাকিলে,ইন্দ্রিয়ের অতীত হওয়া যায়; সেবাতে যোগ থাকিলে, প্রেমের উদয় হয়; সেবাতে রতি থাকিলে ভেদ-বোধের অঙ্কুর অন্তর হইতে উৎপাটিত হয় এবং অহেতুকী ভক্তির উদয় হয়। আর যা কিছু ধর্ম্মের কথা শুনেছ, সব মিথ্যা, সব ভণ্ডামী। সেবা-ধর্ম্মই সার ধর্ম্ম। বিবাহের পর তোমার জীবনের ব্রত, সেবাধর্ম্ম পালন করিবে, আর কি।

প্রেমাঙ্কুর।—আমি কি সেবা-ধর্ম্মের যোগ্য?

যোগিনী।—তুমিই যোগ্য।

প্রেমাঙ্কুর।—বিবাহের পর যদি আমার মতি ফিরে?

যোগিনী।—তাহা অসম্ভব। সংযম রাজ্যে তুমি সিদ্ধিলাভ করিয়াছ, এই কদিনের একত্র বাসে তাহা বুঝিয়াছি। সংযম, সেবার মহা অস্ত্র। সংযমের অধিকারী যে, অর্থাৎ নিশ্চিন্ত যে,নির্ব্বিকার-চিত্ত যে, কামক্রোধের অতীত যে, যশ নিন্দায় নিরপেক্ষ যে, এ সংসারই তাহার যোগধাম। তুমি এই সংযম মহা অস্ত্র যখন পাইয়াছ, কোন ভয় নাই। কয়েকদিন অপেক্ষা কর, তুমি আর একটু সুস্থ হও; আমি তোমাকে যোগধামে লইয়া যাইব।

আর কথা হইল না। যোগিনী উঠিয়া স্থানান্তরে গেলেন। প্রেমাঙ্কুরের

মনে নানা চিন্তা উঠিল। কত কথা প্রাণে জাগিল, কিন্তু কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না, যোগিনী কে? দীর্ঘ কাল পর বিধিকৃষ্ণপুর যাইবার জন্য একটু একটু তাঁহার আনন্দ হইতে লাগিল।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

নিরাশার মধ্যে আশার প্রদীপ।

চন্দ্রকলার মৃত্যুর পর, চতুর্দ্দিকের লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! তাহাদের জন্য দুঃখ করিতে একজন লোকও ছিল না। একটী ঘটনায় একটা ঘর মাটী হইল, ফরিদপুরের কাহিনীতে এ এক আশ্চর্য্য উদাহরণ। মানুষের নশ্বরত্ব স্মরণ করিয়া পুণ্যপ্রভা যারপর নাই বেদনা পাইলেন। এত দুর্ঘটনাতে মানুষের চেতন হয় না, ইহা ভাবিয়া বড়ই কষ্ট পাইতে লাগিলেন। কত দুঃখে সময় যাইতে লাগিল! চন্দ্রকলার মৃত্যুর বহুদিন পর একদিন ডেঁপুটীর নিকট হইতে পুণ্যপ্রভার নামে একখানি পত্র আসিল। পত্রে লেখা ছিল;—"প্রাণাধিকা পুণ্যপ্রভা, আমি এখন অনেক দূরে আসিয়াছি। এত দূরে আসিয়াও, এত দিন পরেও, তোমাকে ভুলিতে পারি নাই। বহু চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু চেষ্টা বিফল হইয়াছে, কখনও যে তোমাকে ভুলিতে পারিব, এমন আশা নাই। অনেক স্থান হইতে আমার বিবাহের সম্বন্ধ আসিতেছে বটে, কিন্তু আমি সকল প্রস্তাব তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দিয়া[illegible] আমি কেবল তোমার জন্যই জীবন ধারণ করিতেছি। আমার ব্যাঙ্কের খাতা-পত্র ও কোম্পানীর কাগজগুলি তোমার নামে পরিবর্ত্তিত করিয়াছি। তুমি না আসিলে এ জীবন রাখিব না। তুমি না আসিলে তোমার জীবন লইয়া আমার জীবন দিব। আমার ইহাই শেষ প্রতিজ্ঞা, জানিবে। আমি তোমা বিহনে পাগলের ন্যায় হইয়াছি। তোমার প্রেমে উন্মত্ত শ্রী * *।"

পত্রখানি মনোহর দেখিল। প্রথম পত্র দেখিয়া সে কোন কিছুই করিল না। এইরূপ পত্র ক্রমাগতই আসিতে লাগিল। রিপুর উত্তেজনা যখন বাড়ে, তখন মানুষ পাগলের ন্যায় হয়। এক মাসের মধ্যে ২৫ খানি পত্র উপস্থিত হইল। শেষ পত্রখানি এইরূপ;—"জীবনতোষিণি, এত পত্র লিখিলাম, তুমি একখানিরও উত্তর দিলে না। আমি বুঝিয়াছি, তুমি আমার হইবে না। আমি

কিন্তু তোমার আশা ছাড়িতে পারিতেছি না। আমি বিদায়ের জন্য পত্র লিখিয়াছি। বিদায় পাইলেই ছদ্মবেশে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। তুমি যদি আমার শেষ প্রার্থনা অগ্রাহ্য কর, তোমার কলিজার রক্ত পান করিয়া বাসনা মিটাইব! এ প্রতিজ্ঞা ধ্রুব সত্য জানিবে। তোমার প্রেম-পিপাসু শ্রী * * *”

এই পত্রখানিও মনোহর দেখিল। এই পত্র পাঠের পর মনোহর আর ঠিক থাকিতে পারিল না। পুণ্যপ্রভাকে কোন কথা না বলিয়া, এই পত্র খানি লিখিয়া রাখিয়া সে বিধিকৃষ্ণপুর পরিত্যাগ করিল ;—“মা, আপনাকে রক্ষা করা আমার জীবনের ব্রত। ঐ ডেপুটীর হাত হইতে আপনাকে রক্ষা করার আর উপায় দেখিতেছি না। অবশেষে আমার হস্ত কলুষিত করিতে হইল, এই দুঃখে আমার প্রাণ অস্থির। আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইলে ফিরিব, নচেৎ আর সাক্ষাৎ হইবে না। সেবক—শ্রীমনোহর।”

ডেপুটীর পত্রে মনোহর জানিয়াছিল যে ডেপুটী কৃষ্ণনগর গোয়াড়িতে আছেন। কৃষ্ণনগর পৌছিতে তাহার অধিক বিলম্ব হইল না। ১০ দিনের মধ্যে মনোহর অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া এই পত্র খানি পুণ্যপ্রভাকে লিখিল—“মা, —আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। কাল রাত্রে ডেপুটীর শির লইয়াছি। যে হস্ত আপনার শির লইতে ভীত এবং সঙ্কুচিত হইয়াছিল, সেই হস্ত কাল এই অসাধ্য সাধন করিয়াছে। এই কলুষিত হস্ত দ্বারা আপনার চরণ সেবা আর করিতে পারি না। আমি আপনার অপরাধী সন্তান, পাপে ডুবিয়া আবার সংসার পরিত্যাগ করিলাম। আমি চলিলাম, আপনার জীবন-পথ নিষ্কণ্টক করিয়া চলিলাম। যদি কখনও পুণ্য ও শান্তির অধিকারী হই, তবে ফিরিব ; নচেৎ ইহাই জীবনের শেষ সংবাদ।

আমি এখান হইতে নবদ্বীপ যাইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিব। তার পর কোথায় যাইব, কিছুরই স্থিরতা নাই। আপনি যে ব্রত লইয়াছেন, ঐ ব্রত পালন করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন, ইহাই বিধাতার নিকট একমাত্র প্রার্থনা। তবে আজ যাই। সেবক শ্রী মনোহর।”

এই পত্র পাওয়ার পর পুণ্যপ্রভার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার জীবনের জন্য এতগুলি জীবন গেল, একথা বৃশ্চিকের ন্যায় হৃদয়কে দংশন করিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলেন—“হায়, আমার এ জীবন-কণ্টক লইয়া আর কি করিব ? আমি পুণ্যপ্রভা না পাপপ্রভা,এ বিচার কে করিবে ? একে একে দীপ্তি গেল, সরলা গেল,কালীকান্ত গেল, পিতা গেলেন, মাতা দেশ

ত্যাগ করিলেন, মুকুন্দরাম ও প্রেমদাস গেল, পুত্রসহ হরিগোপাল গেলেন, দীপ্তির মাতা গেলেন,—চক্রবর্ত্তী গেলেন,অবশেষে ডেপুটীর বুঝি বা প্রাণ গেল ! মনোহর ও প্রেমাঙ্কুর দেশত্যাগী হলেন !! আমার এ জীবন আর রাখিয়া কাজ নাই। না জানি আমি বাঁচিয়া থাকিলে আরও কত লোকের সর্ব্বনাশ হইবে ! এক সীতার জন্য সোণার লঙ্কা ছারখার হইয়াছিল, আর আমা[illegible] দুই গ্রামের দুই ঐশ্বর্য্যময় বাড়ী উচ্ছন্ন গেল এবং কত লোকের প্রাণ[illegible] ! আমার আর বাঁচিয়া কাজ কি ? কুমারে ডুবিয়া জীবন বিসর্জ্জন দেওয়া[illegible]ল !”

আবার ভাবিলেন—“মা বলেন, আত্মহত্যা মহাপাপ। দীপ্তি[illegible] কথা বলিত। দীপ্তির বিশ্বাস ছিল, আমা দ্বারা জগতের কাজ হইবে ! ক[illegible], কি কাজ হইল ? কই, আমি কাহার সেবায় লাগিলাম ? এত ঘটনার পর আর জীবন রাখিয়া কি হইবে ? সরলা পুণ্যময়ী,জীবন বিসর্জ্জন দিয়া সে বেশ কাজ করিয়াছে ! আমি এখন করি কি ? মা, পিতার কীর্ত্তি বজায় রাখিতে আদেশ করেছেন। দীপ্তি বলিত যে, সকলকে বজায় রাখিতে পারিলেই আমার জীবনের সার্থকতা। কিন্তু আমি তা পারিলাম কই ? আমি যেন কেবল পরীক্ষার সহিত সংগ্রাম করিতেই জন্ম গ্রহণ করেছিলাম ! জীবনটা যেন বৃথা গেল ! জীবনটা যেন লোকের সর্ব্বনাশ করিবার জন্যই !! এ বৃথা জীবন রেখে আর পৃথিবীর পাপের ভার বৃদ্ধি করা উচিত কি ? লীলা ও তিলোত্তমা এক বৎসর মৌনব্রত পালন করে যেন নবজীবন পাইয়াছে ! এখন তাহাদের জীবন কত উন্নত হইয়াছে ! দীপ্তির ষোল আনা গুণ যেন তাহারা পাইয়াছে তাহারা যখন কীর্ত্তন করে,পৃথিবীটা যেন স্বর্গ হয়ে যায়,যেমন মধুর গলা,তেম[illegible] জমাট ভাব, তেমনই বৈরাগ্য ! ইহাদিগের মায়া বড় বিষম মায়া। আমি ইহাদিগকে ভুলিয়া কেমনে যাইব ? আহা,শান্তিশীলা তিন পুত্রবধূ লইয়া কি স্বর্গীয় ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করিতেছেন ! দীপ্তির পিতা এবং নীলকান্ত, দুই যেন জীবন্ত দেবতা। ইহাদিগকে দেখিলে আমার প্রাণ জুড়ায়। আমার প্রতি ইহাদের কত স্নেহ, কত যত্ন। আমি ইহাদিগের মমতা কেমনে ছাড়িব ? পিতার এত সাধের কীর্ত্তিই বা কেমনে ভুলিব ? মায়ের সন্দর্শন-লালসাই বা কেমনে ডুবাইব ? তার পর প্রেমাঙ্কুরের আকর্ষণ ! এই দেবতার কথা এবং দীপ্তির আদেশ লঙ্ঘন করা আমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর ! আমি দীপ্তির আদেশ পালন করিবার জন্য জীবন রাখিতে বাধ্য ! সেই দেব-বালার দৈববাণী যদি অসত্য হয়, আমার অপরাধ নাই। আমি মৃত্যু পর্য্যন্ত বুক বাঁধিয়া থাকিতে বাধ্য।”

এইরূপ ভাবিয়া পুণ্যপ্রভা, মনোহরের পত্র,লীলা, তিলোত্তমা, শান্তিশীলা, বেণীমাধব এবং নীলকান্তকে দেখাইলেন। মনোহরের কার্য্য কলাপ যেন সকলের নিকট স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। মনোহর বিধিকৃষ্ণপুর পরিত্যাগ করিলেও ডেপুটীর কয়েকখানি পত্র আসিয়াছিল,কিন্তু মনোহরের পত্র পাওয়ার পর আর একখানিও ডেপুটীর পত্র আসিল না। প্রকৃত ঘটনা কেহ জানিল না, তবে অনুমানে সকলেই মনে করিল, ডেপুটীর জীবন নাই। পুণ্যপ্রভা দুই সখী সহ শান্তিশীলার আশ্রয়ে, বেণীমাধব এবং নীলকান্তের তত্ত্বাবধানে, সেবা-ব্রত পালন করিতে লাগিলেন।

মনোহর দাসের বিধিকৃষ্ণপুর পরিত্যাগের প্রায় তিন মাস পর এক দিন রাত্রে বহু লোকের সমাগম হইয়াছে, দীপ্তির শ্মশানে জমাট কীর্ত্তন হইতেছে, এমন সময়ে এক যোগী এবং এক যোগিনী সেখানে বসিয়া কীর্ত্তন শুনিতেছিলেন। উভয়কে দেখিয়া কেহই চিনিতে পারে নাই। কীর্ত্তন শেষ হইলে সকলে বিস্ময়ের সহিত বলাবলি করিতে লাগিল, "ইহারা কে?" কিন্তু কেহই জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইল না। পুণ্যপ্রভার বাড়ীতেই অতিথি-সৎকার হইল। যখন বিধিকৃষ্ণপুরের সকল নিস্তব্ধ হইয়াছে, তখন প্রেমাঙ্কুরকে স্থানান্তরে রাখিয়া, যোগিনী,পুণ্যপ্রভাকে ডাকিয়া জগদম্বার ঘরে যাইয়া বসাইলেন এবং প্রদীপ জ্বালিতে বলিলেন। দীপ জ্বালা হইলে যোগিনী বলিলেন,"মা পুণ্যপ্রভা, তুমি রাত্রে আমাদিগকে চিনিতে পারিবে, সে সম্ভাবনা নাই। আমি তোমার মাতা, আর আমার সঙ্গে যাঁহাকে দেখিতেছ, ইনিই প্রেমাঙ্কুর। তোমাদের জীবন্ত ধর্ম্মভাব দেখিয়া আমি মোহিতা হইয়াছি। তোমরা এত অল্প দিনে এত উন্নতি লাভ করিয়াছ, ইহা দেখিয়া বিশেষ শান্তি পাইলাম।

"আমি তোমার মাতা" এই কথা শুনিবামাত্র পুণ্যপ্রভা মায়ের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। পুলকাশ্রুতে তাঁহার দুই গণ্ড ও বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল, বলিলেন,—"মা,তুমি কেমন করে আমাকে ভুলেছিলে? আমি যে চলেছিলেম!"

প্রসন্নময়ী।—কোথায় যাবে মা? তুমি কোথা যাবে?

পুণ্যপ্রভা।—পরীক্ষার উপরে পরীক্ষা—কত পরীক্ষায় মানুষ টিকৃতে পারে মা? আমি যে চলেছিলাম!

প্রসন্নময়ী।—কোথায় যাবে মা, তুমি যে দেবরক্তে জন্মগ্রহণ করেছ। পরীক্ষা তোমার নিকট তৃণবৎ। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরদিন সুখে থাক।

মাতা পুণ্যপ্রভার মস্তকে হাত দিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। পুণ্যপ্রভা

কাঁদিয়া আকুল হইতে লাগি[illegible] বলিলেন, "মা, তুমি কেঁদ না। প্রেমাঙ্কুর আজও আমার পরিচয় পান নাই। নানা কারণে আজিও তাঁহাকে পরিচয় দেই নাই। বিধিকৃষ্ণপুর পৌঁছিলে মাতাকে দেখিতে পাইবে, এই কথা বলিয়া তাঁহাকে এখানে আনিয়াছি। অধিক গোলযোগের প্রয়োজন নাই। আমি বিধিকৃষ্ণপুর এবং চরনগরের সমস্ত কথাই শুনেছি। কিছু জানিতে বাকী নাই, তুমি গোপনে নীলকান্ত, বেণীমাধব, শান্তিশীলা, লীলা ও তিলোত্তমাকে ডাকিয়া আন। পরশ্ব শুভদিন, ঐ দিন আমার জীবনের শেষ কামনা পূর্ণ করিব। আজ হতে আয়োজন করিতে হইবে।"

পুণ্যপ্রভা সকলকে ডাকিতে গেলেন, ইত্যবসরে প্রসন্নময়ী প্রেমাঙ্কুরকে ডাকিয়া বলিলেন—"বাবা, ঐ জীবন্ত মাতৃমূর্ত্তি জগদম্বাকে প্রণাম করিয়া আমার পানে তাকাও, আমি কে, তাহা বুঝিতে পারিবে। তুমি কখনও আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখ নাই, দেখিলে অনেক দিন পূর্ব্বেই চিনিতে পারিতে। এখন চাহিয়া দেখ, চিনিতে পারিবে, আমি কে?

প্রেমাঙ্কুর তাহাই করিলেন। জগদম্বাকে প্রণাম করিয়া যোগিনীর মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন। আজ চাহিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন, ঐ মুখে যেন বিধিকৃষ্ণপুরের সকল ইতিহাস, সকল স্মৃতি, সকল কথা লিখিত ছিল। দেখিয়াই তিনি স্পষ্টরূপ বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার হৃদয় ভাবোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ, নয়নে আনন্দাশ্রু। এই অবস্থায় মাতার চরণে প্রণাম করিলেন।

মাতা বলিলেন, বাবা, আশীর্ব্বাদ করি, সংযম এবং সেবা তোমার জীবনের সম্বল হউক।

প্রেমাঙ্কুর বলিলেন, মা, এতদিন আপনি পরিচয় দেন নাই কেন?

প্রসন্নময়ী।—জগদম্বার ইচ্ছা। আজই বা জীবনের কি পরিচয় দিলাম! ধর্ম্ম-ভূমি ভিন্ন পরিচয়ের আর স্থল নাই। ধর্ম্ম-ভূমিতে আমাকে পূর্ব্বে দেখেছ, ধর্ম্মভূমিতেই আজ আবার সাক্ষাৎ পাইলে। বিশ্বাস করিও, এ সংসারের প্রকৃত পরিচয় কেবল ধর্ম্মে। ধর্ম্মের মিলনই স্থায়ী মিলন। ধর্ম্মে যে পরিচয়, তাহাই চিরস্থায়ী, অনন্তকাল স্থায়ী। ধর্ম্ম-ভূমিতে যে পরিচয়, অন্যত্র তাহা প্রদীপ্ত নহে, অন্যত্র অস্পষ্ট।

প্রেমাঙ্কুরের নিকট সব যেন প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি আর কথা বলিতে পারিলেন না।

ইতিমধ্যে লীলা, তিলোত্তমা, বেণীমাধব, নীলকান্ত এবং তিন বন্ধুসহ শান্তি-